বড়মা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

॥ এক ॥

ধরা পড়ে গেল দয়াময়। ধরা পড়ে যাবে এমন প্রত্যাশা সে করেনি। এ শিল্পে তার নিপুণতা আছে, অভিজ্ঞতা বহুকালের। তথাপি ধরা পড়ে গেল। ধরা না-পড়ে-পড়ে ধরা পড়বার আশঙ্কা তার মনে আর উঁকি দেয় না। সতর্ক হওয়া আবশ্যকমনে করে না। তাই ধরা পড়ে গেল।

বীরভূম জেলার ছোট্ট একটি শহর। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তায় কেরোসিনের আলো জ্বলে উঠেছে।

দয়ামর একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে নিয়ে তার ব্যবসায়ে বের হয়েছে। চেহারাখানাও তার ব্যবসায়ের অনুকূল। উস্কখুস্ক এক মাথা চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখখানা আচ্ছন্ন। নাকের মধ্যভাগে নিকেল-উঠে-যাওয়া বিবর্ণ ফ্রেমের চশমা। তারই মদ্য দিয়ে মিটি মিটি করে চায় দয়াময়। গায়ে ময়লা জীর্ণ পোষাক। দুঃখ দুর্দশার মূর্তিমান বিগ্রহ যেন।

প্রথমে বেশ সম্পন্ন একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে সে উপস্থিত হয়েছিল। ক্যাম্বিসের ব্যাগটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে হাত জোড় করে নিবেদন করেছিল। সে কন্যাদায়গ্রস্ত একজন ব্রাহ্মণ। এমনি হতভাগা বাপ সে যে, মেয়েটিকে পাত্রস্থ করবার সামান্য কিছু টাকারও তার সংস্থান নেই। তাই দশজনের দোরে দোরে হাত পেতে বেড়াচ্ছে।

ভদ্রলোক একটি টাকা দিয়ে দয়াময়কে অন্যত্র দেখবার জন্য বললেন। ভাবটা এই, এখানে এর বেশি আর কিছু হবে না বাপু, এবার তাড়াতাড়ি পথ দেখ।

পথই দেখল দয়াময় আর আরেক জায়গায় প্রবেশ করেই বিপদে পড়ল।

অনেক দায়ই মুখস্থ করে রেখেছে দয়াময়। তার জীবনে অনেক দায়। আর সে দায় থেকে উদ্ধার করবার দায়িত্ব সে দিয়ে রেখেছে দেশের সহৃদয় লোকদের।

নতুন বাড়িতে এসে দয়াময় নতুন দায়ের কথাই নিবেদন করল।

ব্রাহ্মণ সন্তান সে। তার পুত্র সন্তানরাও ব্রাহ্মণই। কিন্তু শুধু জন্মসত্ত্বেই তো ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায় না। তাদের সংস্কৃত হতে হবে। দ্বিজত্ব প্রাপ্তি আবশ্যক। হতভাগ্য পিতা সে। ছোট ছেলেটির সেই দ্বিজত্ব ঘটাতে পারছে না। অর্থাৎ পৈতা—উপনয়ন দিতে পারছে না। অথচ না দিলেও নয়।

নিপুণ অভিনেতার মতোই—পারিবারিক দুঃখ দৈন্যের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে করুণ কণ্ঠে নিবেদন করেছিল দয়াময়।

তিনজন লোক বসেছিলেন সে ঘরে।

সে বাড়ির মালিকের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছে ঘটক। এমন সময় দয়াময় হাজির। তিনজনের দু'টি চোখের সম্মুকে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হচ্ছে দয়াময়কে।

দয়াময়ের দাড়ি গোঁফ আর সযত্ন রূপসজ্জায় কুৎসিত মুখখানির ওপর এসে পড়েছে লণ্ঠনের আলো। সে আলোয় দয়াময়কে দেখতে দেখতে ঐ তিনজনের একজন বিস্মত হলেন। একটা কৌতুকের হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে। ক্রমশ সে কৌতুক ক্রোধে পরিণত হল।

তিনি বললেন দয়াময়কে সম্বোধন করে ঃ বক্তৃতা থামাও তো। মাস দু'য়েক আগে তোমাকে না আমি নেয়ামৎপুরের বাজারে দেখেছি—কন্যাদায় বলে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছ?

ধরা পড়ে গেছে দয়াময়। কিন্তু ধরা পড়লে তো চলবে না তার? ধরা পড়েও তাকে হাত এড়াবার চেষ্টা করতে হবে।

দয়াময় উত্তর দিল ঃ কাকে দেখেছেন? কোথায় বললেন?

ভদ্রলোক বললেন ঃ আর কা'কে! তোমাকেই দেখেছি নেয়ামৎপুরে। তখন তোমার ছিল কন্যাদায়।

ততোক্ষণে দয়াময় প্রস্তুত হয়ে গেছে।

সে উত্তর দিল কণ্ঠে অজস্র বেদনার আকুতি মিশিয়ে ঃ কি আর বলবো বলুন। নেয়ামৎপুরের নাম শুনেছি, কিন্তু জীবনে আমি সেখানে যাইনি। তা'ছাড়া কন্যাদায়? আমার কন্যাই নেই।

বিদ্রূপে ধারাল হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক ঃ কন্যা না থাকলেই তো কন্যাদায় বলে ভিক্ষে করা সুবিধা হে! তোমার সন্তানাদি ক'টি?

দয়াময় বলল ঃ আজ্ঞে তিনটি। বড়টিকে কোন রকমে ভিক্ষে-সিক্ষে করে আপনাদের আশীর্বাদে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ালাম। এবারই পরীক্ষা দেবে। আর দু'টির মধ্যে এই একটির এবার উপনয়ন না দিলেই নয়। একটি নিতান্ত ছোট, এই সবে চার বছরে পড়ল।

—হুঁ। বললেন ভদ্রলোকঃ না বাবা, নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না। তোমাকে নেয়ামৎপুরে আমি দেখেছি। তোমার সব মিছে কথা। ভিক্ষে করাই তোমার পেশা।

দয়াময় এবার কণ্ঠে একটুখানি তপ্ততা ঢেলে দিলঃ তা কিছু না দিতে চান দেবেন না। চলে যাচ্ছি এখান থেকে। কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বলছি, ভিক্ষে করাই আমার পেশা—এসব কথা বলে অবিচার করবেন না। আমি ভদ্রলোকের ছেলে ব্রাহ্মণ—তবে দরিদ্র।

দয়াময়কে রিক্ত হস্তেই বিদায় নিতে হল সেখান থেকে।

ব্যর্থ হল দয়াময়। এ বাড়ি থেকে কিছুই খসাতে পারল না।

কিন্তু ভাগ্য বুঝিবা সে বাড়িতে তারই জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। তা-ই সেদিন মনে হচ্ছিল দয়াময়ের।

ধরা পড়েও আত্মরক্ষা করে অক্ষত দেহে বেরিয়ে এসে হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছিল সে, পেছন থেকে একজন ডাকলঃ ও মশাই, শুনুন।

সেই-বাড়ি থেকেই বেরিয়ে ডাকছে তাকে সেই ঘটক। জীবন ঘটক।

ছেলে দয়াময়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে, শুনেই ঘটকের উৎসাহ জেগেছে। লোকটার কথা সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে নিয়ে একটা দাঁও মারা যেতে পারে। একজনকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি, দয়াময়ের হাতে দু'পয়সা তুলে দেওয়া আর নিজের পকেটে— । উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ঘটক, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় চোখ দু'টি চক্‌চক্ করছে!

তাই ঘটক ডাকছে ঃ ও মশাই শুনুন।

থমকে দাঁড়াল দয়াময় ঃ আমাকে ডাকছেন?

ঘটক বলল ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি। আপনি আপনার যে ছেলেটির কথা বললেন, ওই যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। ওই ছেলের বিয়ে দেবেন? আপনার নামটি কি?

—দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

—ব্যস্ ঠিক আছে। নগদ দেড়টি হাজার টাকা পাবেন।

—বিয়ে? নগদ দেড়টি হাজার? হ্যাঁ দেবো। আপনি কি ঘটক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই আমার পেশা। কনে এখানকার এক ভদ্রলোকের। মেয়েটি ছোট, এই রকম একটি পাত্রই চাচ্ছেন। যাঁর মেয়ে তিনি বাতে পঙ্গু। চলে ফিরে বেড়াতে পারেন না। তাঁর ধারণা তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তাই তাড়াতাড়ি মেয়েটির বিয়ে সেরে দিতে চান। দেখুন মশাই, ছেলে আপনার সত্যিই আছে তো?

—আছে কি না চলুন—নিজে গিয়ে দেখবেন চলুন। এই চাক্‌দা গ্রামে আমার বাড়ি, পাশেই বাসুদেবপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি। কবে যাবেন বলুন। আমি ভিক্ষুক নই। আমার বাড়িঘর দেখলেই বুঝতে পারবেন। নেহাৎ দায়ে পড়ে গেছি তাই। একটা ছেলে পড়ানো, আজকালকার দিনে মুখের কথা কি না! উনি বলে দিলেন কি না, নেয়ামৎপুরে আমাকে দেখেছেন কন্যাদায় বলে আমি ভিক্ষে করছি।

—ছেড়ে দিন মশাই—ওসব লোকদের কথা ছেড়ে দিন। শুনুন আজ আর হবে না। আগামীকাল সকালে আমি মেয়ের বাবার সঙ্গে দেখা করব। তিনি নিজে তো যেতে পারবেন না তাঁর এক ভাই আর আমি যাবো। গিয়ে ছেলে দেখে সব পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফিরে আসবো।

ভাগ্যই তো বলতে হবে দয়াময়ের। কোথায় ফাঁকি দিয়ে একটা দু'টো টাকা খসাতে গিয়েছিল সে। টাকা পেল না, কিন্তু এসে সম্মুখে দাঁড়ালো দেড় হাজার টাকার থলে হাতে স্বয়ং ঘটক। দেড় হাজার টাকা! তাই তো! এতোদিন এটা ভেবেই দেখেনি দয়াময়। তার ছেলেরা আছে, আর তাদের জন্য রাজকন্যা আর রাজত্ব নিয়ে বাস আছে বাংলা দেশের মেয়ের বাবারা।

টাকা! দেড় হাজার! মনে করতেই দয়াময়ের দেহে রোমাঞ্চ হয়। পুলক রোমাঞ্চ।

ঠিক আছে। ঘটক আর মেয়ের কাকাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে চাকদার বাড়িতে প্রস্তুত হয়ে থাকবে দয়াময়।

কিন্তু, একটা কথা ঘটক আগেই বলে রাখতে চায়। দেড় হাজার টাকা থেকে একটা ভাগ চায় সে। দু'শ টাকা তাকে দিতে হবে। মেয়ের বাপ যা' দেবে সে তো আছেই, ছেলের বাপকেও দু'শ টাকা দিয়ে ঘটক বিদায় করতে হবে। ভাগাভাগির কথা শুনে আঁতকে উঠে দয়াময়। প্রাণধরে সে দু'শ টাকা তুলে দেবে ঘটকের হাতে? কিন্তু না দিয়েই বা উপায় কি? দু'শর জন্যে যদি দেড়হাজারই ফস্‌কে যায়?

হ্যাঁ, রাজিই হয়ে যায় দয়াময়। দেবে দেবে—সে ঘটককে দু'শো টাকাই দেবে।

দু'জনের মধ্যে কথা-বার্তা ঠিক হয়ে যায় বাজারের অন্নপূর্ণা হোটেল, তার পাশেই গোবিন্দ নন্দীর খাগড়াই বাসনের দোকান— সেই দোকানে গিয়ে খোঁজ নিলেই চাকদার দয়াময় বাড়ুজ্জ্যেকে পাওয়া যাবে। দয়াময় সেখানে ঘটকের জন্যে অপেক্ষা করবে।

এবার দয়ময়ের পা' দু'খানি যেন উৎসাহে উড়ি উড়ি করছে।

॥ দুই ।

দয়াময় বাড়ুজ্জ্যে সত্যি সত্যিই চাকদার অধিবাসী। ব্যবসাটাও তার সত্যি।

সংসারে তার তিনটি ছেলে আর স্ত্রী মৃণ্ময়ী ওরফে মিনু। ছোট্ট এই সংসারেও আবার বড় ছেলেটি থাকে না। দেবু তার মা'সির কাছে মানুষ হচ্ছে। সুতরাং দয়াময়কে চারটি মুখের আহার সংগ্রহ করতে হয়। আর তা করে সে ভিক্ষে করে, দশজনকে ফাঁকি দিয়ে।

কাজকর্ম করা তার পোষায় না। যতদিন পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি ছিল, ততদিন ঘরে বসেই সে কাটিয়েছে। সব নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তবে সে জীবিকা অর্জনের জন্যে পথে বেরিয়েছে। উপার্জনের অতি-সহজ পথ। পরিশ্রম বড় একটা নেই অথচ অর্থ আছে। দান পুণ্যের জন্যে দেশের লোক উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কাতর কণ্ঠে আবেদন জানালেই হল। দয়াময় দেশের লোকের মনের সঙ্গে পরিচিত। সে মনস্তাত্ত্বিক ও শিল্পী। সে যা' হোক দিন কাটতে লাগল এমনি করে।

এ ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে দয়াময় বাড়ুজ্জ্যে।

বাসুদেবপুরের মুখুজ্জে বাড়ির কর্তা বাড়ুজ্জ্যেদের এই কৃতী পুরুষটির পরিচয় পাননি আগে। তখন কিছু কিছু পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি ছিল দয়াময়ের। তাই তার হাতে কন্যা মৃণ্ময়ীকে সম্প্রদান করেছিলেন তিনি। দয়াময় তখনও স্বরূপে প্রকাশ পায়নি। প্রতিভা তার সুপ্ত ছিল। আরাম শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। অথবা ভবিষ্যতে যে একটা কিছু করে খেতে হবে তাকে, সে চিন্তাই তার মনে জাগেনি।

কিন্তু মুখুজ্জে বাড়ির দু'টি মেয়ে চিন্ময়ী আর মৃণ্ময়ী, দু'জনের ভাগ্যই ভাল নয়। চিন্ময়ী হল বিধবা আর মৃণ্ময়ী এমন স্বামীর জীবিত থাকাটাকে ভাগ্য বলে মনে করতে পারল না।

দয়াময়ের তিন ছেলে—দেবু, শিবু আর ভুতু।

মৃণ্ময়ী ওরফে মিনি বড় ছেলে দেবুকে তুলে দিয়েছে সন্তানহীনা দিদি চিনুর হাতে। দেবুকে তুমি মানুষ করে তোল দিদি। তাকে তোমার হাতেই দিলাম।

দয়াময় ভাবল, মন্দ কি! বোঝাটা চিনুর ঘাড়েই চেপে থাকুক।

আজ কিন্তু দেবুকে তার প্রয়োজন। বিয়ে দিয়ে দেড় হাজার টাকা হাত করতে হবে। কিছুদিন অন্তত পায়ের ওপর পা' তুলে নিশ্চিন্তে কাটানা যাবে।

চাকদায় সবাই জানে দয়াময়কে। জানে চাকদা স্টেশনের খালাসিটি পর্যন্ত। দয়াময় বাঁড়ুজ্যে রেলে চড়ে টিকিট না করে। স্টেশনে নেমে ব্যাগ ঝুলিয়ে এমন ভাবে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে যেন তার বড়ো তাড়া, বাড়িতে কি একটা জরুরী ব্যাপার অপেক্ষা করছে তার জন্যে। আর কোন দিকে দৃষ্টি দেবারই তার সময়ই নেই।

স্টেশন মাষ্টারও জানেন দয়াময়কে। জানে সে অঞ্চলের প্যাসেঞ্জাররা।

মাঝে মাঝে রসিকতা করেন ষ্টেশন মাষ্টার।

খালাসিকে বলেন ঃ ওই দ্যাখ, বাঁড়ুজ্জ্যে পালিয়ে যাচ্ছে। যা' পাকড়াও করে টিকিট দাবি কর। টিকিট না দিলে এখানে আমার কাছে নিয়ে আসবি।

দয়াময় সহজে শুনতে পায়না খালাসির ডাক। নেহাৎ কাছে এসে পড়লে বিস্ময়ের কণ্ঠে বলে ঃ টিকিট? ও, নতুন এসেছ বোধহয়? দয়াময়কে চেন না। নইলে কি টিকিট চাইতে আসতে? এ ষ্টেশনে কস্মিন কালেও কেউ দয়াময়ের কাছে টিকিট চায়নি। দয়াময় একথা বলে না যে, কেউ চেয়েও কস্মিন কালে পায়নি।

লোকটি হয়তো সত্যি নতুন। বলে ঃ তা' আসুন একবার, মাষ্টার মশায় ডাকছেন।

দয়াময় দক্ষ অভিনেতার মতো বলে ঃ তা' ডাকবেন বই কি? চিরকালই ডেকে আসছেন! ট্রেন চলে গেল, কাজকর্ম নেই। ডাকবেনই তো। বলবেন, আসুন, বসুন তামাক খান. গল্পসল্প করুন।

খালাসি যদি অগত্যা আইনের ভয় দেখায়, তখন দয়াময় আর-এক মূর্তি ধরে। সে জানে, ষ্টেশনের এলাকা সে ছেড়ে এসেছে। এখন আসুন, টিকিট দিন, বললেই হল আর কি?

দয়াময় বলে উঠে ঃ আইন, জরিমানা! যা' যা' বেশি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিসনে। কার সঙ্গে কি রকম কথা বলতে হয় শিখিসনি এখনো। টিকিট! টিকিট আমরা কস্মিনকালেও করি না। দোর গোড়ায় ইষ্টিশান, ধরতে গেলে একরকম ঘরের গাড়ী, তার আবার টিকিট!

খালাসির হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এরকম বিচিত্র মানুষ এর আগে সে আর দেখেনি।

দয়াময় হয় তো চল্‌তে চল্‌তে বলে যায় ঃ গাড়ি তো নয়, যেন দেশলাই এর বাক্স। ওতে যে আমরা চড়ি, এই যথেষ্ট!

এই দয়াময়।

তার বিচিত্র চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিক্ষণে। এ পরিচয় জানে চাকদার অধিবাসীরা। জানে বাসুদেবপুরের মুখুজ্জে বাড়ির লোকেরা। জানে চিনু।

আর অতি মর্মান্তিক ভাবেই জানে মৃণ্ময়ী—মিনু। দয়াময়ের স্ত্রী মিনু।

শুধু দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অনটনই নয়। পৈত্রিক আদর্শে ছেলে দু'টি, শিবু আর ভুতু এই শিশু বয়েসেই অমানুষ হয়ে উঠেছে। পড়াশোনা নেই, শুধু পাড়া বেড়ান আর আকাজ কুকাজে হাত পাকানো। লোকে বলে, হবে না! দয়াময়ের ছেলে তো! পিতার নাম রাখবে।

মিনু নিজের মৃত্যু-কামনা করে প্রতি মুহূর্তে।

সেদিনও মৃত্যু-কামনাই করেছিল মিনু। ঘরে চাল ডাল কিছুই নেই। টাকা পয়সাও নেই। দয়াময় ব্যবসায়ে শহরে বেরিয়েছে। কোন চিঠিপত্রও আসেনি, টাকা কড়িও না। ভুতুকে বলেছিল পোষ্ট আপিসে গিয়ে খোঁজ নিতে, কোন খবর আছে কিনা। ভুতু খোঁজ নিতে গিয়েছিল কিনা কে জানে। সে ঘুড়ি তৈরিতে ব্যস্ত। এমন ঘুড়ি তাকে তৈরি করতে হবে, যে ঘুড়ি আর সব ছেলেদের ওপর টেক্কা মেরে অনেক উঁচুতে উড়বে। হ্যাঁ বাবা। বলতেই হবে সবাইকে, এত উঁচুতে উড়ছে, কার ঘুড়ি রে? আর কার ঘুড়ি। এ-হল ভুতুর ঘুড়ি। তারপর—

মিনু জিজ্ঞাসা করে বার বার, ভুতু পোষ্ট আপিসে খোঁজ নিতে গিয়েছিল কিনা। ভুতুর মুখে কোন উত্তর নেই। সে ঘুড়ি নিয়েই ব্যস্ত।

মিনু যখন মরিয়া হয়ে তাড়া করে উঠল ভুতুকে, তখন ভুতু যেন ঘুড়ির জগৎ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করল।

বলল সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে ঃ নেই, নেই—টাকাও নেই, চিঠিও নেই।

বেশ, কিছুই যদি না থাকত। মিনু যদি বেঁচে না থাকত?

কেমন মানুষ তার স্বামী! চিরটা কাল তাকে জ্বালিয়ে গেল। বাড়ি থেকে গেল তো গেলই। মিনু যে কি করে সংসার চালাবে তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আর এই দু'টো অপদার্থ বয়ে-যাওয়া ছেলে। হাজার হোক, তাদের সে পেটে ধরেছে। তাদের মুখে দু'টো ভাত না দিয়ে সে পারে না। সে যে মা। মা নিজে উপোসি থাকতে পারে, কিন্তু ছেলেদের উপোসি রাখা কোন মার পক্ষেই সম্ভব নয়।

দেবুর কথা মনে পড়ে মিনুর।

দেবুটা বেঁচেছে। মাসি চিনু তাকে কখনো উপোসি রাখবে না। শুধু খাওয়ানো-পরানো নয় তাকে লেখা-পড়া শেখাচ্ছে চিনু। দেবুকে মানুষ ক'রে তোলবার জন্যে সর্বস্ব পণ করেছে চিনু। দেবু বাঁচুক। দেবু বড় হোক। তবু জীবনে খানিকটা সান্ত্বনা পাবে মিনু।

॥ তিন ॥

চিনুও স্বপ্ন দেখে দেবুকে বড়ো করে তোলবার। হ্যাঁ, দেবু লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে, বড় হবে, চিনুর বুকখানা আনন্দে ভরে উঠবে।

দেবু তার ছেলে। মিনু শুধু তাকে পেটেই ধরেছে। মা তো সেইই।

বিধবা চিনুর জীবনে এক মাত্র আনন্দ, সান্ত্বনা ও সন্তোষ ওই দেবু। দেবুর জন্যে সে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।

বাসুদেবপুরেই বিয়ে হয়েছিল চিনুর। তার স্বামী ছিলেন চরিত্রবান ভালোমানুষ! নিজের উপার্জনেই সংসার চালাতেন। কিন্তু অকালেই তাঁকে বিদায় নিতে হল সংসার থেকে। চিনুর বাবা সম্পন্ন গৃহস্থ। বিধবা মেয়ের দিকে চেয়ে দশ বিঘে জমি তাকে লিখে দিলেন। মেয়ে তাঁর অভাবের—দুর্গতির মধ্যে যেন দিন না কাটায়।

কিন্তু একটি মেয়ের জীবনে শুধু কি টাকা পয়সা, জায়গা জমিই সব? স্বামীকে নিয়ে সংসার পাতা তার হল না। সংসারে তার কোন আকর্ষণই রইল না। খাওয়া আর শোয়া আর জায়গা জমির তদারক করা! নিরালয়ে বসে চোখের জল ফেলে চিনু একটা বুক-ফাটা আর্তনাদ নীরবে গুমরে মরে অন্তরে। বড়ো শক্ত মেয়ে চিনু, তাই বাইরে তার প্রকাশ ঘটে না সহনশীলতার বর্মে সে নিজেকে ঢেকে রাখে।

এমন সময়ে তার কাছে এল দেবু।

দেবুকে নিয়ে মেতে উঠল চিনু।

ভালো খাবে। দেবু কোথায় কি ভালো জিনিষ পাওয়া যায় তা' খুঁজে-পেতে আনে। অন্যান্যদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়, কি খেলে শরীর ঠিক থাকে, ভালো হয়। ছেলের জন্যে চারদিক ঘুরে একে-তাকে ধরে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পাঠ নেয় চিনু।

শহর থেকে তৈরি করে আনায় দেবুর পোষাক পরিচ্ছদ। তার জন্যে আসে জুতো। স্কুলে যেতে মাথায় রোদ লাগবে, বৃষ্টির দিনে জল, সুন্দর ছোট্ট ছাতা আসে। সব দিকেই প্রখর দৃষ্টি চিনুর।

দেবুকে চিনু স্কুলেও ভর্তি করে দিল। স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলে চিনু নিজেই বেরিয়ে পড়ে খবর নিতে। কোথায় রইলো ছেলেটা?

চিনুর দাদা বিশু মুখুজ্জে বলে ঃ দেবুকে নিয়ে চিনুটা যে ক্ষেপে গেল?

ছোড়দা নিশু উত্তর দেয় ঃ তবু তো একটা নিয়ে মেতে আছে সে।

বিশু বলে ঃ তা' তো আছে। কিন্তু পরের ছেলে। চিরদিন সে নিজের থাকবে?

বিশু বলে ঃ কি যে বল দাদা! মিনুর ছেলে, পরের ছেলে হতে যাবে কেন?

ধমকে উঠে বিশু ঃ কিচ্ছু জানিস্ নে দুনিয়ার কথা নিশে। শুধু বাঁয়া-তবলা আর গান নিয়েই আছিস্। বলে, নিজের ছেলেই চিরদিন আপন থাকে না।

সে হয়তো থাকে না। মন্তব্য করে নিশু ঃ কিন্তু বলিহারি যাই চিনুর। দেবুকে মানুষ করবার জন্যে কেমন উঠে পড়ে লেগেছে।

—লাগবে না? গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠে বিশুঃ কোন বংশের মেয়ে সে।

স্কুলে দেবুর নাম আছে। হেড মাষ্টার নিজে বলেন; বাসুদেবপুর অঞ্চলে দেবুর মতো ভালো ছেলে আর নেই। শুধু পড়াশোনায়ই নয়—চরিত্রেও।

শুনে আনন্দে চিনুর চোখে জল এসে যায়।

দেবু ক্লাশের পরীক্ষায় পাশ করে করে এখন এসে স্কুলের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেচে। এবার সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। হেড মাষ্টারের অনেক আশা-ভরসা তার ওপর। দেবু বাসুদেবপুব স্কুলের নাম রাখবে।

দেবুর পরীক্ষার ফিসের টাকা নিয়ে চিনু নিজে গিয়েছিল হেড মাষ্টারের কাছে। হেট মাষ্টার চিনুকে নিয়ে গেলেন নিজের কক্ষে, তাকে বসতে অনুরোধ করলেন। বিস্ময়ও প্রকাশ করলেন তিনি। "ফিসের টাকা জমা দেবার জন্যে আপনার নিজের আসার কি প্রয়োজন ছিল দেবুর মা!" টাকাটা দেবুর হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিলে চলতো। হ্যাঁ, সে অঞ্চলের সবাই বলে তাকে দেবুর মা। এ পরিচয়ে চিনুর বুক ভরে উঠে। দেবুর মা-ই তো। দেবুর সলজ্জ কণ্ঠে বলে ঃ দেবু ছেলে মানুষ, টাকাটা কোথায় হয়তো হারিয়ে ফেলতো।

সব-কিছু দেবুর জন্যে নিজের হাতে করবে চিনু।

দেবু যখন স্কুলে যাবে, বই বগলে করে চিনুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলবে ঃ আসি বড়মা।

বড়মা তার দিকে চেয়ে হয়তো বলে উঠবে ঃ কালকের জামাটা পরে যাচ্ছিস্ তুই? ময়লা হয়ে গেছে যে রে? না, না, এটা ছেড়ে যা।

দেবু হাসবে ঃ কি যে বল বড়মা! এ জামাতে আরো দু'দিন চলবে।

—না চলবে না। চিনু তাকে বাধ্য করবে জামা পাল্‌টাতে। শুধু তাতেই রক্ষা নেই। হয়তো ব্রাস নিয়ে লেগে যাবে তার জুতোর ধুলো ঝাড়তে। আবার বলবে, দাঁড়া তো। চিরুনি নিয়ে দেবুর চুল আরো ভালো করে আঁচড়ে দেবে। দেবু শুধু হাসবে। আর কিছুই করার উপায় নেই।

ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে চিনুর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত শুধু তারই কথা চিন্তা করে চিনু। স্কুলের ছেলেরা মারামারি বাধায়। খেলার মাঠে গিয়ে হাত পা ভাঙে। স্কুলে দুষ্টুমি করলে শাস্তি পায়। হাতে বেত মারেন মাষ্টার। দেবুর যদি—না, না, দেবু তার ভাল ছেলে। সে দুষ্টু নয়, অশিষ্ট নয়, সে সতর্ক সাবধান সচ্চরিত্র।

মাঝে মাঝে দেবুকে নিয়ে স্বপ্নজাল বুনে চলে চিনু।

বাসুদেবপুরের মাঠে ঝা-ঝা করে রোদ। রুক্ষ লালচে মাটি তেতে ওঠে। গাছের মাথায় সূর্য। বাড়ির পাশের বন বাদাড়ে আলো লুকোচুরি খেলে। পাখীরা ডাকে থেকে থেকে। পথঘাট নির্জন হয়ে আসে। দুপুরের আহার শেষ করে সবাই বিশ্রাম করছে। বৌ ঝিরাও এবেলার গৃহকর্ম সমাপ্ত করে এবার একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

চিনু তখন বসে স্বপ্ন দেখছে।

ম্যাট্রিক পাশ করবে দেবু। এই খানেই থামা চলবে না। আরো তাকে পড়াতে হবে। ম্যাট্রিকের পর আই, এ, তারপর বি,এ। তারো পর আরো। পড়াব আর যতো পড়তে পারে—পড়বে দেবু। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

কিন্তু টাকা? টাকা আসবে কোথা থেকে?

জলপানি পাবে না দেবু? নিশ্চয় পাবে।

আর যদি জল পানি না-ই পায় তাহলে চিনুই জোগাবে টাকা। দশবিঘে জমি আছে তার। সেই দশ বিঘে জমি বাঁধা রাখবে, না হয় বিক্রিই করে দেবে। তারপর বাড়ি ঘর। না, না তাহলে দেবুর মাথা গুঁজবার ঠাঁই রইল কোথায়? মাথাগুঁজবার ঠাঁই? কেন, দেবু লেখাপড়া শিখে অনেক অনেক টাকা উপার্জন করবে। নিজে বড়ো বাড়ি করবে, তার স্ত্রী পুত্র সংসার হবে, সুখের সংসার। সে সংসারে চিনু আর মিনু দু'টি বোন........

স্বপ্ন দেখে আর ভবিষ্যতের প্রাসাদ গড়ে তুলে চিনু।

আবার! দুঃখ ও হয় তার। মিনুর জন্যে দুঃখ হয়। মিনু তার ছোট বোন। কতো আদরই না ছিল মিনুর মুখুজ্জে বাড়িতে। বড়ো ভালো মেয়ে মিনু। দেবুর মতো ছেলে গর্ভে ধরেছে মিনু।

কিন্তু ওই স্বামী-রত্নটি—দয়াময়ের জন্যে মিনুর জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি নেই। অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটায় সে তথাপি যদি স্বামী তার মানুষ হতো। ছেলে দু'টো—শিবু আর ভুতু মা'কে শান্তি দিত।

কি করবে চিনু?

বোনের এ দুঃখ ঘুচাবার কোন উপায় খুঁজে পায় না সে।

দেবু বড়ো হোক। সে-ই মার দুঃখ ঘুচাবে।

কিন্তু ততোদিন কি মিনু বেঁচে থাকবে? দয়াময়টা তাকে বাঁচতে দেবে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চিনুর বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে।

॥ চার

মিনুও দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে ভেতর বাড়ির রোয়াকে বসে। এখনও দয়াময়ের দেখা নেই। চিঠিপত্র টাকাড়ি কিছুই না।

আপন মনেই যেন বলতে থাকে 'মিনু বেশ মানুষ যা হোক, চিরটা জীবন শুধু জ্বালিয়েই মারলে। বাড়ি থেকে এই আসছি বলে যে গেল, আর আসবার নামটি নেই। ছেলে দু'টো উপোসে রবে এবার। আমি আর কি করে চালাবে? আর আমি পারি না, পারি না—'

ঠিক তখনই এসে দয়াময় বাড়িতে প্রবেশ করল। হাতে সেই ক্যাম্বিসের ব্যাগ। যে ভোল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তা' কই আছে। তব দৃষ্টিতে যে উৎসাহের একটা চাঞ্চল্য। কিছুটা অস্ত সমস্ত ভাব। বাড়িতে প্রবেশ করেই সোজা গিয়ে রোয়াকে এল।

মিনুর কথা তার কানে গেছে। বলতে বলতে গিয়ে সে উঠল রোয়াকে ঃ এসেছি এসেছি। থামো এবার। তুমিই তো চালাচ্ছ সংসারটা। তোমার বাপের জমিদারি থেকে যে টাকা আসছে মাসে মাসে!

ভুতু বাইরে থেকেই লক্ষ করেছে, তার বাবা এসেছে। সে এসে বলল ঃ বাবা! বাবা, কি এনেছ দাও। বাবা—

ভুতু বাবার ব্যাগটি ধরে টানাটানি করতে আরম্ভ করল। বাবা সফর থেকে ফিরে এল, আদরের ছেলেদের জন্যে নিশ্চয়ই একটু কিছু নিয়ে এসেছে।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলল দয়াময় ঃ যা বাবা যা। বিরক্তি করিসনি এবার কিছুই আনিনি।

ব্যাগটা বাবার হাত থেকে কেড়ে নিল ভুতু ঃ এইটের ভেতরে আছে। আমি দেখবো। দাদা আয়।

ব্যাগটার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ভুতুর। সে খুলে দেখলে বাবা সত্যি সত্যি কিছু এনেছে কি না। দয়াময় কেড়ে নিল ব্যাগ ছেলের হাত থেকে।

সে বলল ঃ ভেঙ্গে যাবে বাবা, ওরকম করতে নেই।

এরপর আরম্ভ হল বাপ ছেলেতে ব্যাগ নিয়ে টানাটানি। এক অপূর্ব সংগ্রাম। এই এতোটুকুন ছেলে ভুতু আর দয়াময়। দু'জনের সংগ্রাম।

ভুতু অবিরাম বলে চলেছে ঃ না, আমি দেখবো দাও বাবা।

ব্যাগটাকে কাছে নিয়ে পড়ল দয়াময়। বলল ঃ আঃ কি করছিস? শোন্ চট্ করে আমার দোয়াত কলম আর দাদার একখানা খাতা নিয়ে আয়। যা।

ভুতু যাবে দোয়াত কলম আর খাতা আনতে? ব্যাগটা হস্তগত না করে সে পিতৃ আদেশে কিছুতেই পালন করবে না। পিতৃদেব অমায়িক কণ্ঠে পুত্রের কর্তব্যের নামে আবেদন জানাতে সব পুত্রকেই বাবার কথা শুনতে হয়। কিন্তু ভুতু বাবার কথা কিছুতেই শুনবে না, বাবা তার জন্যে কিছু নিয়ে এলো না যে ইচ্ছে হলে তিনি শিবুকে বলুন সেই এনে দিক। আর এক উপদেশ বিতরণ করলে দয়াময়। শিবু বলছে "কেন ভুতু, দাদাকে কখ্খনো নাম ধরে ডাকতে আছে না কি?" যে দাদা তাকে একটা ঘুড়ি তৈরি করে দেয় না, তাকে আবার দাদা বলে না কি? হিসেবের জ্ঞান টনটনে। তার কাছে যেমন দান, তেমন পুণ্যি। শিবুর কানে গেছে ভুতুর অভিযোগের কথা। ঘুড়ি তৈরি করে দেয়নি শিব। দেবে! তার কাগজ ছিঁড়ে দিয়েছে ভুতুটা। মুখ ভেংচাল শিবুর দিকে চেয়ে ভুতু। "বেশ করেছি!"

শিবু পিতৃ আদেশ অমান্য করল।

দয়াময় কোমল কণ্ঠে বলল ঃ শিবু, শোন তো। চট করে আমার দোয়াত কলম আর একখানা সাদা কাগজ এনে দাও।

শিবুর সময় কোথায়? সে ঘুড়ি ওড়াতে যাচ্ছে। ভুতুকে বললেই এনে দেবে।

এতোক্ষণ ধরে সুপুত্রদের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিল মিনু। এবার সে এগিয়ে এল।

—না, দু'টোই বাঁদর হলো! কেউ একটা কথা শোনে না।

আবার উপদেশ বর্ষণ করে দয়াময় ঃ ছিঃ, বাপ মায়ের কথা মানতে হয়!

ঃ হুঁ, শুনতে হয়! এবার বাবাকেই ভ্যাংচি কাটতে থাকে ভুতু। পিতৃত্বটা দয়াময়ের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শাসন করতে হবে এবার। বাবাকে মুখ ভ্যাংচানো, কথা অমান্য করা! চড় মারবে বলে হাত তুলে দয়াময়।

সংগ্রামী ছেলে ভুতু। সে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে একখানা ইট তুলে নেয় হাতে, বলে "মরো না, মারো।" আমিও এইটে দেবো ছুঁড়ে।

চীৎকার করে উঠে মিনু ঃ ফ্যাল্, ফেলে দে বল্ছি। তুমিই ওদের মাথা খেয়েছ, নাও এখন নিজেই ইঁট খেয়ে মরো।

এবার ভুতু ইঁট ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অগত্যা মিনুই নিজে স্বামীর জন্য দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আসে। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি বাড়ি ফিরেই এখন কি লিখবার এমন তাড়া পড়ে গেল দয়াময়ের! টাকার হিসাব লিখবে জমা খরচ?

মুখ ফুটে বলেই ফেলে মিনু : কি গো, কাগজ কলম কি হবে টাকার হিসেব করবে না কি?

—না, না, টাকার হিসেব নয়। চিঠি লিখতে হবে, জরুরী চিঠি।

—বাড়িতে পা দিয়ে জরুরী চিঠি? কাকে লিখবে?

—আমি লিখবো না। লিখবে তুমি।

—আমি লিখবো? আমি লিখতে জানি?

—যেমন জানো। বানান করে' করে' ধরে' ধরে' লিখলে চলবে। লিখবে তোমার দিদি চিনুকে। চিন্ময়ী দেব্যাকে। যার কাছে তোমার বড় ছেলে মানুষ হচ্ছে।

—কি ব্যাপার বল দেখি? দিদিকে চিঠি লিখবার কি এমন দরকার পড়লো?

—বসো, এইখানে বসো, বলছি। দেবুর বিয়ে দেবো। খুব ভালো একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। মেয়েটি ছোট, তাই তারা একটি ছোট্ট ছেলে চায়। কাল পরশুর ভেতর দেখতে আসবে দেবুকে।

ঐ ছেলের বিয়ে? চমকে উঠে মিনু।

—চমকে উঠলে যে! দেড়টি হাজার টাকা নগদ। এ সময় এতো টাকা কে দেবে আমাকে?

—তাই বলে ওই ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা নোব?

—দ্যাখ, বেশি চেঁচিও না। যা' বলছি কর।

—দিদি রাজী হবে না।

—রাজী যাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। নাও, লেখো, কাগজ।

—আমি লিখবো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিখবে। যেমন পারো তেমনি লিখবে। নাও লিখো। দিদি, দেবুর বাবার খুব অসুখ। বাঁচে কি না সন্দেহ। দেবুকে দেখতে চাচ্ছে। এই চিঠি পাওয়া মাত্র দেবুকে পাঠিয়ে দিও।

—এই এতোবড়ো মিথ্যে কথাটা লিখবো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিখবে! সত্যি কথা লিখলে ছেলেকে সে পাঠাবে না। তোমাকে লিখতে হবে। আমি সেখানে কথা দিয়ে এসেছি।

—তোমার অসুখ শুনে দিদি যদি ছেলের সঙ্গে চলে আসে?

—আসবে না, আসবে না। অত সহজে তোমার বাড়ি সে আসবে না। আসবে যখন, তার আগে দেখাদেখির কাজ আমি সেরে ফেলব। তবে সে ভদ্রলোক যদি কাল সকালে না আসে, তাহলে একটু মুস্কিলে পড়তে হবে। আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। তুমি লিখো তো! নাও, লেখো, দয়ে হ্রস্বই দয়ে হ্রস্বই দিদি। তারপর যা বললাম, আমার খুব অসুখ, আমি দেখতে চাচ্ছি দেবুকে।

—থামো, থামো, এতগুলো মিথ্যে কথা—তোমার হাতে পড়ে দুর্গতির আর কিছু বাকি রইল না।

—তা কোনও রাজা মহারাজার হাতে পড়লে না কেন? তা'হলে আর এতো দুর্গতি হতো না।

—আবার চেঁচায়? বলছি ভুল হয়ে যাবে।

—বেশ বাবা বেশ, চেঁচাবো না, তুমি লেখো। শেষে লিখবে ইতি। তোমার বোন মিনি। মিনিই ভালো। চিনির বোন মিনি। মিনির বোন চিনি।

খুশি হয়ে উঠেছে দয়াময়। মিনু এবার পথে এসেছে। চিঠি লিখেছে চিনুকে। বাবার অসুখ, দেবুকে দেখতে চাচ্ছে। দেবুকে না পাঠিয়ে পারবে না চিনু। ওরা এসে দেখে যাবে দেবুকে, তারপর ব্যস্। দেড় হাজার টাকা। গয়নাগাঁটি, যৌতুক! সেও আবার নেহাৎ কম হবে না। কিছুদিন আরামে ঘরে বসে কাটিয়ে দিতে পারবে দয়াময়। আর দেশ বিদেশে গিয়ে 'ব্রাহ্মণ সন্তানকে দয়া করুন বাবু' বলে হাত পাততে হবে না কিছুদিন।

॥ পাঁচ ॥

চিঠি পেয়েই দেবুকে চাকদা পাঠিয়ে দিল চিনু। তার বাবার অসুখ, সে ছেলেকে দেখতে চাচ্ছে। না পাঠিয়ে পারে কি করে? কিন্তু তার পরীক্ষা সামনে, এসময়ে পড়াশোনা ছেড়ে চাকদায় বসে থাকলে চলবে না। দেবুকে বলে দিয়েছে বাবাকে দেখেই যেন সে চলে আসে। কি এমন শক্ত অসুখ হতে পারে তার? তাছাড়া, পরীক্ষার সময়, এসময়ে অসুস্থ বাবাকে আগ্‌লে বসে থাকলে তো চলবে না? আরো দু'টি ছেলে তো রয়েছে!

চিনু স্কুলের হেড মাষ্টারকে ধরেছিল, বেতন দিয়ে মাষ্টার রেখে যে পড়াবে দেবুকে, সে ক্ষমতা চিনুর নেই। মাষ্টার মশাই যদি দয়া করে মাঝে মাঝে দেবুকে একটুখানি দেখিয়ে দেন, তাহলে—। হেড মাষ্টার খুশি হয়েই কথা দিয়েছেন। দেবু তাঁর স্কুলের সেরা ছাত্র। সে যাতে পরীক্ষায় খুব ভালো করে, হেডমাষ্টারও তাই চান। তিনি খুব রাজি আছেন মাঝে মাঝে তাকে পড়াতে। এ সময় দেবু যদি চাকদায় গিয়ে বসে থাকে তবে····?

দেবুকে চাকদা পাঠিয়ে বড়ো উৎকণ্ঠায় ও উদ্বেগে সময় কাটাচ্ছিল চিনু। বেশি দূর নয় চাকদা। সেদিন গিয়েই সে ফিরে আসতে পারত। অন্তত এসে বলেও যেতে পারত, বাবার অসুখের বড়ো বাড়াবাড়ি বড়মা, একটা দিন সেখানে থাকা দরকার। সেদিন তো এলেই না দেবু, পরদিনও তার দেখা নেই।

চিনুর বাড়ির সমুখ দিয়েই পথ। বেশ প্রশস্ত পথ। গাঁয়ে এরকম পথ সচরাচর

দেখা যায় না। পথ দিয়ে গাড়ি ঘোড়া, সাইকেল, রিক্সা, মোটর সবই চলতে পারে। তবে কদাচিৎ ওসব যান বাহনের সাক্ষাৎ মেলে সে অঞ্চলে। শুধু প্রায়ই একখানা মোটর সাইকেল ভট্ ভট্ আওয়াজে গাঁয়ের নীরব পরিবেশে মুখর আলোড়ন তুলে যাতায়াত করে এই পথ দিয়ে। রায়েদের বাড়ির জামাই আসা-যাওয়া করে রাণীগঞ্জ থেকে মোটর সাইকেল চড়ে। রায়েদের জামাই রাণীগঞ্জের কারখানাতে কাজ করে। ভাল কাজই এখন করে সে। সামান্য মিস্ত্রী হয়ে ঢুকেছিল কারখানায়। এখন সে একজন বড়ো মেকানিক। কারখানার লোক বলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। বাসুদেবপুরে কেউ বড়ো তার নাম জানে না। সবারই সে জামাইবাবু, জামাই দাদা, জামাই। কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সেও বলে, আমাকে জানেন না? আমি আপনাদের জামাই। সার্বজনীন জামাই সে।

বাড়ির ভেতর থেকে দুর্ভাবনাগ্রস্ত চিনু শুনতে পেল জামাই এর মোটর সাইকেলের ভট্‌ভট্ শব্দ।

গাঁয়ের ছেলেরা পিছু নিয়েছে জামাই-এর। রোজই এমনই দৌঁড়ায় তারা তার পিছু পিছু। জামাই খুব আমুদে মানুষ। তাদের কৌতূহল মেটায় সে, কখনো কখনো বা কয়েকজনকে সামনে পেছনে চড়িয়ে সাইকেল ছেড়ে দেয়। শিশুর দল আনন্দে ও উত্তেজনায় কখনোবা ভয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করে।

সেদিন ছেলের দলকে ছাড়িয়ে আসার পরেই দেখা হ'লো ঘোষাল মশাইর সঙ্গে। সাইকেল থামিয়ে তাঁকে নমস্কার করল জামাই। জামাইকে খুব চেনেন ঘোষাল মশাই। খুব ভাল লাগে তাঁর ছেলেটিকে। উৎসাহে যেন সব সময় টগ্‌বগ্ করে ফুটছে ওই সুদর্শন তরুণটি। মুখে হাসি তার লেগেই আছে।

ঘোষাল মশাইকে নমস্কার করে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল জামাই। তাঁকে ছাড়িয়ে এসেই আবার থামতে হল জামাইকে। এবার গদাই মোড়ল।

জামাই জিজ্ঞাসা করে ঃ কেমন আছে মোড়ল? ভাল?

মোড়ল বলে ঃ তাই তো বলি, ভট্‌ভট্ গাড়িতে কে এলো? এই গাড়ি কি তুমি কিনলে জামাই?

জামাই বলল ঃ না মোড়ল, এখনো পারিনি কিনতে। তবে কিনবো কিনবো করছি।

গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে আসছিল চিনু।

জামাই এবার সাইকেলের মোটরটা বন্ধই করে দিল ঃ দাঁড়ান দাঁড়ান পিসিমা, পেন্নামটা করেনি।

চিনুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে জামাই ঃ ভাল আছেন পিসিমা?

আশীর্বাদ করল চিনু ঃ হ্যাঁবাবা, বেঁচে থাকো।

—বেঁচে আমি ঠিকই থাকবো পিসিমা। কারখানায় কাজ করি, বহুৎ কড়া জান।

আশীর্বাদ করুন, এইরকম মোটর বাইক একখানা যেন তাড়াতাড়ি কিনতে পারি।
—নিশ্চয়ই কিনবে বাবা। তুমি বড়ো ভালো ছেলে।
—আপনারা ভালোবাসেন, তাই ভালো বলেন। দেবু ভালো আছে?
—হ্যাঁ বাবা, দেবু ভালো আছে। কিন্তু দেবুর বাবার বড়ো অসুখ। দেবু তাকে দেখতে গেছে।
—কোথায়? চাক্‌দায়?
—হ্যাঁ, বাবা, আজ দু'দিন, এখনো এলো না, তাই ভাবছি।
—ভাববেন না, ভাববেন না। ভালো আছে। সব ভালো আছে। এই তো চাকদা—দু'মিনিটের রাস্তা, বলেন তো গাড়ি নিয়ে চলে যাই, খবরটা এনে দিই।
—না বাবা! তোমাকে যেতে হবে না। আমি লোক পাঠাচ্ছি।
—বেশ, তা'হলে আজ চলি পিসিমা, আবার দেখা হবে।
—হ্যাঁ বাবা এসো।
জামাই চলে গেল। চিনুর মনে হল, মন্দ হতো কি যদি জামাই চট করে খবরটা নিয়ে আসতো? না, নেহাৎ ভালো ছেলে জামাই, তা'বলে তাকে কষ্ট দেওয়া যায় না। হয়তো তার কতো কাজ। তার চেয়ে দাদাদের বলে দেখবে সে। বিশু আর নিশু। বড়দা আর ছোড়দা।
বিশুর গান বাজনার শখ আছে সত্য কিন্তু সে বিষয়ী মানুষ। নিশু তার বিপরীত। সারাদিনই আছে সে বাঁয়া তবলা আর হারমোনিয়াম নিয়ে। কখনো বা তবলায় চাটি মারছে বোল তুলছে, কখনো বা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরছে।
নিশুদের বাড়ির কাছে গেলেই কানে আসে একটা কোন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি অথবা গানের সুর। এ নিয়ে মত্ত হয়ে আছে নিশু। এ তার পেশা নয়—নেশা। চার পাশের গাঁ থেকে তার ডাক আসে, সে উৎসাহভরে গিয়ে উপস্থিত হয়, রাত জেগে গান গায়। একটি পয়সাও কেউ দেয় না। লোকে যে তার গান শোনবার জন্যে আগ্রহ দেখায়, তার প্রশংসা করে, নিশু মনে করে, এই তো অনেক পেলাম।
সেদিনও নিশু বসে বসে সুর ভাঁজছিল।
চিনু গিয়ে ডাকলে ঃ ছোড়দা!
ছোড়্দার কাছে চিনু অনুরোধ জানায় ঃ এক জন কাউকে ঠিক করে দাও ছোড়দা। চাকদায় দেবুর খোঁজ নিতে পাঠাতে হবে। ছেলেটা যে গেল আর ফিরছে না। এদিকে তার পরীক্ষা। ওদিকে তার বাবার নাকি অসুখ। চোদ্দ দিন পরে পরীক্ষা!
নিশু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু দয়াময়ের এরকম অসুখ, কই তাদের তো কোন খবব দেয়নি কেউ? দয়াময় না, মিনুও না। কি যে বলবে নিশু আর কি যে করবে? এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না সে। সমস্যা তারও জীবনে দেখা দেয়, কিন্তু সে কোন সমাধান জানে না।

বিশু আসছিল সেদিকে। দেখে নিশু অকূলে কূল পেল।

সব শুনে বিশু যেন আকাশ থেকে পড়ে ঃ দয়াময়ের অসুখ?

তারপরই হাসতে থাকে বিশু। প্রশ্ন করে ঃ কে বললে যে, দয়াময়ের অসুখ?

চিনু উত্তর দেয় ঃ আমি বলছি দাদা, মিনু চিঠি লিখেছিল।

বিশু বলে ঃ যাঃ! সব মিছে কথা। দয়াময়ের কিছু হয়নি। কাল সকালে দয়াময়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

সত্যি দেখা হয়েছিল বিশুর। দয়াময় ষ্টেশনে গিয়েছিল, কাদের নাকি আসবার কথা ছিল। আসেনি তারা। তাই একটুখানি হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরছিল দয়াময়। এমন সময় বিশুর সঙ্গে দেখা। সেই দয়াময়! দিব্বি ভালো মানুষটি। নাকের ডগায় সেই নিকেল উঠে-যাওয়া ফ্রেমের চশমা। তাকে দেখে হাসলে, কথা বললে। তবে হ্যাঁ—

দাঁতে জিভ কাটল বিশু। দয়াময় তাকে বার বার করে বলে দিয়েছিল, তার সঙ্গে যে দেখা হয়ে গেছে চিনু যেন সে কথাটা না জানে। হাজার হোক ভগ্নিপতি, একটা অনুরোধ করেছে, বিশু কথা দিয়ে এসেছিল, না ঃ একথাটা কাক পক্ষীতেও জানবে না। কিন্তু বিশু কি কাণ্ডটাই না করে ফেলল। তা' যা হবার হয়ে গেছে। এখন চিনু যেন কথাটা আবার দয়াময়ের কানে পৌঁছে না দেয়। তাহলে দয়াময় আবার কি ভাববে।

গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল চিনু ঃ তোমাকে বারণ করেছিল?

বিশু বলল ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম, পাঁচ ধান্দায় ঘুরে বেড়াই, চিনুর সঙ্গে আমার দেখাই হয় না।

চিনু আরো গম্ভীর হয়ে পড়ল ঃ হুঁ, বুঝেছি।

চিনু বেরিয়ে যাচ্ছিল, পেছন থেকে নিশু ডেকে বলল ঃ কিরে, এমন করে চলে যাচ্ছিস যে?

চিনু যেতে যেতে উত্তর দিল ঃ আমি নিজেই যাচ্ছি চাকদা।

নিশু বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলল ঃ তুই নিজে যাবি—মিনুর বাড়ি?

চিনু বলল ঃ হ্যাঁ ছোড়দা, আমি নিজেই যাব।

যেতেই হবে তাকে। দয়াময় কোন একটা মতলব এঁটেই মিথ্যে চিঠি লিখিয়ে দেবুকে চাকদা নিয়ে গেছে।

কিন্তু মতলবটা কি?

॥ ছয় ॥

দেবুও বুঝ্‌তে পারছে না তার বাবার মতলবটা কি।

কোন অসুখ বিসুখ হয়নি তাঁর, অথচ মাকে দিয়ে মিথ্যে চিঠি লিখিয়ে তাকে

বাড়িতে আনিয়েছে বাবা। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আছে রে আছে, দরকার আছে। তোর মাসি যা মেয়ে, সত্যি কথা লিখলে তোকে কিছুতেই পাঠাতো না।

বাবার বিষয় কিছু কিছু জানতে আরম্ভ করেছে দেবু। কেন কি উদ্দেশ্যে তিনি বাইরে যান, কি ভাবে টাকা পয়সা সংগ্রহ করেন, ঠিক বুঝতে পারে না দেবু। কিন্তু এ সে জানে, বাবা তার সত্যের ধার ধারে না। বড়মার কাছে সে শিখেছে সব সময় সত্য কথা বলবে। আর বড়মা বলেন, কোনদিন অন্যায় করবে না, ছলনা প্রতারণার আশ্রয় নেবে না। কিন্তু বাবা তার এমন শিক্ষা দেন....। কেন তার বাবা এমন? কেন তিনি আরো দশজন মানুষের মতো স্বাভাবিক নন?

আর তার মা মিনু? মাকে সে দেখেছে, আজো বাড়ি থেকে প্রতি মুহূর্তেই দেখছে। এমন মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। শুধু খেটেই যাচ্ছেন তিনি। অভাবের সংসারে মা-ই তার জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু সেই মা আজ তাকে এখানে আনবার জন্যে একখানা মিথ্যে চিঠি লিখলেন? আশ্চর্য! তার এমন মা!

কিন্তু দেবু এর কারণ খুঁজে পায়। বয়েসের তুলনায় সে দেহে ও মনে অনেকখানি বেশি পরিণতিই হয়ে পড়েছে। চাকদার পরিবেশ তাকে শিশুকাল থেকেই ভাবতে শিখিয়েছে। তাই সে বুঝতে পারে। বাবার প্রভাবে পড়েই তার মা নিজের হাতে ওই চিঠিখানা লিখতে বাধ্য হয়েছেন। জোর করে তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছেন বাবা।

সে সইতে পারে না, আবার বলতেও পারে না। মাকে বলতে পারে না, কেন এ চিঠি লিখলে মা? এতে করে সে নিজের ছেলের কাছেই তুমি মিথ্যেবাদী বয়ে গেলে। বাবাকেই বা সে কি বলবে?

অনেক কবিতা, অনেক প্রবন্ধ সে পাঠ করেছে, পিতামাতার প্রতি ছেলের কর্তব্যের কতো উপদেশ! বাবা মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করবে, কখনো অমান্য করবে না তাঁদের, তাঁদের মনে দুঃখ দেওয়ার অর্থ নিজের জীবনে চরম দুঃখ ডেকে আনা। এই তো সে পড়েছে, লিখেছে, মুখস্থ করেছে। কই কোথাও তো এ উপদেশ পায়নি, বাবা যদি হন—দয়াময়ের মতো বাবা, তাহলে দেবুর মতো ছেলে কি করবে? কেউ বলে দেয়নি।

কবিতা প্রবন্ধ বোধকরি সব বাবারাই লিখেছেন, ছেলেরা লেখেনি!

দেবু ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

কিছুক্ষণ পর রান্নাঘরে রান্না করতে করতে মিনু ডাক শুনতে পেল চিনুর ঃ মিনু! মিনু!

দিদি? চমকে উঠল মিনু ঃ কে? দিদি এলি!

চিনু ততোক্ষণে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে ঃ না এসে কি করি বল্? দেবুর বাবা কেমন আছে?

দিদিকে দেখে মিনু মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল, এবার তা মিলিয়ে গেল। মিনু বলল ঃ ভাল আছে। নীরস শুষ্ক দায়সারা উত্তর।

বিস্মিত কণ্ঠ চিনুর ঃ ভাল আছে তো ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিলেই পারতিস্?

বিব্রত বিপন্ন হয়ে পড়েছে মিনু ঃ আমি কিছু জানি না দিদি, দেবুর বাবাকে জিজ্ঞাসা কর।

চিনু বলল ঃ কোন ঘরে রয়েছে সে? ডাক্তার দেখিয়েছে?

মিনু উত্তর দিল ঃ জানি না।

চিনু বলে উঠল ঃ কি বললি?

হুঁকো হাতে নিয়ে দয়াময় তখন চিনুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মিনু বলল ঃ কিছু বলিনি। ওই দিকে তাকিয়ে দেখ।

তাই তো! চিনু মুখ ফিরিয়ে দেখল দয়াময় তার দিকে চোখ পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে আছে।

চিনু বলল ঃ ও। দাদা তা'হলে ঠিকই বলেছিল।

—মেয়েদের দাদারা তো বেঠিক বলে না কখনো।

—তাহলে কিছুই হয়নি তোমার?

—বালাই ষাট! আমার কিছু হতে যাবে কেন? তোমার হোক।

—হলে তো বাঁচি। তা' আমার সঙ্গে রসিকতা করছো কর, কিন্তু ছেলের সঙ্গে এ রসিকতা করবার কি দরকারটা পড়েছিল তখুনি? আজ বাদ কাল তার পরীক্ষা—সে খবর রাখো?

—তোমার মতো ওর একটা গার্জেন থাকতে আমি খবর নিতে যাব কোন দুঃখে? কিন্তু কি হবে পরীক্ষা পাশ করে? চাকরি করতে গেলে ক'টাকা মাইনে পাবে? বিশ? পঁচিশ?

—শুধু রোজগার করবার জন্যেই লেখাপড়া শেখে?

—তা' না তো কি? জ্ঞান অর্জন-ফর্জন এই সব বড় বড় কথা বলবে তো? ওসব আমার জানা আছে। বয়েস আমার কম হল না। তার চেয়ে আমি এক ভদ্রলোককে আসতে বলেছি, কাল আসেনি আজ নিশ্চয়ই আসবে। মস্ত বড় লোক। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। দেবুকে একবার দেখিয়ে দেবা যেদিন যাবে সেইদিনই চাকরি। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

—ও। এই জন্যেই এরকম করে অসুখ হয়েছে বলে কি লিখিয়ে ছেলেকে আনলে?

—হ্যাঁ। এইরকম না লিখলে তুমি পাঠাতে না।

—এখন দেখছি না পাঠালেই ভালো হতো।

—ভালো হতো! ছেলে রোজগার করে বাপকে সাহায্য করুন—এটা তুমি চাও না?

—বেশ কথাটি তো! এই কচি ছেলে—ও লেখাপড়া শিখবে না, এই বয়েসে

রোজগার করে তোমাকে সাহায্য করবে, তোমার সংসার চালাবে—আর তুমি বাপ সেজে বাড়িতে চুপ করে বসে থাকবে? ওর নিজের জীবনে সুখশান্তি বলে কিছু নেই, ও শুধু তোমার সংসার চালাবার জন্যেই জন্মেছে?

—বাঃ রে, মানুষ সংসারে ছেলে চায় কিসের জন্য? ও আজকের সময়ের ছেলে, উপযুক্ত হল, আমার সংসার ধরে নেবে। আলবৎ নেবে, নিশ্চয় নেবে।

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে চিনু।

—না, না নেবে না। এখনও সে বয়েস ওর হয়নি। বাপ হয়ে এমন করে ওর মাথাটি খেয়ো না। তাকে আগে মানুষ হতে দাও, নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। তারপর তোমার ছেলে নিয়ে যা খুশি করো। এখন আমি ওকে চাকরি করতে দেবো না। কোথায় সে? কই, দেবু! দেবু!

দেবু আড়ালে শুনছিল বাবা আর বড়মার কথা। এক একবার মনে হচ্ছিল সেও এগিয়ে গিয়ে বাবাকে জানিয়ে দেয়, এখন চাকরি সে করবে না। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না তার, তাতে তার স্বাভাবিক সংযম ও শালীনতাবোধ তাকে বাধা দিচ্ছিল। বাবার সঙ্গে কোন কিছু নিয়ে মুখে মুখে তর্ক করবে না সে।

চিনুর ডাকে সে কাছে এসে দাঁড়াল।

চিনুকেও তার একটা কৈফিয়ৎ দেবার আছে। বড়মা বলে দিয়েছিল কালই যেন বাড়ি ফিরে যায়। তা' ছাড়া যখন সে দেখল বাবার অসুখটা মিথ্যা, তখন তো....।

দেবু বলল ঃ বড়মা! আমি কালই—

চিনু দেবুর ওপরও মনে মনে চটে উঠেছে। কেন, এতোবড় ছেলে, তার কি নিজের ভালমন্দ জ্ঞানটাও থাকতে নেই।

চিনু বলে উঠল ঃ থাক্ থাক্ তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি সব শুনেছি। এতো কষ্ট করে তোমাকে এতোদিন পড়ালাম আর তুমি কিনা পরীক্ষার সময় এইখেনে এসে বসে রইলে। চল, তোমাকে আর ঘরে ঢুকতে হবে না। চললাম মিনু, আমার আর বসবার অবসর নেই।

দেবুর হাত ধরে নিয়ে চলে যায় চিনু। মিনু মনে মনে খুশি হয়, শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। নিজের অন্যায়ের বোঝাটা যেন হাল্কা হয়ে আসে।

কিন্তু দয়াময়? সে দেবুকে যেতে দিতে পারে না। ঘটককে কথা দিয়ে এসেছে। তারা কাল আসেনি, কিন্তু আজ নিশ্চয়ই আসবে। এসে দেখবে কোথায় তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেনেওলা ছেলে? ওই লোকটার কথা সত্য প্রমাণিত হবে। দয়াময়ের সবই ধাপ্পা! তা'ছাড়া দেড় হাজার টাকা!

পেছনে ছুটে যায় দয়াময়। চিনুকে মিনতি জানায়, সে যেন আজকার দিনটা অন্তত দেবুকে নিয়ে না যায়।

চিনুর এক কথা। এ ছেলে এখন চাকরি করবে না।

একবার মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করতে যায় দয়াময়। নিজের ছেলে, তার ওপর আমার কোন জোর চলবে না? "শোন চিনু, শোন! ওকে দিয়ে যাও বলছি, নইলে ভালো কাজ হবে না।"

চিনু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ঃ চোখ রাঙাচ্ছো? তোমার চোখ রাঙানিকে চিনু ভয় করে না।

চিনু যে কিরকম মেয়ে, তা' জানে দয়াময়। কিন্তু সে যে নিরুপায়। চিনুর কাছে দাবি জানিয়ে, চোখ রাঙানিতে কোন কাজ হবে না।

গাঁয়ের পথ দিয়ে হন্ হন্ করে চলে যায় চিনু। চণ্ডীতলা ছাড়িয়ে যায়। দয়াময় ওখানকার লেকাজনদের কাছে আবেদন জানায়, তার ছেলেকে চিনু নিয়ে যাচ্ছে জোর করে। তারা দয়াময়কে জানে। আবার চিনুর পথ আগলাবার সাহসও কারো নেই। আগলাতে যাবেই বা কেন? এতোবড় ছেলেটা ইচ্ছা না হলে কি সঙ্গে যায়? ওদের ঘরোয়া ব্যাপার গাঁয়ের লোক মাথা গলাতে যাবে কেন?

অবশেয়ে কাতর আবেদন জানায় দয়াময়। শুধু কিছু সময়ের জন্যে অপেক্ষা করুক তারা। ষ্টেশনে গাড়ি এসে গেছে। এখনই হয়তো ভদ্রলোকেরা এসে পড়বেন। কিছুক্ষণ থাকুক দেবু, ওদের সঙ্গে দেখাটা হয়ে যাক। তারপর না-হয় তাকে নিয়ে চলেই যাবে চিনু।

এবার চিনু রাজি হয়ে যায়। আচ্ছা, কিছু সময় সে অপেক্ষা করবেই। তবে এটা ঠিক, দেবু এখন চাকরি করবে না।

॥ সাত

সেদিনই এলো ঘটক। জীবন ঘটকের জবাবের নড়চড় নেই।

জীবন ঘটকের মক্কেলটি বেশ পয়সাওলা। আড়ংহাটায় বাড়ি। জায়গা জমি আছে, নগদ টাকাও প্রচুর। একটি মাত্র মেয়ে, সে মেয়ের জন্যে বর খুঁজছেন অনেকদিন থেকে। বাতে পঙ্গু, আড়ংদেহের অবিনাশ গাঙ্গুলী।

অবিনাশ গাঙ্গুলীর মেয়ে দেখতে না হয় একটুখানি বিশ্রী। বিশ্রী আর কি, রংটা একটু কালো, দাঁতগুলো কিছুটা উঁচু। কিন্তু এরকম মেয়েই তো দেশে হাজার হাজার। জীবন ঘটক বলে ঃ আরে শ্রী জিনিষটা কি চেহারাতে থাকে? লক্ষ্মী যার ঘরে বাঁধা, তাকেই বলে শ্রীমান, মেয়ে হলে শ্রীমতী। টাকা পয়সাই আসল কথা। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা কেন? ওই জন্যে। ভগবান বলছেন, আরে চেহারা কিছু নয়।

কিন্তু নীতি কথা ধর্মকথা মেনে আজকালকার মানুষ চলতে চায় না। নইলে অবিনাশ গাঙ্গুলীর মেয়ে পদ্মলতার বর মেলে না এতোদিন চেষ্টা করেও? একটি ছোট্ট বর। বয়েসে পদ্মলতাও ছোট। শুধু অবিনাশ গাঙ্গুলী ভাবেন, কবে যে তিনি চোখ বুঝবেন, অথবা একেবারেই বিছানা নেবেন। এখন বাড়ির মধ্যে লোকের কাঁধে

ভর দিয়ে তবু চলা-ফেরা করতে পারেন। আর কে আছে তাঁর? ভাইরা এমনি দাদাকে সমীহ করে চলে। কিন্তু মনে মনে হিংসা করে। ভাবে, দাদার এতো টাকা পয়সা। তাদের নেই কেন? অথচ একই বাপের ছেলে তারা। অবিনাশ গাঙ্গুলী চোখ বুঝলে ভাইয়েরা স্বমূর্তি ধারণ করবে। কে জানে সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা জুড়ে দেবে কিনা।

না, পদ্মলতাকে পাত্রস্থ করতেই হবে। এমন বর চাই, যে এসে গাঙ্গুলী বাড়িতেই থাকবে। তা, আজকাল আবার শ্বশুর-বাড়িতে এসে থাকায় ছেলেদের প্রেষ্টিজে বাধে। প্রেষ্টিজ! চাল নেই. চুলো নেই, প্রেষ্টিজটা ঠিক আছে।

দয়াময়কে দেখেই জীবন ঘটকের ধারণা হয়েছে, অতি সহজেই তাকে কাবু করা যাবে। যে একটা দু'টো টাকার জন্যে লোকের দোরে দোরে ধন্না দিয়ে বেড়ায়, মান অপমান জ্ঞান বলে কিছু যার নেই, সে দেড় হাজার টাকার লোভ সামলাতে পারবে কেন? টাকাই শুধু চাইবে, মেয়ে পর্যন্ত দেখতে চাইবে না।

তবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে এমন ছেলেই যদি তার না থাকে? নিশ্চয়ই আছে। নইলে একেবারে নাম ঠিকানা দিয়ে ছেলে দেখবার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়? না, ছেলে তার ঠিকই আছে। জীবন ঘটক মানুষ চেনে।

অবিনাশ গাঙ্গুলীকে এসে খবর দিল জীবন ঘটক ঃ এবার পেয়েছি স্যার। টোপ একরকম গিলিয়েও এসেছি।

বিশ্বাস করতে চান না অবিনাশ গাঙ্গুলী। ডান হাতে বাতগ্রস্ত পা'খানি চেপে ধরে বিকৃত বেদনা-কাতর কণ্ঠে বলেন ঃ তোমার কথায় আর বিশ্বাস নাই ঘটক। তোমার ওপর নির্ভর করে বসে থেকে আমার কাজটা হচ্ছে না। এবার দেখছি প্রাণকেষ্ট ঘটককে ডাকতে হবে। তুমি আর পারবে না।

বিনয়ে ভেঙ্গে পড়ে জীবন ঘটক। জীবন যা' পারবে না পরাণের জন্মেও তা পারা হবে না। বলে ঃ এবারটা পরীক্ষা করে দেখুন স্যার, তারপর পরাণ নারাণ যাকে খুশি ডাকবেন।

দেড় হাজার টাকার কথা শুনে অবিনাশ গাঙ্গুলী বললেন ঃ তুমি আবার দেড় হাজার টাকা বলতে গেলে কেন? বলেই তো দিয়েছিলাম, আমি তিন হাজার পর্যন্ত দিতে রাজি।

ধীরে ধীরে এগুতে হয় স্যার। এ হচ্ছে দর কষাকষির ব্যাপার। এক সঙ্গে তিন হাজার বলে দিলে, আরও দাও কষতে চাইবে। কষবে না যে, তারই বা কথা কি?

মাথা নাড়েন অবিনাশ গাঙ্গুলী ঃ দর কষাকষি নয়। এ হচ্ছে ঘুষের ব্যাপার। মোটা টাকা ছেড়ে দাও, কাজ হয়ে যাবে।

ঘুষ? হ্যাঁ, তা' ঘুষও বলতে পারেন। বলে জীবন ঘটক ঃ কিন্তু স্যার! ঘুষের বেলাও আস্তে আস্তে বাড়তে হয়। এক সঙ্গে মোটা টাকার লোভ দেখালে লোভ

বেড়েই যায়। লোভকে চেপে রাখতে হয়! নইলে ক্ষেপে উঠে। টেনে টেনে হাসতে লাগল জীবন ঘটক। ভাবছে এসে এবার একটা মোক্ষম কথা বলেছে।

অবিনাশ গাঙ্গুলী আর কোন কথা বলতে পারছেন না। বাতের ব্যথাটা আবার মারাত্মক হয়ে উঠেছে। তিনি কাতরাতে আরম্ভ করেছেন। মালিশ, ম্যাসেজ, এখন পা' দুখানিকে একটুখানি দলাই মলাই করা প্রয়োজন। চাকর এল মালিশ নিয়ে। অবিনাশ গাঙ্গুলী আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন, পা' দুখানি দিলেন ছড়িয়ে।

বাতের হাত থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি যখন ধাতস্থ হলেন, তখন আবার ঘটক শুরু করল ঃ আমার সঙ্গে তাহলে কে যাচ্ছেন স্যার?

অবিনাশ গাঙ্গুলী বললেন ঃ যাবে আর কে? অপূর্ব যাবে। তাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

—তাই ভাল, তাই ভাল। বেশ চৌকশ লোক। বলল জীবন ঘটক।

অপূর্ব অবিনাশ গাঙ্গুলীর মেজভাই।

—চৌকশ? কি বললে ঘটক? মন্তব্য করলেন অবিনাশ গাঙ্গুলী ঃ তুমি দেখছি সব কাজ পণ্ড করে ফিরবে ঘটক। অপূর্ব চৌকশ? দেখ, কথা বার্তা যা' বলবার নিজেই বলবে। ও কেবল আমার প্রতিনিধি হয়ে বলবে হুঁ আর হ্যাঁ। বুঝলে, সাবধান থেকো।

জীবন ঘটক উত্তরে বলল ঃ সে আমি সব সামলে নেব।

অপূর্ব এল, ঠিকও হয়ে গেল কখন তারা চাকদা রওনা হবে। কিন্তু জীবন ঘটকের আরো কিছুটা নিবেদন করবার রয়েছে।

বিয়েটা যদি ঘটিয়ে দিতে পারেন জীবন ঘটক, তা'হলে গাঙ্গুলী মশাই তাকে তিনশ টাকা দেবেন। বাপ যা' দেয় দেবে, কিংবা মেয়ের বাপকে—

সোজা হয়ে বসলেন অবিনাশ গাঙ্গুলী। মুখ খিঁচিয়ে বললেন তুমিও তো দেখছি লোভটা চেপে রাখতে পারছ না ঘটক। তিন শ'? তিন হাজার হলে নাহয় তিন শ' দেওয়া চলত। কিংবা দেড় হাজার তিন শ'? উঁহু, এ হয় না। দেড় হাজার তিন শ' হয় না। কিছুতেই না।

বিস্মিত হয় জীবন ঘটক ঃ হিসেবটা আপনি উল্টো বুঝছেন স্যার। ধরুন তিন হাজার থেকে গেল দেড় হাজার আর—

—হিসেব শেখাচ্ছে আমাকে? খেঁকিয়ে উঠলেন অনিবাশ গাঙ্গুলী ঃ এ হচ্ছে পার্সেণ্টেজের হিসেব। তিন হাজারে তিনশ দেড় হাজারে দেড়শ'। বুঝলে?

—তা'হলে স্যার। বলল জীবন ঘটক ঃ ওঁকে তিন হাজারই দেওয়া যাবে। ঐ কথাই বলব।

—না হয় তাই বল। কথা শেষ করে দিলেন অবিনাশ গাঙ্গুলী।

কিন্তু যখনই ঘটক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন তাঁর মনে হল, এ যে দেড়শ টাকার জন্যে দেড় হাজার বেরিয়ে যাচ্ছে! তিনি ডাকলেন জীবন ঘটকে ঃ শোন, শোন ঘটক। ঐ দেড় হাজার আর তিনশ'—তিনশ'ই সই। বুজলে?

॥ আট

অবশেষে চিনুর কাছেও ধরা পড়ে গেল দয়াময়।

চিনু জেনে ফেলল, চাকরি নয়, বিয়ে। বিয়ের ফন্দি দয়াময়ের মাথায়।

ঘটক অবিনাশ গাঙ্গুলীর ভাই অপূর্বকে নিয়ে এসে পৌঁছবে ছেলে দেখতে। দয়াময় যখন রাস্তা থেকে চিনু আর দেবুকে ফিরিয়ে আনে তখনই দেখছিল, জীবন ঘটক আর-একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আসছে। দয়াময়ের মুখ রেখেছে চিনু। দেবুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে আর পথের দৃশ্যটাও ওদের চোখে পড়েনি।

একদিন দেরি করে এলেও জীবন ঘটক এসেছে ঠিক। জীবন ঘটকের জীবন যেতে পারে, তবু জবান ঠিক থাকবে।

সঙ্গের ভদ্রলোকটির সঙ্গে ঘটক পরিচয় করিয়ে দিল দয়াময়কে। ইনি হচ্ছেন বেয়াই এর ছোট ভাই—আর-এক বেয়াই। ছেলে দেখা, কথাবার্তা এবার বেয়াই-এ—বেয়াই-এই হয়ে যাক জীবন ঘটক মিলিয়ে দিল।

কিন্তু দয়াময়ের আসল কথাটা যে ঘটকের সঙ্গেই। দু'শ দিতে হবে ঘটককে। দেড় হাজার থেকে দু'শ বেরিয়ে গেলে রইল তেরশ টাকা। হাজার আর রইল না, অঙ্ক শ'তে নামল। এ সইতে পারছে না দয়াময়। ওই দু'শ কনের বাপকে বাড়িয়ে দিতে হবে। অপূর্ব বলে, টাকা পয়সার কথা বলতে পারবে না। তবে তার দাদা অবিনাশ গাঙ্গুলী খুব ভালো মানুষ দু'শ টাকা বললে হয়তো রাজি হয়ে যাবেন। সে দয়াময়বাবু নিজেই তাঁকে বলে দেখতে পারেন।

টাকা! টাকা! টাকাই দয়াময়ের সব। জীবন ঘটক চোখ দু'টিকে কুঞ্চিত করে বলে ঃ হুঁ অবিনাশবাবু খুব ভাল মানুষ, রাজি হয়ে যেতে পারেন। তবে সে আপনি বুঝবেন। আমাদের কথাবার্তা ওই দেড় হাজার বিয়োগ দু'শতেই হয়ে রইল। আপনি দেড়হাজার গুণে নেবেন, আমাকে গুণে দেবেন দু'শ।

—পাওয়ার পর তো দেওয়া! বলে দয়াময়ঃ বেশ বেয়াইকে ধরে বসব। ব্যস্, একটা সুরাহা হয়ে যাবেই।

ছেলেকে ডেকে আনতে গিয়ে দয়াময় দেখে দু'কাপ চা দু'হাতে নিয়ে দেবু নিজেই আসছে। কিন্তু চিনুও সঙ্গে রয়েছে। তার দু'হাতে দু'খানা রেকাবিতে দু'টো করে মিষ্টি।

দয়াময় মিষ্টির রেকাবি দু'খানা হাতে নিয়ে চিনুকে বলল ঃ তুমি আবার কেন? যাও, ভিতরে মিনুর কাছে যাও। বাইরের লোকের সম্মুখে মেয়েমানুষ তুমি গিয়ে নাইবা দাঁড়ালে।

চিনুকে মিনুর কাছে পাঠিয়ে ভুল করল দয়াময়।

মিনু মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল এতোক্ষণ। এবার সে স্থির করে ফেলেছে,

চিনুর কাছে আর গোপন করা চলবে না আসল কথা। অন্তত তাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতেই হবে। বলতে হবে, ওই অর্থলিপ্সু বাবাজির হাত থেকে সে যেন তার ছেলেটিকে রক্ষা করে।

চিনু ভেতরে যেতেই মিনু তার হাত চেপে ধরল, ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ঃ দিদি দেবুকে নিয়ে তুই তাড়াতাড়ি চলে যা। তারপর যা' হয় হবে।

—ছেলেটা চাকরি করবে। তুই রাজি হলি?

—চাকরি নয় দিদি, ওর অন্য মতলব আছে। আমার রাজি হওয়ার কথা বলছিস্? আমার যে এক একদিন উনুনে হাঁড়ি চড়ে না দিদি? ছেলে দুটোকে খাইয়ে কতোদিন উপোস করে থাকি, তা জানিস্?

—কাঁদিস্ নে কাঁদিস্ নে মিনু। দেবু একদিন তোর দুঃখ ঘুচাবে। শিবুকে ভুতুকে দেখছি না, কোথায় তারা?

—লেখাও নেই পড়াও নেই, ক'দিন টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—লেখা পড়া না শিখলে কি মানুষ হয় রে? ছেলে মেয়ে যদি মানুষের মতো মানুষ না হয় তো কিসের ছেলে মেয়ে? খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকাই তো সব নয় মিনু। কুকুর বেড়ালের বাচ্ছা-গুলোও তো খেয়ে দেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।

ওদিকে তখন ঘটক আর অপূর্ব বিদায় নিচ্ছে। ওদের মধ্যে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, দু'একদিনের মধ্যে দয়াময় কনে দেখতে যাবে, আর সেখানে আগাম কিছু টাকাও নিয়ে আস্‌বে।

যাবার আগে ঘটক বলল ঃ আপনি তা'হলে কাল পরশুর মধ্যে যাচ্ছেন ঠিক?

দয়াময় উত্তর দিল ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, নমস্কার।

চিনুর কানে এসে ওদের শেষ কথাগুলো প্রবেশ করেছে। সে বলল ঃ ওরা বোধহয় চলে যাচ্ছেন।

এমন সময় অপূর্বর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ঃ টাকার জন্যে ভাববেন না। টাকা আপনি গেলেই পাবেন। ছেলে আমাদের পছন্দ হয়েছে।

জীবন ঘটক বলল ঃ দু'একদিনের ভেতর এসে পড়ুন। দেরি করবেন না। মেয়েটিকে দেখলেই পছন্দ হবে আপনার।

শুনেই চিনু চমকে উঠল। বলল ঃ এ আবার কি শুনছি মিনু?

—আমি তো তোকে বললাম দিদি, চাকরি নয়।

চিনু দু'হাত জোড় করে উদ্দেশ্যে প্রণাম করল ঃ ধন্য দয়াময়, তুমিই ধন্য। তোমাকে নমস্কার!

দয়াময় ওদের বিদায় দিয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করেছে তখন। সে বলল ঃ কা'কে নমস্কার করছ?

—তোমাকে। অসুখ নয়, চাকরি নয়, বিয়ে।

—হ্যাঁ, তুমিও একটা নেমন্তন্ন পাবে।

—চাই না তোমার নেমন্তন্ন। ছি, ছি, ছি।

—ছি ছি হয়ে গেল? ছেলের বিয়ে দেব, তা'তেও ছি ছি? এতে দোষটা কি হলো?

—কি দোষ হলো, তা যদি জানতে! দ্যাখো, ছেলেটার ওপর তোমার দয়া মায়া স্নেহ মমতা কিচ্ছু নেই।

—কি বলছো তুমি? নিজের ছেলে—

—হোক নিজের ছেলে। এই এতোটুকু বয়েস থেকে সে আছে আমার কাছে। ওর ওপর মায়ামমতা তোমার হবে কেমন করে?

—যাতে না হয় তার জন্যে তুমি তো তাকে যাওয়া-আসাও করতে দাওনি?

—না, তার জন্যে নয়। তোমাকে তো আমি চিনি। আমি চাইনি যে তোমার মতো বাপের আদর্শ ওর চোখের সম্মুখে থাকে।

—কেন আমি কি?

—তুমি জানো না তুমি কি?

—না, জানি না। শুনি তোমার মুখ থেকে বল।

—মিথ্যা, ছল, চাতুরি—এই হচ্ছে তোমার একমাত্র অবলম্বন। সত্যের ধার পাশ দিয়েও তুমি যাও না।

—বটে! তা'হলে তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতেই এসেছ?

—না। তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া করবার সম্বন্ধ নয়। মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামের পথ টেনে নিয়ে যায়। তুমি তাই গেছ। ওটা তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমারও স্বভাবের পরিচয় ছেলের কাছে আর দিও না। যাক্‌গে, ওসব কথা থাক। আমি বলছি কি, এখন এই ছেলের বিয়ে দিয়ে ওর মাথার ওপর একটি বোঝা চাপিয়ে দিও না। ছেলের বিয়ে দিয়ে কিছু টাকা হয়তো তুমি পাবে। সে টাকা শেষ হতে বেশি দেরি হবে না।

—রাখো, রাখো, ওসব বাঁধা বুলি আওড়াতে হবে না তোমাকে। তুমি বলতে চাও, আমার নিজের ছেলের বিয়ে আমি দিতে পারব না?

—না, এখন নয়।

—ছেলেটা তোমার কাছে মানুষ হয়েছে বলে কি তুমি মনে করেছ, তুমি যা, বলবে তাই হবে?

—হ্যাঁ, তাই হবে। ছেলে তোমার, কিন্তু তার ভালমন্দর দায়িত্ব আমার।

—থাক্, আর এত দরদ দেখাতে হবে না।

—কথাটা তুমি যত সহজে বললে, ছেলে মানুষ করবার জ্বালা যদি তুমি বুঝতে তাহলে কিছুতেই বলতে পারতে না।

—দ্যাখো, ওইসব কথা বলে আমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ো না বলছি, ভালো কাজ হবে না।

—কি করবে তুমি?

—ছেলের বিয়ে আমি দোবোই।

—সে বিয়ে আমি যেমন করে পারি বন্ধ করবো। ছেলে আমি তোমার কাছ থেকে নিইনি। নিয়েছি আমার বোনের কাছ থেকে।

মিনু এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। এবার সে এসে কাছে দাঁড়ালো। চিনুকে বলল ঃ দিদি ঝগড়া করিস নে। শোন।

ঝগড়া দয়াময়ই করছে, চিনু করেনি।

মিনু দেবুকে হাত ধরে নিয়ে এসে চিনুর কাছে ঠেলে দিয়ে বলল ঃ এই নে দিদি তোর ছেলে। তুই পালা এখান থেকে, চলে যা। আর যদি কোনদিন এমুখো হোস্ তাহলে অতি বড়ো দিব্বি রইলো।

দয়াময় চীৎকার করে উঠল ঃ এ কি করছ মিনু?

মিনু উত্তেজিত হয়ে বলল ঃ বেশ করছি। তুমি চুপ কর, আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না। পাড়া পড়শির কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। যা দিদি যা।

মিনু দিদিকে আর দেবুকে দোরের বাইরে ঠেলে দিয়ে দোর ভেজিয়ে দিল।

দয়াময় আর মেজাজ ঠিক করতে পারছে না। তার নিজের স্ত্রী মিনু ও তার সঙ্গে শত্রুতা করলে! আবার বলে কিনা ঠিক করেছি। আর কোন জবাব দিতে সে প্রস্তুত নয়। দয়াময় মিনুর কিছুই নয়, চিনুই সব। দেবুর ওপর বাবার কোন অধিকার নেই, মা তার একমাত্র অধিকারিণী। সে ছেলেটাকে তুলে দেয় বোনের হাতে, বলে, "যা ওকে নিয়ে যা।" নিয়ে গেলেই হলো? দেবুর বিয়ে দেবেই দয়াময়। ছেলেকে সে চিনুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসবে। দেড় হাজার টাকা!

দয়াময় উন্মাদের মতো ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে থাকে সারা ঘরময়। মাঝে মাঝে হাতের হুকোতে টান দেয় আর বিড় বিড় করে কি সব বকে।

ভুতু এসে কাছে দাঁড়ায়, ডাকে ঃ বাবা!

দয়াময় হুঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ বাবা! বাবা! দূর হয়ে যা' সব। আমি কারো বাবা নই।

ভুতু দূরে গিয়ে বাবাকে ভ্যাংচি কাটে।

দয়াময় হুকো টেনে দেখে আর ধোঁয়া বোরোচ্ছে না। হুকোটাকে মাটিতে আছড়ে ভাঙ্গতে আরম্ভ করে ঃ ধ্যেৎ তেরি!

হুকোর নিকুচি করেছে।

॥ নয়।

দেবুর দায়িত্ব, তার ভবিষ্যতের সমস্ত ভার যেন নতুন করে আবার গ্রহণ করে এসেছে চিনু। এবার তার বাবার কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে

এসেছে সে। এ দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হবে। দেবুকে মানুষ করা, বড়ো করে তোলার দায়িত্ব চিনুর। তার বাবার নয়, মার নয়।

এক এক সময়ে মনে হয় চিনুর, সে পারবে কি? যদি না পারে, তাহলে? না, সে পারবে, তাকে এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে এবার দেবু, এই ক'দিন পরেই দেবে। পরীক্ষায় সে ভালো ভাবে পাশও করবে। হেডমাস্টার বলেছেন, দেবু তাঁর স্কুলের গৌরব বাড়াবে। তাহলে হয়তো জলপানি পাবে সে। কিন্তু জপপানি পেলেই তো হল না। কলেজে ভর্তি করতে হলে অনেক টাকার নাকি প্রয়োজন। আর যদি দেবু জলপানি নাই পায়, তাই বলে কি এইখানেই তার পড়াশোনায় ইতি হবে? তবে তার দেবুর দায়িত্ব গ্রহণ করার কি মানে হয়?

তা কিছুতেই হতে পারে না।

চিনু জমি বাঁধা রেখে টাকা সংগ্রহ করবে, অথবা প্রয়োজন হলে কয়েক বিঘে জমি বিক্রিই ক'রে ফেলবে।

বাসুদেবপুরের টাকাওয়ালা মানুষ হল গদাই মোড়ল। জমি জায়গা রয়েছে, চাষবাস করে। আবার মহাজনীও তার রয়েছে। গাঁয়ের কোন জমি বিক্রি হলে সে চেষ্টা করে ধরে রাখতে। বেশ সম্পন্ন, গৃহস্থ, মাতব্বর লোক গদাই মোড়ল। লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি আছে তার প্রতি।

তারই কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল চিনু। বলেছিল ঃ মোড়ল টাকা মজুত রেখো আমার জন্যে, প্রয়োজন হলে জমি বাঁধা দেব, না হয় বিক্রীই করে দেব কয়েক বিঘে। দেবু যদি পাশ করে তবে তাকে পড়াতে হবে না?

মাথা নেড়ে গদাই মোড়ল ঃ সে সময়ে দেখা যাবে নিশ্চয়ই দিদিমণি। কিন্তু একটা কথা কি শুধাতে পারি? বোনের ছেলের পড়ার জন্যে তুমি জায়গা জমি সব—

হেসে ফেলে চিনু ঃ দেবু অমার নিজেরও ছেলে মোড়ল। আমি তার বড়মা। ওই মায়ের আগে আমার দায়িত্ব। আমি যে বড়ো। আর জায়গাজমি? সে তো সবই দেবুর? আমি তার নামে উইল করে রেজিষ্টারী করে রেখেছি। তারই ধন তারই পড়া শোনায় লাগবে।

বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে গদাই চিনুর দিকে।

চিনু আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। এবার তাকে আসানসোল যেতে হবে পরীক্ষার কয়েকদিনে জন্যে দেবুর একটা থাকা খাওয়ার জায়গা ঠিক করতে। আসানসোলে গিয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে।

গদাই মোড়লের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে সেদিন চিনু ফিরে এলো সত্যি— কিন্তু সে জানতো না যে, তার বড়দা বিশু মুখুজ্জে তা'তে বাগড়া দেবে।

সেদিন গদাই জনমুজর নিয়ে মাঠে কাজ করছিল। নদীর পারে উঁচ জমির মাঠে। চারদিকে শস্যের চারায় সবুজ হয়ে উঠেছে। চাষীর প্রাণের আনন্দ ওই সবুজ খেতগুলো। নদী থেকে জলসেচ হচ্ছে জমিতে। গান গাইছে আর জল সেচছে সবাই। মাঠের ওই কর্মব্যস্ত রূপ যে-কোন পথিককে মুগ্ধ করে।

বিশু মাঠ দিয়ে যাচ্ছিল। দূরে দূরে এখানে ওখানে তার খেতেও জনমুজুরেরা কাজ করছে। সে নিজে তাদের কাজ তদারক বেরিয়েছে। গদাই মোড়ল বিশুকে দেখতে পেয়ে ডাকল ঃ ও মুখুজ্জে, মুখুজ্জে।

বিশু থমকে দাঁড়াল। কে ডাকছে? ও, গদাই মোড়ল! এগিয়ে গেল বিশু।

গদাই বলল ঃ আমি ডাকছি মুখুজ্জে।

—কি ব্যাপার বল দেখি?

—এসো বসি এইখানে। অনেক কথা আছে।

—বল কি কথা।

—তোমার বোন—চিনু ঠাকুরণ গো—এসেছিল আমার কাছে। বললে, মোড়ল, কিছুদিন পর আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে হবে। মাঝে মাঝে আমার কাছে সোনার গয়না দিয়ে টাকা নিয়ে যায়। বললাম এবার কি বাঁধা দেবে? তা' চিনু বলল, এবার আর সোনা দানা কিছু নেই গদাই। ছেলেটাকে পড়াতে গিয়ে সেসব আমার শেষ হয়ে গেছে। এখন জমি দেব দু'বিঘে।

—জমি মানে? আমার বাবা ওকে যে দশবিঘে জমি দিয়ে গেছেন সেই জমি?

—তা' ছাড়া জমি ও কোথায় পাবে?

—সে তো চিনুর জীবনস্বত্ব, দান বিক্রির অধিকার তো তার নেই?

—সে কি কথা? চিনু যে বললে, তোমার বাবা ও-জমি ওকে রেজিস্ট্রি দান পত্র করে দিয়ে গেছেন?

—তারপর, তারপর বল, বল শুনি?

যেন শোনবার প্রচণ্ড আগ্রহ বিশুর। সে মাঠের ওপরই বেশ আসন পেড়ে বসল। গদাই তাকে চিনুর সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, সব শোনাল। মাথা নেড়ে নেড়ে সব গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব শুনছিল বিশু। গদাই এর কথা শেষ হতেই বিশু উঠে দাঁড়াল।

বিশু হাত নেড়ে বলল ঃ খবরদার, খবরদার! এমন কাজটি করিসনে গদাই। বিধবা বোন, তার ওপর ছেলেপুলে নেই, তাই বাবা চিনুর নামে দশ বিঘে জমি আর ওই বাড়িটা জীবনস্বত্ব লিখে দিয়ে গেছে। চিনু যতদিন বাঁচবে খাবে। তারপর তার মৃত্যুর পর আমাদের জমি আমাদের কাছেই ফিরে আসবে। পাঁচ বিঘে আমার। পাঁচ বিঘে আমার ছোট ভাই নিশুর। দান-পত্রটত্র সব মিছে। আর রকম দেখনা, ছেলেটা পরীক্ষা দেবে, পাশ করবে কি ফেল করবে তার ঠিক নেই, এখনই টাকার জোগাড় করতে রাখতে হবে। তা'ও জমি বাঁধা রেখে।

গদাই চিন্তিত হয়ে পড়লে ঃ তাহলে?

বিশু বলল ঃ তা'হলে আর কি। তুমিই বুঝে নাও কি করবে। করো যা' খুশি। চিনুও মরবে, দেবুও মরবে আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও মরবে গদাই! আইন কাউকে ছাড়বে না। আমি চিনুর নামে নালিশ করব। নিশুটা হয়েছে এমন, চব্বিশঘণ্টা তাঁই তাঁই করে শুধু তবলা পিঠছে, আর গান গাইছে, নইলে সে যদি পাশে দাঁড়াতো তাহলে এসব আমি একদিনেই শায়েস্তা করে দিতে পারতাম।

গদাই ওসব হাঙ্গামা হুজ্জতে নেই। সে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিল বিশুকে। বিশু উত্তেজিত হয়ে ছুটে গেল নিজেদের বাড়িতে নিশুর কাছে। মাঠে কাজ তদারক করা আর তার হল না। তারই পৈত্রিক জমি বাঁধা রাখবে, বেচে দেবে চিনু? গয়না-গাঁটি সব দেবুর গহ্বরে ঢেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে শতেকখোয়ারী, এখন বাকি রয়েছে ঐ ক' বিঘে জমি।

নিশু তখন সঙ্গীত নিয়ে মগ্ন। সহজে তার ধ্যান ভঙ্গ হয় না। তবে দাদার হুঙ্কারের মধ্যে ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকাও সম্ভব নয়। সুতরাং বিশুর উপস্থিতিতে সাধনায় তার বিঘ্ন ঘটলই। না-ঘটে উপায় নেই। নইলে হয়তো বিশু বাঁয়া-তবলা কেড়ে নেবে।

বিশুর বক্তব্য হচ্ছে, এবার নিশুকে গান বাজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। তাকে জাগতে হবে, উঠতে হবে। চিনু শুধু নিজের নয়, তাদেরও সর্বনাশ করতে চলেছে। দেখা যাচ্ছে, বড়ো ভয়ানক মেয়ে ওই চিনু। তাদের বাবা মুখুজ্জে মশাই, মৃত্যুর আগে জমি-জমা দু'ভায়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গেলেন। পাছে দুই ভাই জমি-জমা নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাঁধিয়ে বসে। দুই মেয়ে মুখুজ্জের। চিনু আর মিনু। মিনুর স্বামী-পুত্ররা রয়েছে, কিন্তু চিনুটা বিধবা, ছেলেপুলেও নেই। তাই চিনুকে দিয়ে গেলেন দশ বিঘে জমি আর ওই ছোট্ট বাড়িটা। শুধু জীবনস্বত্ব। তা এখন চিনু দেবুকে পড়াবার জন্যে সেই জমিই বিক্রি করবে। বে-আইনি, সম্পূর্ণ বে-আইনি চিনুর। তা' আরো কি সর্বনাবেশ কথা! বিশু নিশু জানল না, গাঁ-গেরামের কেউ জানলে না, চিনু এখন প্রচার করে বেড়াচ্ছে, বাবা তাকে ওই দশ বিঘে জমি দানপত্র করে গেছেন আর সে আবার উইল করে দিয়েছে দেবুর নামে। এই যে সর্বনাশ, তা ঠেকাতে হলে নিশুকে বিশুর পাশে দাঁড়াতে হবে। পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার তার দুই ভাইয়ের। একা বিশুরও নয়, নিশুরও নয়।

কিন্তু নিশু অতো কথা বুঝে না। সে বরং চিনুর কাণ্ড দেখে বিস্মিতই হয়েছে। মেয়ে মানুষ হয়ে একটা ছেলেকে মানুষ করা!

বিশু খেঁকিয়ে ওঠে ঃ মানুষ করছে না ছাই করছে। মেয়েছেলে নিজে গিয়ে আমাদের নাম করে একে-তাকে ধরে—তাই। দয়াময়ের ছেলে, কিছু হবে না, কিছু না। দেখিস্ ফেল মেরে চলে আসবে।

নিশু নীরব হয়ে বসে রইল।

বিশুর আস্ফালন অবিরাম চলল। প্রয়োজন হলে সে আদালতে যাবে।

আগে ভাগে চিনুকে একবার জিজ্ঞাসা করবে বলে চিনুর বাড়ি গিয়েছিল বিশু। একটা তুমুল ঝগড়ার জন্যই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চিনু বাড়ি নেই। সে নাকি আসানসোল গেছে। দেবু বাড়িতে ছিল, সেই বলেছে একথা।

মুখুজ্জে-বাড়ির নাম ডোবাচ্ছে চিনু। সে-বাড়ির মেয়ে হয়ে চিনু বাসা খুঁজতে আসানসোল নিজে চলে গেছে। কেন, বাসুদেবপুরে আর লোক নেই? বিশু নিশু না হয় তার শত্তুরই। তাদের সে ফাঁকি দেবে কি-না, তাই তাদরে কাছে ঘেঁসবে কেন? কিন্তু আর কি লোক ছিল না? যাকে বলতো সেই যেতো। তা' নয়, একা মেয়েমানুষ চলে গেছে আসানসোল!

যাক্, যা' খুশি করুক। বিশুও বলবে, ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর নেই। স্পষ্ট ঘোষণা করে দেবে। কিন্তু ওই দশ বিঘে জমি! সহজে ছাড়বে না বিশু। আদালতে যাবে। সে নালিশ করবে একদফা। আর দয়াময়কে দিয়ে করাবে আর একদফা। বিশু জানে দেবুকে চিনু জোর করে চাকদা থেকে সেদিন নিয়ে এসেছে।

নিশু মনে মনে হাসে ঃ তার দাদাকে সে ভাল করেই জানে।

॥ দশ ॥

দয়াময়কে নিশু নিজের বাড়িতেই পেয়ে গেল। হবু বেয়াই অবিনাশ গাঙ্গুলীর বাড়ি যথাসময়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল দয়াময়।

জীবন ঘটক অপূর্বকে নিয়ে আগেই দেখা করেছে অবিনাশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। বলেছে ঃ অপূর্ববাবুই বলুন, সোনার চাঁদ ছেলে কি-না। এরকম ছেলে সচরাচর মেলে না। গাঙ্গুলী মশায়ের পুণ্যি আর জীবন ঘটকের হাতযশ তাই এমন ছেলে পেয়ে গেছেন। কার্তিক—কার্তিক বলতে পারেন। এমন জামাই!

হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছিলেন অবিনাশ গাঙ্গুলী জীবন ঘটককে। বড়ো বেশি কথা বলে ঘটকেরা। বলেন ঃ এতো কথা বল কেন? সংক্ষেপে বলো, দয়াময় বাড়ুজ্জে এখানে আসছে কি না। ব্যস্!

বিনয়ে ভেঙে পড়ে জীবন ঘটক ঃ লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না স্যার। তাই ঘটকেরা সেটা পুষিয়ে নেয়। তা' বাড়ুজ্জে মশাই শিগ্‌গির আসছেন। তবে কিছু আগাম লাগবে।

—সে কি হে! বিস্মিত হন অবিনাশ গাঙ্গুলী ঃ আগাম কি? বিয়েতে আবার আগাম? দাদন দিয়ে রাখব নাকি?

জীবন ঘটক বলে ঃ না স্যার, ধরুন বায়না দিয়ে রাখলেন। তার জন্যে দস্তুরমতো

লেখাপড়া হবে। দয়াময় বাড়ুজ্জে লিখবেন, আমি চাকদা নিবাসী শ্রীদয়াময় বাড়ুজ্জে এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান—

—থাম। জীবন ঘটককে বাধা দিয়ে অবিনাশ গাঙ্গুলী বললেন ঃ বায়না না হয় করে রাখব, কিন্তু টাকা তো ওই দেড় হাজার?

জীবন ঘটক বলল ঃ আজ্ঞে, ওই দেড় হাজার।

অপূর্ব এবার কথা বলল ঃ না, দাদা, উনি আরো দু'শ বেশি চাইছেন। তা' আমি বললাম, দাদা আমার ভালো মানুষ—

—বেশ করেছ। বলে উঠলেন অবিনাশ গাঙ্গুলী ঃ দাদাকে না ডুবিয়ে শান্তি পাচ্ছ না? ভালো মানুষ! ভালো মানুষ বলেই তো সবাই চারদিকে ওৎ পেতে আছে।

জীবন ঘটক বুঝিয়ে বলে ব্যাপারটা। এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইচ্ছে হলে দেবেন, না হয় দেবেন না। কাজেই এ নিয়ে উতলা হবার কিছু নেই।

যথাসময়েই এসে উপস্থিত হয়েছিল দয়াময়।

বেশ একটুখানি ভদ্রস্থ হয়েই এসেছিল সে। গোঁফটা ছেঁটেছে—বহুকাল পরে দাড়ি কেটেছে। কাপড়-জামা বেশ পরিষ্কার। মিনু যথাসাধ্য স্বামীর খোলসটার মলিনত্ব ঘুচাবার চেষ্টা করেছে। অমনি তো দয়াময় মিনুর ওপর চটেই রয়েছে, দেবুকে সেই জোর করে চিনুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে। তারপর দয়াময় কেবল শাপ-সাপান্তই করেছে, একটা ভালো কথাও বলেনি। তথাপি স্বামী সে। বাংলার কুলবধূ স্বামীকে ত্যাগ করে যেতে পারে না, তাকে ঘৃণাভরে দূরে সরিয়েও রাখতে পারে না। দয়াময়, যখন যাবেই এক জায়গায়, আর বোল পাল্টে তার একটুখানি ভদ্রস্থ হবার সাধ হয়েছে তখন তাকে সাহায্য না করে পারেনি মিনু।

কথা বলায় যে দয়াময় কতো কুশলী, তা' প্রমাণ হয়ে গেল অবিনাশ গাঙ্গুলীর বাড়িতে। প্রথমেই বাত রোগ নিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করল। বাত হল বড়লোকদের সার্বজনীন ব্যাধি। বাত যাঁর আছে তিনিই বড়লোক আর যিনি বড়লোক তাঁরই বাত। সুতরাং বাতকে সৌভাগ্যের একটা অংশও বলা যায়। যন্ত্রণা? সে তো থাকবেই। বলে, দশ মাস দশ দিন যন্ত্রণা ভোগ না করলে মনুষ্য জন্মই হয় না। তাই বাত নিয়ে চিন্তিত হবেন না গাঙ্গুলী মশাই। এ থাকবেই। তবে হ্যাঁ, যাতে নিরুপদ্রব থাকে, তা দেখতে হবে। তার জানা প্রতিকারও জানা আছে দয়াময়ের।

একেবারে প্রত্যক্ষ সব ঘটনার কথা বলে যায় দয়াময়। কবচ, তাবিজ, টোটকা, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক সব দিকের খবরই সে রাখে। বেয়াই সম্বন্ধটা পাকা হয়ে যাক। তারপরই সে লেগে পড়বে। গাঙ্গুলী মশাইকে কিছু ভাবতে হবে না। দয়াময় থাকবে কি জন্যে যদি তাঁর মুখে হাসি ফোটাতেই না পারল?

সত্যি হাসি ফুটল অবিনাশ গাঙ্গুলীর মুখে।

কিন্তু গাঙ্গুলীর আরো যাতনা আছে। বিষয়-সম্পত্তির যাতনা। নিজে বিছানায় পড়ে থাকেন, কে যে কখন লুটেপুটে নেয় কোন দিক দিয়ে সেই চিন্তা।

তার কি উপায় আছে যদি দয়াময় বেয়াই হয়?

অবিনাশ গাঙ্গুলী অবশেষে আরো দু'শ টাকা বেশি দিতেই রাজি হয়ে গেলেন। আর আগাম? তাও নিয়ে যান বেয়াই পাঁচশ টাকা। আর মেয়ে দেখে বলুন যে, পছন্দ হয়েছে।

বিলক্ষণ পছন্দ হয়েছে দয়াময়ের। সে বলল ঃ আপনাকে দেখেই আপনার মেয়ে দেখা হয়ে গেছে। আর দেখে কি হবে? কিন্তু বেয়াই, আগামটা কিছু বাড়িয়ে দিন। ঘর-দোরের শ্রী একটুখানি ফেরাতে হবে। একেবারে এষ্টিমেট করে বসে আছি। ছ'শ পঁচিশ অন্তত। এ না হলে চলছে না।

দয়াময়ের মনে মনে সত্যি একটা হিসেব আছে। একশ পঁচিশ টাকা তার অতিরিক্ত চাই। পাঁচশ টাকা সে মজুত রেখে দেবে।

ছ'শ পঁচিশটা টাকা গাঁটে বেঁধে বাড়ি ফিরে এলো দয়াময়। রাস্তাটা পার হয়ে এসেছে সে যেন মাটি না ছুঁয়েই। রেলগাড়ি তো নয়, যেন পুষ্পক। আকাশে উড়ে চলেছে।

কিন্তু দেবু? দেবুকে চাই এবার। চিনুর কবল থেকে তাকে উদ্ধার করতেই হবে।

চাকদা ফিরে পরদিনই এসে উপস্থিত হল দয়াময় বাসুদেবপুরে।

চিনু বাড়ি নেই। দেবু ছিল, সে বাবাকে দেখে শুধু শুষ্ককণ্ঠে সংবাদটাই জানাল, বড়মা তার বাড়ি নেই। তারপরই বই নিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, হেডমাষ্টারের কাছে পড়তে। এক কথায় বাবাকে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল। অথবা পালিয়েই গেল। দয়াময় ডেকেছিল, দেবু শোন্। কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকায়নি সে। যেন ডাকটা শুনেইনি।

দয়াময় অগত্য শ্বশুরবাড়িতেই—অর্থাৎ বিশুর বাড়িতেই এসে নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করল।

বিশু যেন তার অপেক্ষা করেই ছিল। সে যেন জানত দয়াময় আসবেই আর তারই কাছে আসবে।

সাগ্রহে অভ্যর্থনা করল বিশু দয়াময়কে ঃ এসো দয়াময় এসো দয়া করে যখন এসেছ তখন বসো। তারপর বল খবর কি। মিণ্টু কেমন আছে?

অনেক কথা হল বিশুর দয়াময়ের সঙ্গে। শলা পরামর্শ। বিশু বলে দিল, আদালতে নালিশ ঠুকে দিক দয়াময়। এ ছাড়া আর উপায় কি? দয়াময় নালিশের আরজিতে লিখবে—"ধর্মাবতার, আমার আত্মীয়া শ্রীমতী চিন্ময়ী দেব্যা আমার নাবালক পুত্র শ্রীমান দেবব্রতকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিয়া এত ধারার অপরাধ করিয়াছে। এই বে-আইনি আটকের প্রতিবিধান করিতে আদেশ হয় এবং উক্ত দেবব্রতকে

তাহার নির্ব্যূঢ় দখলকার পিতা আমার অধিকারে অর্পণ করিবার বিহিতাদেশে প্রদান করা হয়।" ব্যস্, দেবুকে ফিরিয়ে দিতে চিনু আর পথ পাবে না।

দয়াময় বিশুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে।

কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি? ছেলেটাও যদি বাবার পক্ষ নিতো তাহলে চিনুর সাধ্য ছিল কি?

আদালতে যাবার সংকল্প নিয়েই দয়াময় বাসুদেবপুর ত্যাগ করল।

॥ এগারো ॥

আসানসোলে চাটুজ্জে মশায়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল চিনু।

অধর চাটুজ্জে ব্যবসায়ী। কাপড়ের ব্যবসা তাঁর। কবে একসময় ছোট্ট একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে অধর চাটুজ্জে কাপড়ের দোকান খুলেছিলেন। কেউ ভাবতে পারেনি ছোট দোকানখানি এমন করে বড়ো হবে। বড়ো তো যেমন তেমন বড়ো নয়। বৃহৎ বড়ো। অর্থাৎ আর দু'দিন পর বোধ করি কারবারটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এমন বড়ো বাড়বে যে, সাপটে রাখা যাবে না।

ছোট্ট ঘর বড়ো হয়েছে। নানা ডিপার্টম্যাণ্ট এখন দোকানের। বহু কর্মচারী। কি কাপড় যে পাওয়া না যায় চাটুজ্জের দোকানে! ছোট বড়ো, মাঝারি সব রকমের ক্রেতাদের চাহিদা মেটান চাটুজ্জে। ফ্যাসান চান, তাও পাবেন। নতুন নাম কলকাতায় চালু হয়েছে অমনি চাটুজ্জের দোকানেও এসে গেছে। দর্জিবিভাগে আধুনিক কাটেরও ব্যবস্থা আছে। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুর চাহিদাই মেটাতে প্রস্তুত।

ব্যবসাই শুধু বড়ো হয়নি, সব দিকেই তাঁর বড়োত্ব দেখা গেছে। বড়ো বাড়ি, বড়ো গাড়ি হয়েছে। মেয়ে অমলা গাড়ি চড়ে স্কুলে যায়—গাড়ি চড়েই ফিরে আসে।

সব বদলেছে, কিন্তু চাটুজ্জে একটুও বদলাননি। পোষাক পরিচ্ছদে চালচলনে, কিছুতেই না। সেই একই ধরণের ধুতি জামা পরে নির্দিষ্ট সময়ে দোকানে গিয়ে তাঁর স্থানটিতে বসেন। সেই প্রথম ব্যবসা জীবনের কেন তক্তপোষের ওপর বিছান গদীতে কাঠের বাক্সটি সম্মুখে নিয়ে বসেন। প্রয়োজন হলে নিজেই ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। নিজের জিনিসের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়িত্ব প্রমাণ করবার জন্যে বক্তৃতাও দেন।

তিনি বদলাননি, আর বদলাননি চাটুজ্জে গিন্নী।

তেমনি অন্তঃপুরবর্তিনী হয়ে আছেন তিনি। ঠিক যেমনটি ছিলেন। বাড়ি বদলের সঙ্গে তাঁর কিছুই বদলায়নি।

চাকর বাকরের হেঁসেল প্রবেশ এখনও নিষিদ্ধ। বড় জোর একজন বামুন ঠাকুরণ থাকেন, তিনি রান্না বান্না করেন। সংসার আগলান নিজে চাটুজ্জে গিন্নি। বাইরের প্রসারকে বাইরেই ঠেকিয়ে রাখেন। ভেতরে যা' ছিল তাই থাকবে। মেয়ে তাঁর

আধুনিকা, কিন্তু তিনি প্রাচীনা। তাঁর কাছে গেলে মনে হবে না যে চাটুজ্জে বাড়ির গ্যারেজ গাড়ি আছে, গেটে দারওয়ান আছে আর বাগানে ফুল ফোটে।

অধুনা বাড়ীর বামুন ঠাকরুনটি চলে গেছে। হেঁসেলের কাজকর্ম নিজেই হাতে নিয়েছেন গিন্নী। তবে চাটুজ্জে চারদিকে একজন নতুন বামুন ঠাকরুণের খোঁজ করছেন। অনেককে বলা হয়েছে। বিপদ হয়েছে, আজকাল মেয়েরা বরঞ্চ কারখানায় খাটতে যায়, তথাপি কোথাও ভাত রাঁধতে আসে না। নেহাৎ যারা বাইরে বেরোতে সংকোচ বোধ করে, তারই এসব কাজে আসে।

চিনু যখন চাটুজ্জে বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াল, তখন নীচে রান্নাঘরের বাইরে ছিলেন চাটুজ্জে গিন্নী। দেখেই তাঁর মনে হল, মেয়েটি জাতে বামুন, আর এখানে কাজ করবার জন্যেই কেউ একজন পাঠিয়েছে।

গিন্নী বললেন ঃ ও, তুমি এসেছ? রজনীবাবুর মেয়ে পাঠিয়ে দিলে, না সরলবাবুর বৌ? আমার বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত না এলে এমনি লোকজন বেশি নেই মা। আমি, আমার স্বামী, আমার মেয়ে আর একটা চাকর। এই ক'জনের দু'বেলা দু'টি রান্না। তা' মাইনের কথা কিছু বলে দিয়েছে? না, আমাকেই বলতে হবে?

চিনু বিস্মিত হয়ে ভাবল, উনি ভেবেছেন সে চাকরি করতে এসেছে। সে বলল ঃ না মা, আমার আপনার সঙ্গে অন্য একটা কথা আছে।

অন্য একটা কথা। কে এই মেয়েমানুষ তাঁর সঙ্গে অন্য একটা কথা বলতে এলো? দেখে তো বামুন বামুন মনে হয়, তার ওপর আবার বিধবা। চাকরি করবে না?

গিন্নী চিনুকে নিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। নীচে দাঁড়িয়ে অন্য একটা কথা হয় না।

দোতলার গিন্নীর ঘরে গিয়ে চিনু একখানা চিঠি বের করে তাঁর হাতে দিল ঃ এই চিঠিখানি পড়ে দেখুন মা, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

বিব্রত হয়ে পড়লেন চাটুজ্জে-গিন্নী। তাঁর নামে চিঠি! এখন পড়েন কি করে? অথচ বাইরে কে না কে, তার সমুখে বলবেন, চিঠিটাও পড়তে পারেন না! চাটুজ্জেবাড়ির হয়তো সম্মান থাকবে না। আজকাল আবার সম্মানটা বড়ো ঠুন্‌কো হয়ে গেছে।

গিন্নী চিঠিখানা হাতে নিয়ে ডাকলেন ঃ আমলা, ওরে অমলা—

'যাই মা' বলে এসে উপস্থিত হল অমলা। সুন্দরী, তন্বী কিশোরী। চঞ্চল পদে এসে প্রবেশ করল সে। চিনু চেয়ে রইল তার দিকে। সত্যি, চেয়ে থাকতেই হয়।

চিনু বলল ঃ আপনার মেয়ে বুঝি?

গিন্নী এবার বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ঃ হ্যাঁ, আমার মেয়ে। ইস্কুলে পড়ছে, সামনের বছর পাশের পরীক্ষা দেবে। কি পরীক্ষারে?

চিনুই বলল ঃ বোধহয় ম্যাট্রিক। না, মা?

গিন্নী বললেন ঃ হ্যাঁ, তাই। কতো কতো বই আর খাতা।

—রক্ষে কর মা। বলল অমলা ঃ বল ডাকছিলে কেন?

গিন্নী বললেন ঃ এই চিঠিখানা পড় তো! আমাকে আবার কে যে চিঠি লিখল!

চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল অমলা ঃ

"শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার সঙ্গে আমার একবার পাগলা চণ্ডীর মেলায় দেখা হইয়াছিল, নিশ্চয় মনে আছে। আমি আপনার দিদির ননদের ছোটকন্যা। বাসুদেবপুর গ্রামে আমার বিবাহ হইয়াছে। আমি আপনার নিকট আত্মীয় বলিয়া এই চিঠিখানি লিখিতেছি। যে মেয়েটি এই চিঠি লইয়া আপনার নিকট যাইতেছে, তাহার এক বোনপোকে সে মানুষ করিয়াছে। সেই ছেলেটিকে আসানসোল গিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। সেখানে তাহার আপনার লোকজন কেহ নাই। আপনি বড়লোক। আপনি যদি দয়া করিয়া কয়েকটি দিন আপনার বাড়িতে তাহাদের একটুকু ঠাঁই দেন তাহা হইলে গরীবের বড় উপকার করা হইবে। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। নিবেদন ইতি।

মনোরমা।"

মনোরমা! বাসুদেবপুরে বিয়ে হয়েছে। দিদির ননদের মেয়ে—নিকট আত্মীয়! পাগলা চণ্ডীর মেলায় দেখা হয়েছিল! চিন্তিত হয়ে পড়লেন চাটুজ্জে-গিন্নী। কই তাঁর তো মনে পড়ছে না।

তিনি বললেন ঃ কখন দেখা হয়েছিল ওই মেয়েটির সঙ্গে? দিদির ননদের মেয়ে! দিদি মরেছে আজ সাত বছর।

অমলা বলল ঃ তোমাকে অতসব মনে করতে হবে না মা, ওঁর ছেলে যে ক'দিন পরীক্ষা দেবে, সেই ক'টা দিন এখানে থাকবে, খাবে। উনিও থাকবেন ছেলের সঙ্গে! তুমি থাকতে দিতে পারবে কি না, তাই বলে দাও।

চিনু বলল ঃ হ্যাঁ মা, এতো কষ্ট করে ছেলেটাকে পড়ালাম, ক'টা দিনের জন্যে এখানে কোথাও থাকবার ব্যবস্থা যদি করতে না পারি তো সব যাবে বেচারার, পরীক্ষা দেওয়া হবে না।

গিন্নী বললেন ঃ এই দ্যাখো, তুমি আমাকে কি রকম ফ্যাসাদে ফেললে। এসব কথার জবাব দিতে হলে বাড়ির কর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আমি শুধু নামেই এবাড়ির গিন্নী। অমলা, দ্যাখ তো মা, তোর বাবা চলে গেছে না আছে। যদি থাকে তো ডেকে দে।

অমলা বাবা বাবা বলে বেরিয়ে গেল।

চিনু জিজ্ঞাসা করে ঃ আপনার এই একটি মেয়ে?

—হ্যাঁ মা, এই একটি মেয়ে।

—আর ছেলে?

—ছেলে নেই। ওই একটি মাত্র মেয়ে, আর কিছু নেই। তা' ওর বাপ বলে ওই আমার ছেলে, ওই আমার সব। তাই ইস্কুলে দিয়েছে—পড়ছে।

—কোন ক্লাসে পড়ে? ওঃ, সামনের বছর পরীক্ষা দেবে।

—আমি অতসব জানিও না মা, বুঝিও না। অমলাকে জিজ্ঞাসা করলে সব জলের মতো বুঝিয়ে দেবে। এতো জানে মেয়েটা।

—আপনারা চাটুজ্জে না?

—হ্যাঁ মা, চাটুজ্জে বামুন।

সিঁড়িতে পদশব্দ। অধর চাটুজ্জে তিনতলা থেকে নেমে আসছেন। চাটুজ্জে গিন্নী এবার নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। চিনু বিস্মিত হল। যারা ওদের জানে না, তারাই বিস্মিত হবে। চিনু ভাবছিল, ব্যাপার কি!

চাটুজ্জে গিন্নী চাপা গলায় বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করেছেন চিনুর কাছে এগিয়ে এসে ঃ ওই তো আসছে। তা' দেখে বল তো, কই, বামুন বলে মনে হবে? মিন্সে এমন ছিরি ধরে থাকে, মুচি মুদ্দোফরাস বলে মনে হয়। মস্ত বড় কাপড়ের ব্যবসা মা, এতো টাকা রোজগার করে, বলি যে ভাল কাপড় জামা পর, নইলে লোকে বলবে কি! তা' বলবার জো আছে, তেড়ে মারতে আসে।

চাপা গলায় কথাগুলো বললেও মারতে আসে কথাটা কর্তার কানে গেছে।

অধর চাটুজ্জে অমলাকে সঙ্গে করে প্রবেশ করেই বললেন ঃ কে, কে কাকে মারতে আসে? খবরদার, খবরদার বলছি, মারামারি করো না। ভাল কাজ হবে না। কি বলছিলে?

—বলছিলাম? গিন্নী কিছুক্ষণ থেমে বললেন ঃ ওই শোন, মেয়েটি কি বলছে।

চাটুজ্জে বললেন ঃ কি বলছে? মাইনে কুড়ি টাকার বেশি দিতে পারব না। খাওয়া-দাওয়া আর কুড়ি টাকা, ব্যস।

—এই দ্যাখো। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন চাটুজ্জে গিন্নী ঃ নিজের গোঁ ধরেই আছে। আগে শোন ও কি বলছে। ও রাঁধুনি নয়, রাঁধতে আসেনি, ও এসেছে—নাও বাছা, কি জন্যে এসেছ?

চিনু বলল ঃ আমার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে এবার।

চাটুজ্জে বললেন ঃ ভালো, ভালো। সে তো এই দিনকতক পরেই। নয় রে অমলা? আমার অমলাও পড়ে যে। ওর আর এক বছর—ব্যস্ ও' ও পরীক্ষা দেবে।

চিনু বলল ঃ তাই বলছিলাম, আমার ছেলের সিট পড়েছে এখানকার ইস্কুলে। যে কদিন পরীক্ষা দেবে, সেই ক'টা দিন তাকে যদি দয়া করে আপনার বাড়িতে একটুখানি আশ্রয় দেন, তা'হলে গরীবের বড় উপকার করা হয়।

অধর চাটুজ্জে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ঃ উপকার? না, উঁহু, গরীবের উপকার আমি অনেক করেছি। খেতে পেলেই শুতে চায়। একটু উপকার করেছ কি

ব্যস, চুক করে মাথায় চড়ে বসবে। দুনিয়ার নিয়মও হচ্ছে এই, যার উপকার তুমি করবে সেই তোমার নিন্দে করবে। সাধ করে নিজের অপকার, নিন্দে আমি ডেকে আনতে চাইনে। শুনছো গিন্নী? এই দ্যাখো, ভালো কথা শুনবে না ওই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গিন্নী মনে মনে চটছেন। বললেন ঃ থাক্, আমার আর শুনে কাজ নেই। তুমি শোন। অতসব কথায় কাজ কি বাবু, তুমি ওর ছেলেকে থাকতে দিতে পরবে কিনা তাই বল।

চাটুজ্জে বললেন ঃ না। বেহিসিবি কাজ অনেক করেছি, বাবা, আর করব না। না গো মেয়ে, আমার এখানে হবে না, অন্য কোথাও দ্যাখো।

নিরাশ হল চিনু। কিন্তু উপায় কি?

ওদের প্রণাম করে চিনু বিদায় নিল ঃ বেশ, তাহলে চললাম।

চিনু চলে যাবার পরেই চাটুজ্জে-গিন্নী রণরঙ্গিণীর হুঙ্কার ছাড়লেন ঃ ছি, ছি, ছি। মানুযের এই উপকারটুকু করতে পারলে না তুমি? তা' করবে কেন? তুমি মানুষের গলা কাটোগে যাও বসে বসে। পাঁচ টাকার কাপড় কেমন করে দশ টাকায় বিক্রি করবে তাই দ্যাখোগে যাও। নরুকে কোথাকার! খাবে নরকে হাবুডুবু। তখন চীৎকার করে কাঁদবে আর বলবে যে, হ্যাঁ, বলেছিল চাটুজ্জে গিন্নী।

—এ হে হে, যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। বললেন চাটুজ্জে ঃ এটা কেন করলাম জানো? যে ক'দিন থাকবে ছেলেটি, রাঁধবে কে? তুমি রেঁধে দিতে পারবে সকাল সকাল?

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন গিন্নী ঃ না, আমি রেঁধে দেব না, তুমি রেঁধে দেবে। বাবাঃ, আমার ওপর দরদ কতো।

চাটুজ্জে দেখলেন মেয়েটাকে ডাকিয়ে এনে ছেলেটাকে থাকবার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আর রক্ষা নেই। গিন্নী আর কিছুতেই শান্ত হবেন না। দোকান পাট সব চুলোয় যাবে, চাটুজ্জেকে গিন্নীর রাগ মেটাবার জন্যে সাধ্য সাধনা করতে হবে। তাও কি রাগটা যাবে।

অমলা দূরে দাঁড়িয়ে বাবা-মার ঝগড়া দেখছিল। সর্বদাই এমনি ঝগড়া হয়। দেখতে দেখতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাকে চাটুজ্জে আদেশ করলেন মেয়েটিকে ডেকে আনতে।

অমলা চলে গেলে তিনি বললেন ঃ তা' এ কাজটা আমাকে জিজ্ঞাসা না করে নিজেও তো করতে পারতে!

—ক'খনো করেছি? বললেন গিন্নী ঃ নিজের ইচ্ছেয় কখনও কোন কাজ করেছি যে, আজ করতে যাব? এই যে তোমার এতো এতো টাকা, তা' কোনদিন চারটে পয়সা হাতে তুলে কাউকে দিয়েছি?

—কেন দাওনি? দিলেই তো পারো। সিন্দুকের চাবি তো তোমারই হাতে।

—হ্যাঁ, তোমার সিন্দুক খুলে টাকা দিই, তারপর দশ টাকা দিতে গিয়ে একশ' টাকা দিয়ে ফেলি। তা'হলে তোমার খুব মজা হয়। আমাকে আচ্ছা করে কথা শোনাতে পার! না?

—তুমি দশ টাকার একশ টাকার নোট চেনো না সেটা কি আমার দোষ?

—দোষ নয়? তুমি তো দোকান থেকে খুচরো দশ বিশ টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে বলতে পারো, এই নাও গো অমলার মা, এই তুমি খরচ করো। তা' দিয়েছ কোন দিন? হুঁ হেঁ বাবা, তা আর দিতে হয় না! আমি নামেই শুধু বাড়ির গিন্নী। সেই কথায় আছে না, 'সর্ব্বস্ব তোমার চাবি কাঠিটি আমার।' তোমার হয়েছে তাই।

অমলার সঙ্গে চিনু এসে পড়ল। সে ভাবছিল, মেয়েটি আবার তাকে ডেকে আনল কেন! চাটুজ্জে মশাই তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, হবে না।

কিন্তু মত বদলেছে চাটুজ্জের। আসতেই বললেন, তুমি এসো তোমার ছেলেকে নিয়ে বাছা, এখানে থেকেই তোমার ছেলে পরীক্ষা দেবে।

চিনুর বুক থেকে দুর্ভাবনার একটা পাহাড় যেন নেমে গেল।

চাটুজ্জে আরো বললেন ঃ দু' একদিন আগে এসো। হড়বড় করে ছুটে এসে পরীক্ষা দেওয়া হয় না। ছেলেটার একটু বিশ্রাম দরকার।

চিনু সকৃতজ্ঞ চিত্তে চাটুজ্জ্যেকে প্রণাম করল ঃ আপনি আমার কি উপকার যে করলেন!

চাটুজ্জ্যে বললেন ঃ প্রণাম করছো? আমাকে কেন? ওই ওকে প্রণাম কর। আমি তো তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম গো ওই আবার ডাকতে বলল। তবে হ্যাঁ, ও আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, আমার নাম কিছু বলে তো বিশ্বাস করো না।

চিনু গিন্নীকে প্রণাম করতেই তিনি তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। ওদিকে চেয়ে বললেন ঃ মিন্সে কোন কালেই সত্যি কথা বলে না মা।

॥ বারো ॥

আসানসোল থেকে বাড়ি ফিরে এলো চিনু। এবার দেবুকে যাত্রার আয়োজন করতে হবে।

কিন্তু এসেই শুনল দয়াময় এসে একবার খোঁজ নিয়ে গেছে। শুধু খোঁজ নেওয়াই নয়, দেবুকে নিয়ে যাওয়াই তার ইচ্ছে ছিল। বিয়ে সে ঠিক করে ফেলেছে।

দেবুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি আসানসোল পালাতে হবে চিনুকে।

এদিকে বিশু গাঁ জুড়ে একটা হৈ চৈ বাঁধিয়ে বসে আছে।

জীবন-স্বত্বের জমি কিনা চিনু বিক্রি করে ফেলতে চায়।

আসানসোল থেকে ফিরে শুনল চিনু, বিশু কয়েক বারই তাঁর খোঁজ করে গেছে। যেদিন সে ফিরে এলো, সেদিনও একবার এসে উঁকি মেরে সোজা চলে গেল নিশুর কাছে।

বার বার এসে বিশু খোঁজ করেছে, আজ তাকে বাড়িতে দেখেও কথাটি পর্যন্ত বললে না। চিনু পিছু ছুটলো।

দাদাকে দেখে নিশু বলল ঃ কেন মিছিমিছি কেলেঙ্কারি বাড়াও দাদা? চিনুর মনে কষ্ট হবে না?

বিশু বলল ঃ আর আমার কষ্ট হচ্ছে না? দশ বিঘে ভাল জমি বেহাত করে দিচ্ছে।

'দাদা! দাদা, ডেকে চিনু এসে উপস্থিত হল।

বলল ঃ আমার দোরে একবার উঁকি মেরেই চলে এলে দাদা একটি বার ঢুকতেও পারলে না?

বিশুর অভিমান যেন ফেটে পড়ল। কি জানি ক্রোধেও হতে পারে। বলল ঃ ঢোকবার পথ তুই রেখেছিস্? বলি, আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব তুই রাখতে চাস না চাস না?

চিনু যেন আকাশ থেকে পড়ে ঃ তোমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখব না? আমার আর কে আছে দাদা? তোমাদের খেয়ে, তোমাদের পায়ের তলায় আছি—

—মুখে তো খুব কথা বলতে শিখেছিস্? কিন্তু আমাদের আমাদের বলছিস, আমাদের আর রইল কোথায়? বাবার দেওয়া জমি বাড়ি তুই দেবুর নামে লিখে দিয়েছিস্ সেটা কি উচিত হয়েছে?

—দেবু তো, তোমাদের পর নয় দাদা। দেবু তোমাদেরই ছোট বোনের ছেলে, তোমাদেরই পোষ্য।

—তবু উচিত হয়নি। কথায় আছে না, জন জামাই ভাগনা তিন নয় আপনা। ওকে তুই যতই করিস্, ও তোর আপনার হবে না।

চিনু তার দাদার এ মতিগতির কোন অর্থ বুঝতে পারে না। সে দেবুকে মানুষ করেছে। তাকে তার বাবার আওতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিই বা আছে সেখানে। আছে শুধু অনাচার প্রতারণা আর কুশিক্ষা। ওই আবহাওয়ায় কি একটা ছেলে মানুষ হয়ে উঠতে পারে? দেবুকে সে শিক্ষিত করে তুলবে। তাকে মানুষ করবে। বাবা তাকে যে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, সে সম্পত্তি যদি সে দেবুকে দিয়ে যায়, তার মৃত্যুর পর দেবু যদি সে সম্পত্তির মালিক হয়, তাহলে দাদা বাধা দেবে কেন? বাসুদেবপুরে থাকবে দেবু। লোকে বলবে, বাসুদেবপুরের মুখুজ্জেদের দৌহিত্র। গৌরব তো বিশু আর নিশু মুখুজ্জের। এতে সুনাম ছাড়া দুর্নাম নেই।

বিশু এসব ধর্ম কথা শুনতে রাজি নয়। সেই ওই জমি দেবুকে নিতে দেবে না।

চিনুর মুখে একটা কঠোর বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। দেবে না?

সে শেষ কথা বলে ঃ আমি পেয়েছিলাম বাবার কাছ থেকে। দিয়ে যাব দেবুকে। তোমরা বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবে না।

নিশু প্রশ্ন করে এবার ঃ বাবা কি শেষ পর্যন্ত তোকে কিছু লিখে দিয়ে গেছে?

বিনু বলে ঃ যদি বলি দিয়েছে।

নিশু আশ্বস্ত হয় ঃ তাহলে আর বলবার কি আছে!

বিশু হুঙ্কার ছাড়ে ঃ আলবৎ আছে। বলবার কিছু নেই মানে? আমরা কিছু জানলাম না, শুনলাম না। আইনে এটা টিকবে না।

চিনুর কণ্ঠে বিদ্রূপের ধারাল হয়ে উঠল ঃ এই আনন্দেই থাকো দাদা। আমি চললাম, রান্না ফেলে এসেছি।

চিনু আর বসল না সেখানে। বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

বিশু বলল ঃ দেখলি, নিশু, চিনুর অহঙ্কারটা দেখলি? সব মিছে কথা চিনু, বাবা তোকে কিছু লিখে দেননি।

যেতে যেতে চিনু গর্বভরে জানিয়ে দিয়ে গেল দাদাদের। মিছে কথা সে বলে না। সে জন্যেই, সহায় নেই, সঞ্চয় নেই একা এই পৃথিবীতে এখানো টিকে আছে।

চিনু চলে গেল, আর বিশু চিৎকার করে উঠল ঃ এতো তেজ তোর! শুনলি নিশু, চিনুর কথা?

নিশু সবই শুনেছে। সে স্বীকার করে চিনুর সত্যি বাহাদুরি আছে। বিধবা মেয়ে মানুষ, সংসারের সব দিক দেখছে আবার একটা ছেলেকেও মানুষ করছে।

বিশু আরো ক্ষেপে গেছে। সে ওর বাহাদুরি আছে স্বীকার করে না। মামলা করবে সে চিনুর নামে। বুড়ো বয়েসে বাবা যদি কিছু একটা লিখে দিয়েও থাকেন, তাহলেও আদালতে টিকবে না। লড়বে। হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়বে বিশু। কিন্তু নিশুকে তার পাশে দাঁড়াতে হবে।

নিশু ভেবে পাচ্ছে না, সতি যদি বাবা লিখে দিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে নালিশেই বা কি হবে। বরঞ্চ বিশু আগে গিয়ে রেজিষ্ট্রি আপিসে খবর নিক, সত্যি সত্যি ওরকম কোন দানপত্র রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে কিনা। হয়ে যদি থাকে, তা'হলে তো ফুরিয়েই গেল। বাবার সম্পত্তি তিনি দান করে গেছেন, কার কি বলবার আছে! ছেলেদেরই বা বাধা দেবার অধিকার কোথায়? তাছাড়া, চিনু তাদের মায়ের পেটের বোন। তার নামে তারা আদালতে নালিশ করবে, সে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াবে! উকিল জিজ্ঞাসা করবে বাবার নাম কি? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ—এ হতে পারে না। নিশু এতে নেই। কিছুতেই থাকতে পারে না।

বিশুর ক্রোধের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। সে বাধা সইতে পারে না। প্রতিবাদ

হলেই সে আরো জ্বলে ওঠে। চিনুটা তো ভয়ই দেখিয়ে গেল, চ্যালেঞ্জ করল, যা' পার করো। এখন নিশুও ওই দলে ভিড়ল!

ঝগড়া হয়ে গেল বিশু নিশুতে। নিশু ঠিক ঝগড়া করেনি, কিন্তু বিশু করল।

বিশু স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলঃ আমার সঙ্গে তুই আদালতে যাবি কি না বল নিশু।

—আমি তো বললাম দাদা, আমাকে মাপ্ করো।

—তা'হলে তুই যাবিনে আমার সঙ্গে?

—না।

—তোকে যদি সাক্ষী মানি?

—না।

—যদি দেখি বাবা কিছু লিখে দিয়ে যাননি, তবু যাবিনে?

—না।

—নিশে, আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার কথাবার্তা বন্ধ।

—বেশ।

—আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার খাওয়া দাওয়া বন্ধ।

—ভালো।

—ভালো? আচ্ছা দ্যাখ তবে, তোকে আর চিনুকে আমি জব্দ করতে পারি কি না।

—দেখেছি, দেখেছি। তোমার ও মুখের আস্ফালন আমার অনেক দেখা আছে। আচ্ছা দাদা, খামোকা ওসব খারাপ কথাগুলো বলে তুমি মুখদোষী কে হতে বলতে পার? তুমি করবে না কিছুই আমি জানি।

—উত্তেজিত করসিনে আমাকে। আমাকে খুব জানিস্ তাহলে তুই, খুব চিনিস্। ইস্টুপিড কোথাকার।

বিশু রাগ করে চলে গেল। প্রতিজ্ঞাটা আবার সরবে উচ্চারণ করল যে, নিশুর সঙ্গে আজ থেকে সব বন্ধ, মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত।

ওদিকে দয়াময়ও আবার এসেছিল। বিশুকে এসে বলেছিল, একটা উপায় করে দাও দাদা।

তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বিশু। বলেই তো দিয়েছে সে আদালতে যাক, তা নয় এসেছে একটা উপায় করে দাও দাদা! সব কাপুরুষের দল। ওই নিশেটা যেমন, দয়াময়ও তেমনি।

দয়াময় কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে গেছে, সে আদালতেই যাবে।

নিশুর সঙ্গে আর কথা বলে না বিশু। তবে মাঝে মাঝে নিশুর ঘরের সুমুখ দিয়ে যাওয়া আসা করে। নিশু যদি ডাকে, দাদা! শোন। অমনি সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আপন মনে বিড় বিড় করে বলতে থাকে ঃ দাদা! কি বেহায়া। জানে প্রতিজ্ঞা করে

কথা বন্ধ করে দিয়েছি, তবু ডাকবে দাদা। হতভাগাটা আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে দিতে চায়। কিন্তু আমি বিশু মুখুজ্জে। বিশু মুখুজ্জে নড়তে পারে কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা নড়ে না।

আসানসোল যাবার আগে চিনু দেবুকে সঙ্গে করে বিশুদের বাড়ি এসেছিল। দেবু পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, মামাদের প্রণাম করে যাবে।

দেবু প্রণাম করছে, কিন্তু বলে উঠল ঃ আমাকে আবার কেন, তোর বড়মাকে প্রণাম কর। সেই আশীর্বাদ করবে, তাহলেই হল।

—কি যে বল দাদা, বলে চিনু ঃ তুমি হলে বড়ো মামা!

বিশু বলে ঃ তা' হ্যাঁ, যাও বাবা, পাশ করে এসো। তুমি ছেলে মানুষ। তোমার সঙ্গে—হ্যাঁ, আশীর্বাদ করছি। তবে তোমার ওই বড়মাটি, চিনু—চিনুকে আমি দেখে নেবো। সে—আমাকে চ্যালেঞ্জ করে।

দেবু কিছুই বুঝে না। চিনু তাকে নিয়ে নিশুর ঘরের দিকে যায়।

॥ তেরো

সংঘর্ষ তাঁদের লেগেই আছে।

অধর চাটুজ্যে আর তাঁর গিন্নী।

দেবু বিস্মিত হয়ে ভাবে ওঁদের স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ হলেই কেন ঠোকাঠুকি বেঁধে যায়। এ যে কেন হয়, সে বুঝতে পারে না। চিরটা কালই কি তাঁরা এমনি ঝগড়াঝাটির মধ্যে কাল কাটিয়ে আসছেন? অথচ বড়মা বলেন, বড়ো শান্তি ও সুখের সংসার চাটুজ্জের। একেই কি বলে শান্তি আর সুখ?

অমলা শিশুকাল থেকেই এ দেখে অভ্যস্ত। সে দেখে যায়। শুনে যায়। এখন আর মনে কিছু করে না। এ নিয়ে তার ভাবনা চিন্তাও নেই।

চিনু বিস্মিত হয় না। মাঝে মাঝে কৌতুক অনুভব করে। আনন্দও হয় তার। এই ঝগড়া বিবাদই ওদের গভীর অন্তরঙ্গতার আর এক রূপ। এই তার ধারণা। এই তাঁদের আনন্দ। সংঘর্ষের অভাব হলেই বোধ করি তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন। স্বামীকে আক্রমণ করে দু'টো চোখা চোখা কথা বলতে না পারলে হয়তো চাটুজ্জে-গিন্নী শয্যা নেবেন।

দেবুর পরীক্ষার ক'দিন চিনু ছেলেকে নিয়ে বেশ ভালোভাবেই কাটিয়েছে। এ বাড়ির তিনজন লোকেরই প্রখর দৃষ্টি রয়েছে দেবুর দিকে। কর্তা-গিন্নীর তো আছেই, অমলাও দেবুদার সুখ সুবিধার জন্যে ব্যস্ত। সকালে হয়তো দেবু বসে পড়ছে তো পড়ছেই, সময়ের প্রতি দৃষ্টি নেই, অমলা এসে উপস্থিত হয়ে তাড়া দেয়, ক'টা বেজেছে দেবুদা, খেয়াল আছে? সময়ে না গেলে 'হলে' ঢুকতে দেবে না। দেবুর

বিছানা, তার পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখে অমলা। প্রত্যেক দিন পরীক্ষা শেষ হয়, আর পরীক্ষা দেওয়া বিষয়ের বইখাতা সে টেবিল থেকে সরিয়ে রাখে। বলে, বাবা, একটুখানি বোঝাটা হাল্‌কা হোক, বাকি বইগুলোর হাড়ে বাতাস লাগুক।

পরীক্ষায় যাবার আগে খেতে বসেছে দেবু। রান্না বান্না হয়তো চিনুই করেছে। কিন্তু থালা বাটী সাজিয়ে দেবেন চাটুজ্জে-গিন্নী নিজে। পাশে বসে তাকে খাওয়াবেন। বলেন ঃ তোমার হাতে কি পেট ভরে খেতে পারবে ছেলেটা? পরের বাড়ি, তাই নিজের ছেলেকে যতো পারো কম দেবে। ছাই, একটা রাঁধুনিও পাওয়া যাচ্ছে না।

চিনু শোনে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসে।

চাটুজ্জেতে আর গিন্নীতে দেবুর ওই খাওয়া নিয়ে ঝগড়াও হয়ে যায়।

চাটুজ্জ্যে প্রথম দিন বলেছিলেন ঃ দু'টো করে ডিম খেয়ে যাবে দেবু, তা'তে শরীরে বল পাবে। কতো মাথা খাটাতে হয়!

গিন্নি তাড়া করে উঠেন ঃ যা' জানো না, তা নিয়ে কথা বলো না। এটা দোকানদারি নয়, লোকের গলা কেটে বাক্সে পয়সা তোলা নয়। পরীক্ষা দিতে ডিম খেয়ে যেতে হয় না। ও হলো অলক্ষুণে।

চাটুজ্জে কি বলতে যাচ্ছিলেন, গিন্নীর তাড়া খেয়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

দেবুর কি রকম বিশ্রী লাগে। তার খাওয়া নিয়ে ওঁরা দু'জন ঝগড়া বাঁধান।

সেদিন শেষ পরীক্ষা দিয়ে দেবু একটুখানি তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরল। কথা ছিল অমলা ফেরবার পথে গাড়িতে করে তাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু লেখা আগেই শেষ হয়ে যাওয়ায় দেবু আর অমলার জন্যে অপেক্ষা করেনি।

দেবু বাড়ি ফিরেই অধর চাটুজ্জ্যেকে প্রণাম করল।

চাটুজ্যে বললেন ঃ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল তাহলে? ওরে বাবা, যাবার সময় একটা, আসবার পর একটা, দু'টো প্রণাম? কেমন পরীক্ষা দিলে?

দেবু উত্তর দিল নত মুখে ঃ ভালো।

চাটুজ্যে বললেনঃ বাড়ির গিন্নীকে প্রণাম করেছো? গিন্নী আবার ভারী ইয়ে— মানে—

গিন্নী সেখানে ছুটে এলেন ঃ ভারী ইয়ে! ইয়ে মানে কি?

গিন্নী বললেন ঃ বল, বল, তোমার যা' মুখে আসে তাই বল। তোমার হাতে পড়ে আমার দুর্গতির বাকি কিছু রইলো না। ওকে কি বলতে চাচ্ছিলে?

চাটুজ্যে বললেন ঃ বলছিলাম, আমাকে দু'টো প্রণাম করবে, যাবার সময় একটা, এসে একটা, আর তোমাকে হয়তো একটাও করবেনি। তা ওর দোষ কি। মানে সত্যি বলতে—যাও বাবা যাও, তোমার সামনে আর কেন। আমাদের দু'টো মফঃস্বলী কথা আছে, ঝপাং করে সেরে ফেলি।

দেবু চলে গেলে পর চাটুজ্যে আবার বললেন ঃ দেখো গিন্নি, প্রণাম নেবার মতো চেহারা চাই। তোমার ওই পেতনির মতো চেহারা—তোমার পায়ে মানুষের মাথাটা সহজে হেঁটে হতে চায় না, বুঝলে?

—হ্যাঁ, তা বলবে বৈ কি। আমাকে তো চিরকাল তুমি পেতনিই দেখলে। আমি পেতনি, আমাকে কেউ তাই পেন্নাম করতে চায় না, আর তুমি হচ্ছে গিয়ে পরম সুরুপুরুষ, একেবারে কার্তিক ঠাকুরটি, তাই তোমার পায়ে মানুষ দিনরাত গড়াগড়ি দিচ্ছে। দ্যাখো, তোমার যদি পয়সা না থাকতো, লোকে তোমার পায়ে থুথু দিতো।

—তা, সে যে জন্যেই হোক, লোকে আমার পায়ে মাথা তো ঠোকে। পয়সাই বা ক'জনার থাকে? আমার তো তবু পয়সা আছে।

—সে পয়সা আছে কার জন্যে? এই পেতনির জন্যে। স্ত্রী ভাগ্যে ধন, একথাটা মনে থাকে যেন। আমি আজ মারা যাই, দেখবে কাল তুমি পথের ভিখিরি। হে ভগবান! আমি যেন মরে যাই। আমার যেন তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়। তখন যেন এই কাপুড়ে মিন্সে আমার জন্যে বসে বসে কাঁদে। আমি ভূত হয়ে যেন সেইটি দেখতে পাই হে ঠাকুর! আর আমার কিছু বলবার নেই।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। অমলা কোথায়?

—জানি না। কেন, তুমি জানো না? রাগিয়ে দিয়ে কথা কইবার ছল খুঁজছ? অমলা ইস্কুলে গেছে, এখনো আসেনি। কেন তার সঙ্গে কি দরকার?

—কিছু না। অমনি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তক্ষুনি আর বিবাদটার মীমাংসা হল না।

ওদিকে তখন অমলা ইস্কুল থেকে ফিরেছে। কাঁধে বইএর ব্যাগ নিয়ে চটি চট্‌চট্‌ করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠছে, দেবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে নীচে নামছিল।

অমলা তাকে দেখেই বলে উঠল ঃ বা, বা, বা! বেশ লোক। আমি গাড়ি নিয়ে আনতে গেলাম আর তুমি পালিয়ে এসেছ?

—গিয়েছিলে?

—বারে, যাইনি? রোজই তো যাই, রোজই তো নিয়ে আসি!

—তা' তো নিয়ে আসো। তোমার গাড়ি করে নিয়ে যাও, নিয়ে আসো। —আমি সে কথা বলছি না। আজ আমার শেষ পরীক্ষার দিন, তাড়াতাড়ি লেখা শেষ হয়ে গেল, খাতাটা দিয়ে আর চুপ করে বসে থাকতে ভালো লাগলো না। চলে এলাম।

—তার মানে, বলো যে ভাল লিখতে পারোনি। তাড়াতাড়ি যা' পেরেছো লিখে খাতাটা জমা দিয়ে পালিয়ে এসেছো।

—তা' যদি হয় তো তুমি খুশি হও, না?

—হ্যাঁ, বেশ হবে তা'হলে। আসছে বছর দু'জনে একসঙ্গে পরীক্ষা দেবো। খবরের কাগজে একসঙ্গে দু'জনের নাম বেরোবে।

—বাঃ বেশ ভাল মেয়ে তো তুমি! যা' বলেছ বলেছ—দেখো যেন আমার বড়মা শুন্‌তে না পায়।

—কি হবে শুনতে পেলে?

—হবে আর কি, এই যে তুমি আমার মঙ্গল কামনা করছো, তার জন্যে চিরকাল তোমাকে মনে থাকবে।

—চিরকাল মনে থাকবে? আমাকে? তা'হলে তো এক্ষুনি বলতে হয়? মাসিমা, ও মাসিমা।

—আঃ ছিঃ, ও কি করছো?

—মাসিমা, বলি ও দেবুদার বড়মা—

দেবু এবার হাত দিয়ে অমলার মুখখানা চেপে ধরে বলল ঃ চুপ।

চিনুর কানে গেছে অমলার ডাক, তাই নীচে থেকেই সাড়া দিল ঃ কি রে!

বড়মার সাড়া পেয়ে অমলাকে ছেড়ে দিয়ে দেবু দৌড়ে ওপরে গিয়ে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে অমলাও গেল সেখানে।

চিনু সেখানে এসে প্রশ্ন করল ঃ আমাকে ডাকছিলে অমলা?

দেবু আর অমলা একসঙ্গেই কথা বলতে গেল। দেবু চায় সে আগে বলবে, অমলা চায় সে আগে।

দেবু ডাকল ঃ বড়মা।

অমলা ডাকল ঃ মাসিমা!

অমলা দেবুকে ধমক দিয়ে বলল ঃ তুমি থামো তো, আমাকে বলতে দাও।

পরাজয় স্বীকার করল দেবু ঃ বল!

অমলা বলল ঃ দেখুন মাসিমা, আজকে কোশ্চেন পেপার ও কিছু লিখতে পারেনি। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছে।

দেবু বলল ঃ তাই বলছে—তুমি এ বছর—

অমলা বাধা দিল কথায় ঃ না, না মাসিমা, আমি কিছু—ওর সব মিছে কথা।

দেবু বলল ঃ বলছে তুমি এ বছর ফেল কর। তা'হলে আসছে বছর দু'জনে একসঙ্গে পরীক্ষা দেবো।

হেসে ফেলল চিনু। বলল পাগ্‌লি মেয়ে! তা' দেবু, তুই গেলি না?

—এই যাচ্ছি বড়মা, ও যে বাধা দিল। বলল দেবু।

দেবু নীচে নেমে যেতেই পেছনে অমলার ডাক শুনল ঃ এই! এই!

দেবু ফিরে এসে বলল ঃ এই মানে? দিলে তো পিছু ডেকে?

অমলা বলল ঃ আজ্ঞে না। এই এই বলে ডাকলে পিছু ডাকা হয় না। নাম ধরে তো ডাকিনি।

দেবু বলল ঃ তোমার মাথার ছিট আছে।

অমলা ভ্যাংচি কেটে বলল ঃ হুঁ।

॥ চৌদ্দ ॥

চাটুজ্জে বাড়ীর কর্তা-গিন্নীর সংঘর্ষ সেদিন আর বন্ধ হয়ত হত না।

গিন্নী ফটফট করে বেড়ান। কর্তা বলেছেন, তাঁর চেহারা পেতনির মতো তাই দেবু তাঁকে প্রণাম করেনি। এতো বড়ো কথা! তার ঠিকমতো জবাব দেওয়া হয়নি। যতোই তিনি গাল-মন্দ করুন না, কর্তা যেন জিতেই গেলেন।

চিনু চা নিয়ে আসে। অমলাও তখন সেখানে রয়েছে,

চাটুজ্জ্যে বসে বসে কি কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছেন।

গিন্নী চিনুর ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেন ঃ তোর ছেলেটাকে দু'টো ভাত দিচ্ছি বলে তুই কি ঝি-চাকরাণীর কাজ করে দিবি নাকি আমার বাড়িতে।

চিনু উত্তর দেয়ঃ তা'তে কি হয়েছে দিদি।

গিন্নী ধরা গলায় বলেন ঃ কি হয়েছে তা' তুই বুঝবি না। এখন একটা কথার জবাব দে তো। এই যে কাপুড়ে মিন্সে, একে দেখলে বামুন বলে মনে হয়?

অমলা বুঝল, এই আবার শুরু হল। সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

চাটুজ্জে কাগজপত্র রেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন ঃ হাই দ্যাখ, এ আমার মান সম্মান কিছুই রাখলে না দেখছি।

চিনু হাসিমুখে বলল ঃ কি মনে হয় বলব দিদি? তোমাদের দু'জনকে দেখলে মনে হয়, তোমরা হর-পার্বতী। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছ এইখানে।

—হেঁ-হেঁ বাবা শোন। উল্লসিত হয়ে উঠলেন চাটুজ্যে ঃ ঠিক বলেছ তুমি।

গিন্নী মুখ বাঁকিয়ে বললেন ঃ হেঁ হেঁ বাবা শোন! ঠিক বলেছে। পার্বতী পেতনি ছিলেন?

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন চাটুজ্যে ঃ তা' অবিশ্যি ছিলেন না।

গিন্নী বললেন ঃ তাই বল, কখনো ছিলেন না। কিন্তু মহাদেব নেশাখোর, গাঁজাড়ে, পাগল ছিলেন।

—হাই দেখ। চাটুজ্যে বললেন ঃ আবার গালাগাল শুরু করলে?

—না। বললেন গিন্নি ঃ মহাদেবকে বিল্বপত্র দিয়ে অর্চ্চনা করব। তোর ছেলেকে ডাকতো চিনু। বলুক এই মিন্সের কাছে এসে—আমাকে ও পেন্নাম করেছে কি না।

ও কি বলে জানিস? বলে আমার নাকি পেতনির মতো চেহারা। তাই লোকে আমাকে পেন্নাম করতে চায় না।

চিনু বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলে ঃ ওমা, সে কি কথা? দেবু তো বাড়িতে নেই দিদি, তাকে আমি পাঠালাম এক জায়গায়।

গিন্নী বললেন ঃ তা' হলে ও ফিরে আসুক। তারপর এর মুখের ওপর বলে যাবে—আমাকে সে পেন্নাম করে কি না।

দেবু গেছে রাণীগঞ্জে তার জামাইদার সঙ্গে দেখা করতে। চিনুই তাকে পাঠিয়েছে। জামাইর সঙ্গে দেখা করে তাকে জানাবে দেবু, কেমন পরীক্ষা দিল সে। তারপর! আরো উদ্দেশ্য আছে। পরীক্ষায় পাশ করে কলেজে পড়বে দেবু। কিন্তু চিনু কি টাকা পয়সা জোটাতে পারবে? তাই ইঞ্জিনিয়ার জামাইদা যদি ফল বেরুবার আগে পর্যন্ত কিছুদিনের জন্যে তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে, কিছু টাকাও সে উপার্জন করে, তাহলে সেটা কাজে লাগবে। দেবুকে পড়তেই হবে আরো।

চাটুজ্জ্যে জানতেন না দেবু কোথায় গেল, কেন গেল।

কিন্তু অমলা জানে সে কোথায় গেছে।

চাটুজ্জে প্রশ্নের উত্তরে সব কথা খুলে বলল চিনু।

চাটুজ্জ্যের মত হল আর পড়াশোনা কেন! এখন কাজে লেগে পড়াই উচিত। তা'ও আবার কলকারখানা কাজ! উঁহু তা'তে উন্নতি কোথায়? বড়জোর মিস্ত্রীগিরি। নামটা না হয় ইঞ্জিনিয়ারই হল। কিন্তু তাতে কি? নামই তো সব নয়। ব্যবসা—ব্যবসায় লেগে পড়ুক দেবু। আগে ব্যবসা শিখুক। তারপর একদিন সে নিজেই একটা ব্যবসা ফেঁদে বসবে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। এ কখনো মিথ্যে নয়। অধর চাটুজ্যে নিজেই তার প্রমাণ।

একটা ফন্দি এসে গেছে চাটুজ্যের মাথায়।

কিন্তু গিন্নীকে না জানিয়ে তো কিছু হবে না। এদিকে গিন্নী চটেই রয়েছেন। মন্দ নয়, যদি এই সুযোগে আপোষটা হয়ে যায়। কিন্তু হল না।

চাটুজ্যে মোলায়েম কণ্ঠে গিন্নীকে প্রশ্ন করলেন ঃ কি গো, পুণ্যি করবে নাকি?

গিন্নী উগ্রকণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করলেন পুণ্য করার প্রস্তাব ঃ না, থাক্। তোমার পয়সা নিয়ে আমার পুণ্যিতে কাজ নেই। শেষে এখন খোঁটা দেবে যে, আমি সহ্য করতে পারব না।

নিরুপায়ের মতো বললেন চাটুজ্যে ঃ আচ্ছা বেশ, তবে আমি যা' ভালো বুঝবো করব। তোমাকে বলতে আসাই আমার ভুল হয়েছে। আমি একটা মতলব এঁটেছি—থাক বাবা, সে আমার মনেই থাক। বাবা বলতো, কাজ যদি উদ্ধার করতে চাও তো, চট করে পেটের কথা বলো না যাকে তাকে। হেঁ—হেঁ বাবা—কাপড়ের কেনা দাম কাউকে বলতে নেই।

গিন্নী বললেন ঃ জানি গো জানি, তোমার মতলব আমি জানি।

চাটুজ্যে হাসলেন ঃ ছাই জানো। কিছুই জানো না। কই বল দেখি, কি জান?

গিন্নী বলতে রাজি নন ঃ না, এখুনি তুমি রেগে যাবে।

চেপে ধরেন চাটুজ্যেঃ না, তুমি বল।

অগত্য গিন্নী বললেন ঃ চিনু যেই বলেছে—ছেলেটা কাজ শিখবে, অমনি ভাবছো ওকে তোমার দোকানে বসিয়ে দেবে।

—হুঁ। চাটুজ্যে বললেন ঃ দোকানটা বুঝি কিছু নয়? দোকানের কাজ শেখা বুঝি সোজা?

গিন্নী বললেন ঃ সোজা হোক, শক্ত হোক, চিনু সেটা পছন্দ করবে না।

রেগে উঠলেন চাটুজ্যে। না, আর আপোষ হল না। বললেন ঃ ধেৎ তেরি! তোমার সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয়। আমি একটা মতলব করলাম, আর এ মেয়েটা দেখছি সব মাটি করে দিতে চাইছে। এই জন্যেই বলে, মেয়েদের কথা শুনতে নেই।

চাটুজ্যে কিন্তু নিজের মতলব ত্যাগ করলেন না।

রাণীগঞ্জ থেকে ফিরছিল দেবু, চাটুজ্যেরই দোকানের সমুখ দিয়ে। চাটুজ্যে তখন নিজের গদিতে বসে আছেন। সেখানে বসে ঘরের বিভিন্ন বিভাগের ওপর যেমন দৃষ্টি রাখা যায়, তেমনি রাস্তার লোকজনের যাওয়া আসার দিকেও তিনি লক্ষ্য করতে পারেন। দেবুকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন চাটুজ্যে। সে পথের দু'পাশের বাড়ি আর দোকান-পাটগুলো দেখতে দেখতে পথ চলছিল।

চাটুজ্যে ডাকলেন তাকে। প্রথমে নামটাই তাঁর মনে পড়ে না। ওহে ছোকরা, ও ছেলেটি বলে ডাকতে লাগলেন। তারপর মনে পড়ে গেল, তাই তো, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়— দেবু। এবার দেবু, ও দেবু, বলে ডাকতেই দেবুর দু'পাশের বাড়িঘর দেখার ধ্যানটা ভঙ্গ হল। সে এগিয়ে গেল দোকানের দিকে। বিস্ময় তার আরো বেড়ে গেল। এতো বড়ো দোকান চাটুজ্যের সে কল্পনা করতে পারেনি। এতো লোকজন খাটছে সেখানে! ক্রেতাদের ভিড়। গিস্ গিস্ করছে ক্রেতাতে। কর্মচারীরা সব ব্যস্ত। বাসুদেবপুর বা চাকদার জীবনে সে এমনটি দেখেনি। গল্প সে শুনেছে। কলকাতার গল্প। রাণীগঞ্জে আর আসানসোলে তার নতুন অভিজ্ঞতা হল। রেলগাড়ি, বিরাট ষ্টেশনের অভিজ্ঞতা। বিরাট বিরাট কলকারখানা সে দেখল। অগণিত যান বাহন চলাচল করছে। পথে বিরাট জনস্রোত। আর এইসব সুসজ্জিত বড়ো বড়ো দোকানপাট।

চাটুজ্যের দোকানে প্রবেশ করে সে থমকে দাঁড়াল।

চাটুজ্যে আবার ডাকলেন ঃ ওহে, দেবু, এদিকে এসো, বসো।

ধীরে ধীরে গদীর একপাশে সসংকোচে বসল দেবু।

চাটুজ্যে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যেখানে গিয়েছিলে, হল কিছু?

দেবু উত্তর দিল ঃ না।

হেসে উঠলেন চাটুজ্যে। তিনি জানতেনই যে কিছু হবে না। আর হয়েই বা কি হবে? মজুর খাটা বইতো নয়?

একটা দীর্ঘ বক্তৃতাই করলেন চাটুজ্যে। নিজের কাহিনীও বললেন। একেবারে বাল্যজীবন থেকে শুরু করলেন। লেখাপড়া কিছু শেখেননি তিনি বলতে গেলে। একদিন বেরিয়ে পড়লেন পথে। পথ তাঁকে নিয়ে এলো এই আসনাসোলে। কিই বা ছিল সম্বল? যাকে বলে মূলধন, তা বলতে গেলে ছিলই না। তথাপি পথের পাশে শুরু করে দিলেন। এই করে করে এখন গোটা কয়েক গ্র্যাজুয়েটকেও এখন চাকরিতে রাখতে পারেন তিনি। তাই তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, দেবু তাঁর দোকানে বসে থাক, কাজকর্ম শিখুক, তারপর একদিন—নির্ঘাত বড়ো হবে। তাঁরই মতো একরকম গদীতে বসে ব্যবসা চালাবে। বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, সব হবে।

দেবুর সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা রাখলেন না চাটুজ্যে। ছেলেমানুষ, তার সম্মতি অসম্মতি কি?

তৎক্ষণাৎই ফন্দিটা কাজে লাগাতে চান চাটুজ্যে।

তিনি দোকানের ম্যানেজার বা প্রধান কর্মচারীটীকে ডেকে দেবুকে তার হাতে সমঝে দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিতে আদেশ করলেন। দেবু নিয়মিত এসে দোকানে বসবে, আর কাজ শিখবে। ব্যস্! কাজকর্ম শেখার পর—তখন দেখবেন অধর চাটুজ্যে।

দেবু হতভম্ব হয়ে গেছে। সে বিব্রত, বিপন্ন।

চাটুজ্যে তাঁর 'হ্যাঁ, না' বলারও অপেক্ষা রাখেননি। ম্যানেজারের হাতে দেবুকে সম্‌ঝে দিয়ে তিনি দিগ্বিজয়ীর হাসি হাসলেন। এবার বাড়িতে ফিরে গেলে মফস্বলী কথায় শুধু জানিয়ে দেবেন, উনি মুখ বাঁকা করে পেছন ফেরে বসে থাকলে কি হবে, কাপুড়ে-মিন্সে অধর চাটুজ্যে কাজটা গুছিয়ে ফেলেছে।

দোকানের একটা কুলুঙ্গিতে রাখা গণেশের মূর্তিকে প্রণাম করলেন চাটুজ্যে—সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ।

॥ পনেরো

ওদিকে দয়াময়ের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

অবিনাশ গাঙ্গুলীর তাগিদে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দয়াময়। ছ'শ পঁচিশ টাকা আগাম নিয়ে এসেছে। বলে এসেছে, শিগ্‌গিরই একটা দিন স্থির করে বিয়ের হাঙ্গামাটা চুকিয়ে ফেলবে। শি্‌গগির মানে ওই পাঁচ সাত দিনের মধ্যে। কিন্তু দেবু কোথায়? ছেলের দেখা নেই তো বিয়ে হবে কি করে?

জীবন ঘটক এসে তাড়া দিয়ে গেছে দু'বার। তৃতীয়বার, জীবন ঘটকের সঙ্গে

অপূর্বও এসেছিল। দয়াময় বাড়িতে থেকেও দেখা করেনি। ভুতুকে বলে দিয়েছিল, বল্‌ বাবা বাড়ি নেই। দাদা পরীক্ষা দিতে গেছে কি না, সেখানে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।

কিন্তু গাঁয়ে এসে খোঁজ খবর করে অনেক কথাই জানতে পেরেছে জীবন ঘটক। ছেলে নিজের হলেও তার ওপর দয়াময়ের কোন হাত নেই। সে এখন তার মাসির আওতায়। মাসিও এমন মাসি, তার কাছে কোন পুরুষ মানুষও ঘেঁসতে পারে না। কি দাপট! দয়াময় সামনে পড়লেই কেঁচো হয়ে যায়। কাজেই এখন যদি ওরা মাসিকে ধরে কাজ উদ্ধার করতে পারে। নইলে টাকা গেছে তো গেছেই। দয়াময়ের পকেটে যে টাকা ঢুকেছে সে ঢুকেছেই।

জীবন ঘটক বার বার করে প্রশ্ন করতে লাগল ভুতুকে, দয়াময় যদি বাড়ি নেই, তাহলে কোথায় গেছে, জান?

ভুতু অবশেষে বলল ঃ খাবার কেনবার পয়সা দিলে বলতে পারি বাবা কোথায় আছে।

জীবন ঘটক দেখল এতোই যদি গেছে তো, না হয় চারটে পয়সা। সে পকেট থেকে একটা আনি বের করে ভুতুর হাতে দিয়ে বলল ঃ সত্যি করে বল তো বাবা, তোমার বাবা বাড়ুজ্যে মশায় কোথায় আছেন।

ভুতু আনিটা হাতে নেড়ে চেড়ে দেখছিল। বোধকরি পরীক্ষা করে দেখছিল, অচল নয় তো? হঠাৎ সে আনিটা মুঠিতে করে রাস্তা দিয়ে দৌড়োতে লাগল। কিছু দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল ঃ বাবা বাড়ি নেই। তারপরই ভোঁ দৌড়।

জীবন ঘটক হতভম্বের মতো চেয়ে রইল পথের দিকে কিছুক্ষণ। তারপর অপূর্বর দিকে চেয়ে বলল ঃ চলুন যাই। যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তেপ্পান্ন। চারটে পয়সা ছ'শ পঁচিশ টাকার সঙ্গে গেল।

যেতে যেতে অপূর্ব বলল ঃ কিন্তু বাছাধন যাবেন কোথায়? না হয় নালিশ করে পুলিশ দিয়ে ধরাব।

ভুতু বাড়ি ফিরে এসে পুত্রগর্বে অধীর হয়ে দয়াময় তাকে জড়িয়ে ধরল। কি বুদ্ধি ভুতুর! সে লুকিয়ে থেকে সব দেখছে।

ভুতু কিন্তু বাবার কাছে আরো চারটে পয়সা দাবি করে বসল ঃ হুঁ বাবা, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম। দাও, চার পয়সা।

না দিয়ে উপায় রইল না দয়াময়ের।

কিন্তু এ করে ক'দিন চলবে?

বিশু শুধু বলে, চিনুর নামে নালিশ কর, সমন বের কর। এ কি মগের মুলুক নাকি যে মাসি বোন-বোনাইকে কলা দেখিয়ে ছেলে দখল করে বসবে? করলেই হল আর কি? আইন শুনবে না, কিছুতেই না। আইন ছেলের ঘাড় ধরে টেনে

এনে বাপের হাতে তুলে দেবে। ব্যস্, তারপর বাবা তার যতোবার ইচ্ছে বিয়ে দিক।

আইন আদালত করবার চেষ্টাও করেছে দয়াময়।

শহরে গিয়ে উকিল মোক্তার ধরেছে। সবাই বলে প্রমাণ করতে পারবে যে, ছেলে জোর করে নিয়ে আটকে রেখেছে? খুব খাঁটি জোরদার শক্ত প্রমাণ চাই। আটকে রাখার প্রমাণ। নইলে মাসির বাড়িতে ছেলে থাকে, একথা শুনলে আদালত ভাববে এ তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। মাসির বাড়ি বোনপো কি থাকে না? ছেলে এসে হয়তো বলবে, কোথায়, আমাকে তো কেউ আটকে রাখেনি। মাসি এসে বলবে—তাকে আটকে রাখবো কেন? তারপর আদালতের বাইরে এসেই ছেলে ধরবে মাসির হাত, মাসি ধরবে বোনপোর হাত। জোর করে আটকে রাখতে হবে দয়াময়কে। ম্যাট্রিক দেওয়া ছেলেকে জোর করে আটকে রাখা? ছেলেকেই আটকাতে পারবে না, আবার বিয়ে দেওয়া? আজকাল হাকিমেরাও হয়েছে এমন, ছোট ছেলে, পড়াশোনা করছে, বাবা টাকা নিয়ে তার বিয়ে দিচ্ছে শুনে মাসির পক্ষ নেবে, তাও বিচিত্র নয়।

ভরসা পায় না দয়াময়। কোন আশ্বাসই নেই।

তবে এক শ্রেণীর উকিল মোক্তার আছেন, টাকা পেলেই মামলা দায়ের করান। তারপর ফল, যাই হোক্। অবশ্য বলেন, যদি সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন, যদি টাকা পয়সা দিতে কার্পণ্য না করেন, যদি যা করতে বলা হয় ঠিক তাই করেন, তাহলে মামলা জিতিয়ে তাঁরা দেবেনই।

অগত্যা তাঁদেরই একজনের শরণ নেয় দয়াময়। সেও যেমন পথের, উকিলও তেমনি গাছতলার। দরিদ্রের পথ আর গাছতলাই তো সম্বল।

সাক্ষী? ভাল সাক্ষীই আছে দয়াময়ের। বিশু মুখুজ্জ্যে এসে সাক্ষী দেবেই। চিনুর ওপর যা' চটে রয়েছে। শুধু বিশু মুখুজ্জ্যে নয়। বিশু মুখুজ্জ্যের স্ত্রীও কম চটা নয়। বিশুর ক্রোধের বহ্নিতে সে ভর্ৎসনা, বিদ্রূপে অবিরাম ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে। নইলে বিশুর ক্রোধ তো খড়ের আগুন, এই জ্বলে তো এই নিভে। বিশুকে জানে দয়াময়। সব জানে। তার অন্দরের খবরও রাখে। বিশু চিনুর সহোদর ভাই, দেবুর আপন মামা। বিশু যখন আদালতে উপস্থিত হয়ে বলবেঃ হুজুর চিন্ময়ী দেব্যা জোর জবরদস্তিতে নিজের কার্য্য-সিদ্ধি করবার জন্যে মৃণ্ময়ীর ছেলেটাকে আটকে রেখেছে। তখন নিশ্চয়ই আদালত বিশ্বাস করবে। আর একটা ফন্দি জাগে দয়াময়ের মনে। যদি মিনুকে এনে আদালতে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে? শুদু দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে মিনু বলে, হুজুর, আমার বোন আমার ছেলেটিকে—।

উৎসাহিত হয়ে উঠে দয়াময়। আদালতে একখানি দরখাস্ত দাখিল করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীর নামের তালিকাও।

কিন্তু দয়াময় যখন আদালতের পেয়াদাকে নিয়ে বিশুর নামে সাক্ষীর সমন জারী করতে এলো—।

সেদিন বিশু বেশ খোস মেজাজে রয়েছে। দু'ভায়ে আপোষ হয়ে গেছে। ঠিক দু'ভায়ে নয়। বিশুই আপোষ করে ফেলেছে।

নিশু বসে বসে একটী গান গাইছিল তার গানের আসরে। আর একটি লোক বাঁয়া তবলা বাজাচ্ছিল। বিশু যাচ্ছিল বাইরের পথ দিয়ে।

একটুখানি আগেই হরির সঙ্গে তার আখ-বাড়িতে জল দেবার মজুরি নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। তিন টাকা মজুরি পাবে হরি। বিশু তা'তে তেড়ে উঠল, তিন টাকা কি রে, টাকা কি? দেড়টাকা দেবে নিশু, দেড় টাকা সে। কিন্তু হরি যে আর-বছরের সব টাকাই বিশুর কাছে থেকে পেয়েছে? তাহলে আবার এবার বিশু কিছু দেবে না, পুরো টাকাটাই নিশু দেবে। এ হলো ভাগের কথা। জমি অর্ধেক বিশুর, আর্ধেক নিশুর। ফসল পাবে আধা-আধি। আর মজুরি দেবার বেলা বুঝি বিশু একা দেবে? তা'ছাড়া নিশুর সঙ্গে সঙ্গে বিশুর একেবারে ছাড়াছাড়ি। একা দেবে বিশু। এ আর হয় না।

বাইরের পথ দিয়ে এসব কথাই আপন মনে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে যাচ্ছিল বিশু। এমন সময় কানে গেল নিশুর গান। থমকে দাঁড়াল সে। একবার কান পাতল। তাই তো ভুল গাইছে তো নিশুটা? আবার তাল দিচ্ছে কোন হতভাগা?

'এসব কি হচ্ছে নিশে'—বলে গিয়ে বিশু বসল গানের আসরে। সে নিজে গেয়ে ভুলটা ধরিয়ে দিলে। নিজে বাঁয়া তবলাও টেনে নিলে। গানের আসর জমে উঠল। নিশু গাইছে আর বিশু বাজাচ্ছে। গান শেষ হলে বিশু 'সাবাস ভাই' বলে নিশুকে জড়িয়ে ধরলে। নিশু দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। বিশুর ঘরের জানলা থেকে একখানা বিকৃত মুখ ঝাম্‌টা মেরে সরে গেল।

এই দিনই এলো দয়াময় সমন নিয়ে।

সাক্ষী দিতে হবে বিশুকে চিনুর বিরুদ্ধে।

সমনখানা হাতে নিয়ে বিশু বললে ঃ সাক্ষী! চিনুর বিরুদ্ধে? কি বলছ দয়াময়? আদালতে গিয়ে বিশু মুখুজ্জ্যে সাক্ষী দেবে তার সহোদর বোনের বিরুদ্ধে? মুখুজ্যে বাড়ির মেয়ে বিধবা হয়েছে বলে আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে?

সমনখানা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলল বিশু। তারপর বলতে লাগল ঃ যাব, আদালতে সাক্ষী দিতে যাব। গিয়ে হলপ নিয়ে সত্য কথাই বলব। বলব, দয়াময় বাড়ুজ্যে একটা পাষাণ্ড। আমার বোন ভাগনাকে পেটভরে খেতে দিতেও পারে না। ছেলেপুলেগুলোকে মানুষ করা দূরে থাক, তাদের অমানুষ করে তুলছে। একটা ছেলেকে চিনু মানুষ করে তুলছে, তাতেও তার চোখ টাটাচ্ছে। এখন সেই ছেলেকে নিয়ে আবার বেচে দিতে চায়। কবে সাক্ষী দিতে যেতে হবে দয়াময়? তা তারিখটা বল।

সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর দয়াময়ের উপায় রইল না। তা' হলে এ পথেও কোন কাজ হবে না।

॥ ষোলো ॥

সিদ্ধিলাভের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি ফিরেই চাটুজ্যে সংবাদটা দিতে গিয়েছিলেন স্ত্রীকে। ভেবেছিলেন, গিন্নী নিশ্চয়ই খুশি হবেন, এবার তাঁর হাসিমুখে তিনি দেখতে পাবেন।

কিন্তু খবরটা বলতেই একেবারে চীৎকার করে উঠলেন গিন্নী, ছি ছি ছি! এ কি করলে তুমি বলতে পারো? চিনু যখন শুনবে, তখন ভাববে স্বার্থপর লোকটা বিনি পয়সায় নিজের কাপড়ের দোকান বসিয়ে দিয়েছে ছেলেটাকে।

—না, না ভাববে না। চিনু আমাকে বলে গেছে।—এই তো চট্ করে ঘুরে আসছে বাসুদেবপুর থেকে? দেখবে এসেই আনন্দ প্রকাশ করবে।

—মোটে না, তোমাকে কিছু বলেনি। চিনুর ইচ্ছে ছেলেটাকে সে পড়াবে। পড়াতে যদি না পারে তো কোন কারখানায় কি অন্য কোথাও এমন কাজ শিখবে সে কিছু রোজগার করতে পারে।

—আমার দোকানটা বুঝি কারখানা থেকে কিছু কম? দোকানের কাজ বুঝি শিখতে হয় না?

—থামো, থামো, তুমি আর কথা বলো না। ছেলেটাকে বিনি পয়সায় একটা চাকরের কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে আর বড়াই করো না। এতে যে লোকের কাছে মাথা আমার হেঁট হয়ে যায়—সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই।

—আঃ, কি বাজে বকছো? যা' বোঝ না তা' নিয়ে মিছিমিছি চেঁচিয়ো না। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ভবিষ্যৎ ভেবে তবে ওকে আমার দোকানে ঢুকিয়েছি।

—ছেলেটাকে দোকানে ঢুকিয়েছ, এবার তার মা এলে তাকে তোমার হেঁসেলে ঢোকাও। বিনি পয়সায় একটা চাকর আর একটা রাঁধুনি পাবে। তাহলেই যশে একবার ঢি ঢি পড়ে যাবে চারদিকে।

—দূর দূর! তোমাকে বলতে আসাই আমার ভুল হয়েছে। ওর যা' উপকার আমি করলাম, সে তুমি আজ বুঝবে না। বুঝবে কিছুদিন পরে।

—আমি আর বুঝতে চাই না, চাই না, চাই না।

চাটুজ্যে গিন্নী রাগে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। পারলে যেন তিনি মাথা কুটে মরেন ঃ এই স্বার্থপর লোকটির হাতে পড়ে আমার দুর্দশার আর বাকি কিছু হইলো না। হে ভগবান, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে মুক্তি দাও। দু'জনের

মধ্যে একজনকে তুমি নাও। হয় আমাকে নাও, নয় ওকে নাও। অনেক জ্বালায় জ্বলে পুড়ে তোমাকে এ কথা বলছি।

চাটুজ্যে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ঃ কী! আমাকে মর্ বললে তুমি?

—হ্যাঁ, বললাম।

—বেশ, এই চললাম আমি তবে বাড়ি থেকে। গেলাম, আমি গেলাম।

হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন চাটুজ্যে। সিঁড়িতে তাঁর চটির আওয়াজ শোনা গেল, তিনি দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছেন।

হল, তাই তো! এ কি করলেন তিনি। রাগের মাথায় এরকম করে বলা তো কিছুতেই উচিত হয় নি। কিন্তু উনি যে চলে গেলেন।

কর্তাটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজা খুলে একেবারে রাস্তায় পড়লেন। যেতে যেতে তিনি বলেই চলেছেন ঃ দূর, দূর, দূর। এমন বোকা ঝগড়াটে স্ত্রী যার বাড়িতে—তার আর কি হবে ছাই! নিজের স্বার্থ বোঝে না। একটা গোঁ ধরেই বসে আছে—

বাড়ি থেকে বেরোতেই জামাই-এর সঙ্গে মুখোমুখী হলেন তিনি, বাসুদেবপুরের সেই জামাই। জামাই এসেছে দেবুর সঙ্গে দেখা করতে সাইকেল-রিক্সা চড়ে। এবার আর তার মোটর সাইকেল নেই।

চাটুজ্জে চলে যাচ্ছিলেন, জামাই ডাকল ঃ ও মশাই।

চাটুজ্জে থেকে প্রশ্ন করলেন ঃ কে? কাকে চাই?

জামাই বলল ঃ দেবু এখানে আছে?

চাটুজ্জে কোন উত্তর না দিয়েই চলে যেতে লাগলেন।

জামাই বললে ঃ কথা না বলেই চলে যাচ্ছেন যে? বলি দেবু আছে এ-বাড়িতে? বাসুদেবপুরের দেবু বাড়ুজ্যে?

চাটুজ্জে বলে উঠলেন ঃ জানি না।

—আরে, আপনি তো এই বাড়িরই লোক?

—না, না, আমি কেউ নই। দেবু-টেবু কেউ নেই এখানে, যান আপনি।

বলেই চলে গেলেন চাটুজ্জে।

জামাই বিস্মিত, হতভম্ব। আপন মনে বললঃ যা বাবাঃ! পাগল নাকি?

দোতলার একটি জানালা খুলে গেল তখন। জামাই ওপরের দিকে চেয়ে দেখল একটি সুন্দরী কিশোরী। সে অমলা।

ওপর থেকেই অমলা জিজ্ঞাসা করল ঃ কি চাই, কাকে খুঁজছেন?

জামাই বলল ঃ দেবু আছে এখানে?

অমলা বলল ঃ দাঁড়ান আসছি।

জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল অমলা। জামাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল

এও কি উবে গেল নাকি? বাড়িখানা কি একটা পাগলা গারদ? না, অমল এসে উপস্থিত হল। হ্যাঁ, দেবু থাকে এই বাড়িতেই, কিন্তু এখন নেই। জামাই বলল যে, দেবু এলেই তাঁকে যেন বলা হয়, তার জামাইদা এসেছিল রাণীগঞ্জ থেকে। জরুরী দরকার আছে। সে যেন গিয়ে দেখা করে।

জামাইকে বিদায় করে অমলা ওপরে গিয়ে দেখে তার মা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। বুঝতে পারল অমলা তার বাবা-মার ঝগড়াটা আজ এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, অবশেষে কান্নাকাটি শুরু হয়েছে। অন্যদিন কথা কাটাকাটিতেই শেষ হয়ে যেতো। আজ যখন কান্নাকাটি তখন অবস্থা গুরুতর। সে মাকে বলল ঃ বাবা বেশি দূর যাননি মা, পায়ে হেঁটেই গেছেন, তাঁকে কি ডেকে আনব?

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন অমলার মা। বলে কি মেয়েটা! অমনি তো রাগের মাথায় যা' তা' বলছেন, তার ওপর মেয়েটা আবার পিছু ডাকবে? পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তায় কতো বিপদ আপদ, গাড়ি ঘোড়া—এই আপনভোলা মানুষ! কি করতে কি হয়! ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবার।

অমলা মাকে বোঝাতে যায়, বলে ঃ এমন করে জানলার ধারে বসে কাঁদলে ঝি-চাকরেরাই বা বলবে কি? মা মেয়ের প্রতি আরো বেশি করে তেড়ে উঠেন। অবশেষে মেয়েকেই আক্রমণ করেন ঃ এতো বড়ো বুড়ি ধিঙ্গি মেয়ে—চব্বিশ ঘণ্টা ধিং ধিং করে নেচে বেড়াচ্ছিস, সংসারের আর কোন দিকে নজর আছে?

অমলা ভেবেই পায় না সে আবার সংসারের কোন দিকটার দিকে নজর দেবে?

—কেন, এই যে বুড়ো বাপ—খেটে খেটে মরছে দিনরাত, কার জন্যে? ছেলে নেই—পুলে নেই—একটিমাত্র মেয়ে তো তুই, তুই যদি তার মুখের দিকে না চাইবি, ভাল করে সেবাযত্ন না করবি তো চলবে কেন? ওই বাপ—ওই ভোলা মহেশ্বর—যতোদিন আছে ততোদিন—নইলে হুঁ—হুঁ.......

অমলা বলে ঃ খামোকা চেঁচাচ্ছ কেন, কি করতে হবে তাই বলো।

মা বলেন ঃ বললেই পারবি করতে, না করেছিস্ কোনদিন? বুড়ো বাপ—সেই কোন সকালে চারটি মুখে দিয়েছে, কিছু খেতে বলেছিস? না, নিজের হাতে খাবার তৈরি করে খাইয়েছিস্? যা' দেখি, ষ্টোভ জ্বেলে নিজের হাত, কচুরি হালুয়া নিমকি করগে দেখি তোর বাবার জন্যে। দেখি কেমন মেয়ে হয়েছিস্!

—বেশ তবে দেখো, পারি কিনা। অমলা চলে গেল।

গিন্নী মনের দুঃখে অনুশোচনায় ভগবানের কাছে মাথা কুটে বলতে লাগলেন ঃ আমার মনের কথা তো তুমি জানো ঠাকুর। মুখে কি বলতে কি বলে ফেলেছি। আর মুখেও এমন কথা বলবো না, কখনো না।

ঠাকুর বুঝিবা তাঁর কান্না শুনলেন। দেবুকে সঙ্গে নিয়ে চাটুজ্যে এসে উপস্থিত

হলেন। নিক ওরা দেবুকে, কাজ নেই তাঁর দোকানের কাজ শেখানোর। ওরা যা' খুশি করুক।

দেবুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চাটুজ্যে আবার চলে যাচ্ছিলেন বাড়ি থেকে। গিন্নী গিয়ে তাঁর পথ আগলালেন। শুধু তাই নয়, পায়ের ওপর পড়ে চোখের জলে পা দু'খানি ভাসিয়ে দিতে লাগলেন।

বিব্রত চাটুজ্জে গিন্নীকে হাত ধরে তুললেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

॥ সতেরো ॥

দেবু কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে।

এঁরা কি যে অদ্ভুত লোক! দোকানের সম্মুখে পেয়েই চাটুজ্যে তাকে নিয়ে একেবারে দোকানের কাজে বসিয়ে দিলেন। এরকম কেউ করতে পারে দেবু ভাবেনি। এখনো সে বুঝতে পারছে না। বলা-কওয়া নেই, পরামর্শ করা নেই, হুট্ করে চাটুজ্যের এরকম কাজে বসিয়ে দেওয়ার অর্থ কি? নিছক পরোপকারের প্রবৃত্তি অথবা আর কিছু! আবার তাকে নিয়েই কর্তা-গিন্নীতে ঝগড়া-ঝাটি। কর্তা তাকে দোকান থেকে প্রায় টেনেই নিয়ে এলেন। এসেই বললেন ঃ নাও অমলার মা, তোমার দেবুকে। তারপর গিন্নীর স্বামীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়া!

না, দেবুর কাছে এ বিসদৃশ, অস্বাভাবিক ঠেকে।

ওঁরা তার যথেষ্ট উপকার করেছেন। তাঁদের আশ্রয়ে থেকে সে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পেরেছে। কিন্তু তাকে উপলক্ষ্য করেই স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া বিবাদ?

অমলার পড়ার ঘরে টেবিলের কাছে বসে এসব কথাই ভাবছিল দেবু। বড়মা বাসুদেবপুর থেকে ফিরে এলেই সে বলবে, তাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।

ভাবছে দেবু। হঠাৎ সে একটা স্পর্শ অনুভব করল তার দু'চোখে। পেছন থেকে দু'টি হাত এসে চোখ দু'টিকে চেপে ধরল।

দেবু প্রশ্ন করল ঃ কে?

অমলা মুখ টিপে হাসতেই লাগল, কোন উত্তর দিল না।

দেবু এবার বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল, কার হাত ওই দু'খানি। সে বলল ঃ অমলা! ছাড়ো।

চোখ ছেড়ে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে অমলা দূরে গিয়ে বসলো। বলল ঃ মেজাজটা ভারি ভারি মনে হচ্ছে দেবুদা! ব্যাপার কি? পরীক্ষায় ভাল লিখতে পারনি বুঝি?

দেবুর মুখে কোন কথা নেই। সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

কৃত্রিম সান্ত্বনার সুরে বলল অমলা ঃ তা হোকগে। আসছে বারে একসঙ্গে পরীক্ষা দেওয়া যাবে।

তথাপি কথা নেই দেবুর মুখে। অমলা ডাকল, দেবুদা, তবু না—ডাকল, দেবব্রত বাবু। সাড়া দিচ্ছে না কিছুতেই দেবু। এবার এক আঁজলা জল নিয়ে দেবুর গায়ে ছিঁটিয়ে দিল অমলা। বাধ্য হল দেবু বিরক্তি ভরে উঠে দাঁড়াতে। মুখে তার কথাও ফুটল ঃ ইস্ এ কি করলে বল দেখি?

অমলা ভ্রূভঙ্গী করে বলল ঃ আবার ইস্। এতো ডাকছি, সাড়া দিচ্ছে না যে বড়ো?

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল দেবু ঃ শুনতে পাইনি। কিছু বলছ?

অমলা বলল ঃ চেয়ারটা টেনে নিয়ে কাছে এসে বসো। বলছি।

দেবু কাছে এলে এক প্লেট কচুরি আর হালুয়া তার হাতের কাছে ধরে নিয়ে অমলা বলল ঃ খাও, খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর, তারপর বলব কি বলবার আছে। চোখ দু'টি বিস্ফারিত করল দেবু ঃ এই সব খেতে হবে?

জোরের সঙ্গে বলল অমলা ঃ হ্যাঁ, খেতে হবে। এই সব খাবার জন্যেই তৈরি। খাও না। এতো লজ্জা কিসের? গোমড়া মুখ করে যারা বসে থাকে, তাদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। বাড়ির জন্যে মনে কেমন করছে?

—ধেৎ।

—আমাদের এখানে থাকতে ভাল লাগছে না?

—কি যে বল।

—তা'ও না, তা'হলে?

দেবু উত্তর না দিয়ে এবার খাবার তুলে মুখে দিতে লাগল। অমলা চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর বলল দেবু ঃ আমাকে নিয়ে তোমার বাবা-মার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে?

এবার যেন অমলা দেবুর দুর্ভাবনার একটা হদিস্ পেয়েছে। সে একটুখানি উচ্চ কণ্ঠেই হেসে উঠল। তার বাবা-মার মধ্যে ঝগড়া, এ তো লেগেই আছে। একে-ওকে, তাকে সবাইকে নিয়েই তাঁদের ঝগড়া হয়। এই হয় আবার এই থেমে যায়। নতুন দেখছে দেবু, তাই ভয় পায়। কিন্তু অমলা এতে আর কিছুই মনে করে না। বরং যেদিন বাবা-মার ঝগড়া হয় না, সেদিনই তার ভয় হয়। হয়তো বা গুরুতর কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কথায় কথায় অনেক কথাই বলে গেল অমলা।

তার বাবা মা কেউ লেখাপড়া জানেন না। বাবা যদিও বা কোনরকম কিছুটা পড়াশোনা করতে চেষ্টা করেছিলেন হয়তো, কিন্তু মা ওদিকে ঘেঁসেনইনি। লেখাপড়া

না জেনেও এতোবড়ো ব্যবসাটা চালিয়ে যাচ্ছেন অধর চাটুজ্যে। হিসাব জ্ঞান তাঁর টনটনে। বাড়িতে ঝগড়াঝাটি লেগে থাকলে কি হবে, ব্যবসায়ের বেলা তাঁর ব্যবহারে সবাই তুষ্ট হয়। ঝগড়া বিবাদ তাঁর শুধু স্ত্রীর সঙ্গেই। নইলে চাকর বাকর কর্মচারী সবাই বলবে, এমন মনিব আর হয় না।

অমলাকে পড়াতে পাঠানো নিয়েই কি তার বাবা মার মধ্যে কম ঝগড়া হয়েছে? বাবা যদি মত করেন তো মার অমত। মার যখন মত হল, তখন বাবা বলেন, না কি হবে লেখাপড়া শিখে। অনর্থক কতকগুলো বাজে খরচ। অবশেষে যদিবা ইস্কুলে দিয়েছেন তো মাসে পাঁচবার করে ইস্কুল ছাড়বার হুকুম করেন, আবার সে হুকুম পাল্‌টেও যায়। এই তো চলছেই। তা' নিয়ে বোকা ছাড়া কি কেউ মন খারাপ করে?

দেবু খাবার বন্ধ করে বসেছিল।

অমলা এবার কথা বন্ধ করে আবদারে সুরে বলল ঃ খাওনা, চলে তো যাবেই। আসাই বা কেন আবার চলে যাওয়াই বা কেন বুঝতে পারি না বাবা। দোহাই লক্ষ্মীটি, বাকিগুলো খেয়ে ফেল। তারপর খবর বলছি শোন। জরুরী খবর। খাবার পর খবর।

আবার দেবু খেতে আরম্ভ করল। বলল ঃ বলনা খবর। খাবারে সঙ্গে সঙ্গে খবরও শুনি।

অমলা বলল ঃ তোমার জামাইদা এসেছিলেন।

দেবু বলল ঃ জামাইদা?

অমলা বলল ঃ হ্যাঁ, জামাইদা! বললেন, তাঁর ঠিকানা তোমাদের জানাই আছে। তুমি যেন তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করো। তিনি যে এসেছিলেন, তার প্রমাণস্বরূপ একখানা কার্ডও রেখে গেছেন। তাতে ঠিকানা রয়েছে।

এমন সময় মা অন্য ঘর থেকে অমলাকে ডাকলেন। তার বাবাকে বসিয়ে রেখেছেন, খাবার নিয়ে যেতে হবে অমলাকে।

খাবারের বহর দেখে বিস্মিত হলেন চাটুজ্যে।

তিনি মন্তব্য করলেন ঃ অমলা আজ হঠাৎ খাবার করেছে?

গিন্নী বললেন ঃ মেয়েছেল খাবার করবে না তো কি করবে? তোমারও যেমন! মেয়েকে দিলে ইস্কুলে ভর্তি করে।

অমলা বলল ঃ বাবা, খেয়ে দেখো। বলতে হবে ভালো হয়েছে কি না।

হাসতে হাসতে বললেন টাটুজ্যে ঃ দেখেই বলছি খুব ভালো হয়েছে। এই তো চাই! ঘরকন্নার কাজকর্ম করবি, তবে তো তোর মা একটু জিরোতে পারে। না কি বলো গো তুমি? বল তো ইস্কুলটা ছাড়িয়ে দিই।

গিন্নী বললেন হ্যাঁ, তাই কর। মাসের মধ্যে দশবার ইস্কুলে ভর্তি কর, আর ছাড়াও।

চিনুর সাড়া পাওয়া গেল, সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে।

চাটুজ্যে কান পেতে শুনে বললেন ঃ বোধ করি চিনু এলো।

সত্যি চিনু। কিন্তু চিনু একাই ফিরে এসেছে। বাসুদেবপুর থেকে একটি রাঁধুনি আনবার জন্য বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন চাটুজ্যে গিন্নী। কিন্তু সে পাওয়া গেল না। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, তবু উপোসী হয়ে গাঁয়ের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে। ভাববে রাঁধুনি-গিরিতে জাত যাবে।

চাটুজ্যে যেন এবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নাই বা পাওয়া গেল রাঁধুনি। তিনি খাবার খেতে খেতে চিনুকে বললেন ঃ এগুলো কে তৈরি করেছে বল দেখি?

চিনু বুঝতে পারে, অমলাই আজ খাবার তৈরি করেছে। সে অমলাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। বলে ঃ তবে আর ভাবনা কি! এই তো আমার মা অন্নপূর্ণা।

অমলা গম্ভীর কণ্ঠে বলল ঃ পরশু থেকে আমার তিন দিন ছুটি আছে। এই তিনদিন আমি কিন্তু কাউকে হেঁসেলে ঢুকতে দেব না। আজ মা আমাকে যা'তা বলেছে।

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন ঃ হ্যাঁ, মা বলেছে বলে রান্না কর, হাত পা পোড়াও, তারপর তোমার বাবা আমাকে লাথিঝাঁটা মারুক, অপমান করুক, তাহলেই সুখী হও তুমি।

চিনু বলল ঃ না দিদি, কাউকে কিছু করতে হবে না। আমি রয়েছি কি জন্যে! এই তো ক'জন মানুষ, আমিও সব করে দেবো। রাঁধুনি যে ক'দিন না পাওয়া যায়, আমিই একাই চালিয়ে দিতে পারব।

দেবু দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ওঁদের কথাবার্তা শুনছিল। সে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেল তার বড়মার কথায়। তার বড়মা এ বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করবে? কেন? তারই জন্যে নয় কি?

সে সেদিনই এক সময় বড়মাকে একান্তে পেয়ে অভিমান ভরে অভিযোগ জানালে।

চিনু বাসুদেবপুর থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। জমি বিক্রির কোন ব্যবস্থাই সে করতে পারেনি। তার দাদা বিশু সব জায়গায় বলে বেড়িয়েছে চিনুর জমি কেউ নিও না, নিলে বিপদে পড়বে। তাই এমন যে গদাই মোড়ল, জমির প্রতি যার ভীষণ লোভ, পেলেই গিলে ফেলতে চায়, সেও ভয় পেয়ে গেছে। নেবে না, সে চিনুর জমি কিছুতেই নেবে না।

দেবু রাগে, অভিমানে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ঃ হ্যাঁ জমি বিক্রি করে পথের ভিখিরি হয়ে গিয়ে পরের বাড়িতে তুমি ভাত রাঁধবে, আর আমি সেই টাকা নিয়ে মনের আনন্দে লেখাপড়া করব? না, তা হয় না বড়মা! আমার জন্যে তুমি অনেক ছোট হয়েছ, আর ছোট হতে তোমাকে আমি দেবো না।

কোন কথা বলতে দেয় না দেবু তার বড়মাকে। এতোদিনের নীরব মূক দেবু আজ মুখর হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া শিখতে গিয়ে ছেলের জন্যে কতো মা কতো কিছু করে, চিনুর এ যুক্তিও সে গ্রাহ্য করে না। জমি, জমি বিক্রি করবে চিনু। ভারি তো দশ বিঘে জমি। সে কি দেবু জানে না? পাঁচ বিঘে তো কাঁকর পাথরের ডাঙ্গা, তা'তে ধান তো দূরের কথা, ঘাসও হয় না। পাঁচ বিঘে জমির ধানই ছিল চিনুর সম্বল। তাই দিয়ে দেবুর খাওয়া পরা আর পড়াশোনা চলেছে। কিন্তু চিনুর দুঃখ, তার আধ-পেটা খেয়ে থাকা, যা' নয় তাই দুঃখ সহ্য করা, এ কি দেখেনি দেবু? একখানা ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়েছে চিনু। সেলাই এর পর সেলাই করেছে কাপড়। মাঠের পাকা ধান ঘরে উঠতে না উঠতেই দেবুর পড়ার বই কেনা হয়েছে। সবগুলো অলঙ্কার পত্র একে একে গদাই মোড়লের গহ্বরে গেছে। লক্ষ্মীর ঝাঁপির সিঁদুর মাখানো গিনি বিক্রি করে দেবুর পরীক্ষার ফিস্ দেওয়া হয়েছে। এতো কাল মুখ বুজে সহ্য করেছে দেবু, কিন্তু আর সইবে না।

চিনু সব শুনে। আর্তনাদ করে তার বলতে ইচ্ছে হয়, সবি সত্যি! কিন্তু মা ছেলের জন্যে কেন এ কষ্ট সহ্য করে? করে ভবিষ্যতের আশায়। সে স্বপ্ন দেখে, ছেলে তার বড়ো হবে। তারই জন্যে চাটুজ্যে বাড়িতে সে রান্না করে তবু দেবুর পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে চায়।

চিনু বলে ঃ তা'হলে কি আমার এতো আশা, এতো আকাঙ্ক্ষা এই খানেই সব শেষ হয়ে যাবে? তা' যদি হয়, তাহলে আমি মরেও শান্তি পাব না বাবা।

দেবু বলে ঃ গরীব যারা—যাদের সাহায্য করবার কেউ নেই, বাপ যার ভিক্ষা করে সংসার চালায়—লেখাপড়া শিখে বড় হবার আশা তাদের না থাকই ভালো বড়মা।

চিনু বলে ঃ কতো বড় অভিমান করে যে তুই এ কথা বলছিস্ তা' কি আমি বুঝতে পারিনা বাবা! আমি তোর বড় মা হয়ে একটি কথা তোকে জানাচ্ছি, চিরজীবন এই কথাটি মনে রাখিস্। যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। মানুষের মনের বাসনা কামনা যদি সত্যি হয়, তা'হলে তা পূর্ণ হবেই। ভগবান তাকে সাহায্য করেন।

—তাই যেন হয় বড়মা। দেবু উত্তর দেয়। এখানে আর একটি দিনও নয়। কাল সকালেই আমরা এখান থেকে চলে যাবো। যাবার পথে জমাইদার সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে।

পরিদন সকালে সত্যি সত্যি তারা বিদায় নিল চাটুজ্যে বাড়ি থেকে। ওরা কেউ এটা প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু বাধা দেবারও উপায় নেই। শুধু দুঃখই প্রকাশ করতে পারেন তাঁরা। সত্যি, ওদের তাঁরা আপনার বলেই মনে করেছিলেন। তাই কম বেদনা অনুভব করেন নি তাঁরা। তথাপি বিদায় দিতেই হল।

অমলাও বিদায় দিল।

সে সকালে বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল, বাড়ির সামনে একখানি সাইকেল রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। আর চিনু ও দেবু যাবার জন্যে প্রস্তুত। সে জানত না, ওরা আজই চলে যাবে। কেই বা জানত?

সে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ এ কি! তোমরা চললে কোথায়?

ম্লান হাসি হাসল দেবু ঃ তুমিই তো জরুরী খবর দিলে। জামাইদার কাছে যেতে হবে না?

চিনু দেবুকে নিয়ে গাড়িতে চড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

বেড়াতে বেরিয়ে পথ থেকে অমলা একটা ফুল তুলে নিয়ে এসেছিল। নাম না জানা বনফুল। অমলা হাতের সেই ফুলটি চলন্ত গাড়ির মধ্যে দেবুর ওপর ছুঁড়ে দিল।

দেবু সেই ফুল নিয়ে নাকের কাছে ধরল। তারপর পেছন ফিরে দেখল, অমলা একদৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে আছে।

॥ আঠেরো ॥

জামাইয়ের বাসায় গিয়ে যখন দেবুরা পৌঁছেছে তখন জামাই বাড়ি ছিল না। সে বাড়ি ফিরেই দেখল, দেবু তার বড়মাকে নিয়ে অপেক্ষা করে বসে আছে। প্রথমেই দেবুর ওপর অভিযোগ করল জামাই ঃ এঁ এঁ এঁ—এই নাও। বলিহারি ছেলে বাবা! এলি আমার এখানে একটা কাজের সন্ধানে। তারপর কারখানা থেকে এসেই দেখি, ফুরুৎ! কাজ কি গাছের ফল—যে পেড়ে দেব?

চিনু বিস্মিত হল ঃ তবে যে দেবু বলল, তুমি দেখা করতে বলেছ তাড়াতাড়ি?

জামাই বলল ঃ করেছি, করেছি পিসিমা। আমি হচ্ছি জামাইদাদা, ও হচ্ছে আমার বড় কুটুম্ব। পরীক্ষা দিয়ে বেকার বসে থাকবে? কাজ ঠিক করেই নিজে গিয়েছিলাম খবর দিতে। একটা আধ-পাগলা বুড়ো তো আমাকে তাড়িয়েই দিয়েছিল। ভাগ্যিস্ একটি মেয়ে দোতলা থেকে নেমে এলো। যাক্, এবার দেবুবাবু কাজে লেগে পড়। দু'শ টাকা মাইনে, সঙ্গে বাসাবাড়িও রয়েছে।

অজস্র অশীর্বাদ করলে চিনু ঃ তুমি খুব বাহাদুর ছেলে। কেমন করে করলে বাবা?

হেসে উঠল জামাই ঃ দেবুর ভাগ্যি আর আমার এই কি বলে হাতযশ আর কি, বাহাদুরি আর কোথায়! সবই শুনবেন বৈ কি, কি করে চাকরিটা জুটে গেল।

দেবুর যেখানে দু'শ টাকা মাইনের চাকরি হয়েছে, সেটা একটা বিরাট কাঠের কারখানা। ওর নানা দিকে অনেকগুলো ব্রাঞ্চও রয়েছে। হাজারীবাগে হল মূল ঘাঁটি। সেখান থেকে গাছ চালান আসে। সেই কারখানার মালিক হলেন গুজরাটী এক ভদ্রলোক— মেটা সাহেব। ওরা বহু টাকার কাঠ দেয় জামাইদের কারখানায়। কণ্ট্রাক্টটা করিয়ে দিয়েছে জামাই। তাই জামাইকে মেটা সাহেব বেশ সম্ভ্রম করে। ওই মেটা

সাহেবের কারবারে। এর জন্যে জামাইকে কিছু কমিশন দেয়। ওদের একটি গুদাম আছে রাণীগঞ্জে। দেশ-বিদেশ থেকেও এখানে কাঠ আমদানি করা হয়। রেলে চালান যায় এখান থেকে। সেইসব দেখাশোনা করবার জন্যে যে লোকটি ছিল, হঠাৎ সে চলে গেছে। তাই অবিলম্বে একজন লোক দরকার। সৎ এবং বুদ্ধিমান লোক চাই। কাজকর্ম অনান্য কর্মচারীদের সঙ্গে থেকে শিখে নেবে, বুঝে নেবে। জামাই ধরে বসল মেটা সাহেবকে। তার একজন লোক আছে। বয়েস যদিও অল্প, তথাপি বেশ বুদ্ধিমান ভালো ছেলে। জামাইএর লোক, মেটা সাহেব তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

দুর্ভাবনার অন্ত নেই চিনুর। এই বয়েসে দায়িত্বের কাজ। পারবে কি দেবু? বড় ভয় চিনুর। বড়মুখ করে জামাই বলেছে, তার আপনার লোক।

জামাইর কোন দুর্ভাবনা নেই। মেটা সাহেবকে সে জানে। তিনি তো থাকেন হাজারীবাগে। এখানকার অপিসের ওপর জামাইর বেশ প্রভাব রয়েছে। তার কথা কেউ অমান্য করে না। সেদিনই তো জামাইকে দেবুর কাজকর্মের সব বুঝিয়ে দিয়ে মেটা সাহেব হাজারিবাগে চলে গেলেন। সুতরাং দেবুর সমীহ করে চলতে হবে জামাইকে। দেবু ধরে নিতে পারে জামাই-ই তার কর্তা। তাকে খুশি রাখতে পারলে চাকরি আছে, নইলে নট্।

তথাপি চিনুর বুক দুরু দুরু করে। বলে ঃ পারবে কি দেবু?

জামাই বলে ঃ না পারলে আমাকেই সব করে নিতে হবে পিসিমা। আর সুনাম বদনামের কথা বলছেন? আমাদের কাছে ও দু'টোই সমান হয়ে গেছে। জাত চাকুরে—মানে চাকর, চাকর। ভাল কাজ করলে মনিব যেমন পিঠও চাপড়ায় আবার ভুলচুক হয়ে গেলে জুতোও মারে। তবে হ্যাঁ, চুরি-চামারি করি না। তাই এখনো টিকে আছি পিসিমা। কিন্তু আমি কেবল নিজের কথাই বলছি। আপনি হাত মুখ ধুয়ে যে একটুখানি জলটল খাবেন! চলুন। ভেতরে। আপনার মেয়ে তো এখানে নেই এখন। নইলে এতাক্ষণে এসে হানা দিত এখানে। টেনে ভেতরে নিয়ে যেতো। আমি শুধু হরিয়া চাকরটির ওপর নির্ভর করে আছি। ব্যাটা এখনো আমাকে এক পেয়ালা চা দেয়নি। কি যে করে!

চিনু বলে ঃ তাইতো! তুমি থামতো জামাই। চা আমিই করে দেবো।

চিনু গিয়ে উনুন ধরিয়ে চায়ের কেট্‌লি চাপিয়ে দেয়।

হরিয়ার নামে অভিযোগ করেছিল জামাই। কিন্তু হরিয়াকে সে-ই একটা বিরাট ফর্দ দিয়ে বাজারে পাঠিয়েছিল। অনেকগুলো জিনিসপত্র কিনে আনতে হবে বাজার থেকে। দেবুর বাসা সাজাবার জিনিসপত্র।

চাকুরীতে ভর্তি হয়ে গেল দেবু।

সুসজ্জিত নতুন বাসা তার। এ যেন ভোজবাজি! দেবুর কাছেও—চিনুর কাছেও। এতোটা আশা করেনি তারা।

জামাই এমনি লোক। সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, নানা আসবাবপত্র আনিয়ে বাসা সাজিয়ে দিল দেবুর জন্যে! তার জন্যে দুদিন প্রায় আপিস কামাই করল। দেবুকে প্রতিষ্ঠিত করবার আনন্দে সে যেন উন্মাদ। দেবু সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করবে, তার চাকরিতে উন্নতি হবে, পিসিমা সুখী হবেন সর্বান্তঃকরণে একজোট এই চায় জামাই।

চিনু ভাবে, এতো কেন?

পরীক্ষার ফল বেরুবার আগে পর্যন্ত একটা কিছু কাজ করে কিছু টাকা সংগ্রহ করবে দেবু। তারপর সে কলেজে ভর্তি হবে, পড়বে। পাশের পর পাশ করে যাবে, সবদিক দিয়ে বড় হয়ে উঠবে এইতো স্বপ্ন দেখেছে চিনু।

কিন্তু জামাই বলে অন্য কথা।

—হ্যাঁ, লেখাপড়া বেশি শেখা খুবই ভালো। কিন্তু সকলের পক্ষে এ সুযোগ রয়েছে কি? দেবুরও নেই। আরো পড়তে গেলে দেবুকে স্বাস্থ্য নষ্ট করতে হবে, দেহের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য সে জোটাতে পারবে না! সারাদিন পরিশ্রম করতে হবে, টুইশন করতে হবে, যেদিন শিক্ষা শেষ হবে সেদিন দেবু, বিদ্যালাভ করে পণ্ডিত হবে বটে, কিন্তু চেয়ে দেখবে তার দেহটি ক্ষয় হয়ে, কঙ্কাল হয়ে গিয়েছে। এদিকে চিনু, দেবুর বড়মা, না খেয়ে, আধ-পেটা খেয়ে কোন রকমে হয়তো বেঁচে থাকবে। কঙ্কালের মধ্যে প্রাণটুকু শুধু ধক্ ধক্ করবে। তাই গরীবরে ছেলের উচিত এখন থেকেই কাজে লেগে পড়া। ম্যাট্রিক পর্যন্ত যদি ভাল করে পড়াশোনা করা যায়, তাহলে কলেজে না গিয়েও বই পড়ে পড়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করা চলে। তারপর অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতায় মানুষ যেখানে দক্ষ হয়ে উঠে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। আপনা থেকেই তার কদর বাড়ে, অর্থ আসে, যশ আসে। তাকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

জামাই একটানা বলে যায়।

চিনু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, তাই বোধ হয় উচিত। এ ছাড়া আব পথ কোথায়। এমনি করেই বড়ো হোক দেবু। শুধু দেবু আর তার নিজের দিক দেখলেই তো চলবে না। দুঃখিনী মিনু, চিরদুঃখিনী বোন তার। দু'টি অপোগণ্ড শিশু আর তার একটি অপদার্থ স্বামী নিয়ে কী লাঞ্ছনার জীবনই না যাপন করছে সে!

মার কথা দেবু ভাবে। মা চেয়েছিল সে মানুষ হোক। তাই বড়মার হাতে তাকে তুলে দিয়েছিল। সেই কবেকার শিশু বয়েসের এটুকু কথা দেবুর মনে আছে আজো। বড়মাকে বলেছিল ঃ দেবুকে নিয়ে গিয়ে তুই মানুষ কর দিদি। তবু মৃত্যুকালে আমি এ শান্তি নিয়ে মরব যে একটি ছেলে আমার মানুষ হয়েছে।

বাবা! বাবার কথা মনে করতেই শিউরে উঠে দেবু। তাকে বিয়ে দেওয়া নিয়ে এই সেদিনও যেসব কাণ্ড করলে তার বাবা!

দেবু চাকরিতে নিতে হাজিরা দেয়। এখন তার নতুন রূপ। জামাইদার কথা মত চলে সে। তারই নির্দেশে তার পোষাক পরিচ্ছদ বদলে গেছে। এখন দেবু—ফুল-প্যাণ্ট পরে সাহেব সেজে থাকে। জামাইদা বলে, একটা হ্যাটও মাথায় দিয়ে চলতে দেবুকে। ভেকে ভিখ। কেমন যেন সংকোচ হয় দেবুর। বাসুদেবপুরের ধুতি সার্ট পরা পড়ুয়া দেবুর অঙ্গে সাহেবি পোষাক। কিন্তু না হলে লোকে মানবে কেন? বলবে, এই দ্যাখ, আমাদের ধুতি-চাদর পরা সাহেব এলেন। সাহেবটা ইংরেজ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, রেখেও গেছে। তা ছাড়া ধুতি পাঞ্জাবী পরে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে গোঁফে চড়া দিতে যারা গুড়গুড়ি টানত—তাদের শ্রেণী ছিল আলাদা। গেরস্তগিরিও লোকের ঘুচেছে। এখন মাঠে কারখানায় ভদ্রলোকের ছেলেদেরও খেটে খেতে হবে। খেটে খাওয়ার আলাদা পোষাক। ধুতি পাঞ্জাবী পরে বড়ো জোর কেরানিগিরি করা যায়। তাও আবার কলকাতায় গিয়ে দেখ, ট্রাম বাসের ভিড়ে এ নিয়ে কত অসুবিধে।

জামাই-এর সঙ্গে কথায় পারবার উপায় নেই। পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয় দেবু।

একদিন জামাই নিজেই একটা হ্যাট কিনে আনে। এনে দেবুর মাথায় চেপে বসিয়ে দিয়ে বলে উঠে ঃ বাঃ বাঃ, কিরকম মানিয়েছে দেখ! এমন চেহারাখানা তোমার দেবু, আমার হিংসা হয়।

চিনু হাসে, দেবুও হাসে।

চিনু বলে ঃ দেবুকে যে আর চিনতে পারব না জামাই?

হাসতে হাসতে বলে জামাই ঃ না চেনবার তো কথাই পিসিমা। দেবু যে এখন দেবু বাড়ুজ্যে নয়। বানার্জী সাহেব। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলেই বলবে, হ্যালো মিঃ বানার্জী, অথবা নেহাৎ ভারতীয় হলেও বলবে, নমস্কার বানার্জী সাহেব।

আনন্দিত চিনু। এতেই সে সুখী। সে শুধু ভাবে, এ আনন্দের অংশটুকু কি করে দেবে মিনুকে।

এখনি দেওয়া চলবে না। আগে দেবু প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসুক। তার পরীক্ষার ফল বেরুক। তখন মিনুদের জানাবে, তাদেরও এখানে নিয়ে আসবে।

চিনু জামাইকে জিজ্ঞাসা করেঃ এই যে তুমি ঘর বাড়ি সাজালে, খরচপত্র চালাচ্ছ, কতো টাকা না জানি। দেবু পারবে তো সব শোধ করতে?

জামাই বলে ঃ এসব নিয়ে এখন আর যদি তুমি চিন্তা কর পিসিমা, তাহলে ঝগড়া হয়ে যাবে। মেটা সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আমি সব ব্যবস্থা করে নেবো। তাছাড়া, দেবু এখন চাকরি করছে, টাকা পয়সার সব ভাবনা তার। তুমি কি চিরকাল তাকে কোলের শিশুর মতো আগলে রাখবে? তুমি ঘর-কন্নাটা দেখবে। আমি যখন আসি, তখন খাবার যদি নাই দাও তাতে আসবে যাবে না কিছু। তবে এক কাপ করে গরম চা দেবে। ব্যস।

চিনু হাসি মুখে মন্তব্য করে ঃ পাগল ছেলে।

॥ উনিশ ॥

সাহেবি পোষাক পরা দেবু বসে আছে সেদিন সন্ধ্যায় জামাই-এর বাড়ির বাইরের ঘরে। আপিস-ফেরৎ এসেছে সে এখানে। হাতে তার একটি কাগজের মোড়ক। সেদিন প্রথম বেতন পেয়েছে দেবু। বড়মার জন্যে একখানা গরদের কাপড় কিনে এনেছে। তার প্রথম উপার্জনের টাকা। প্রথম ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করবে বড়মাকেই।

আর জামাইকে? কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। দেবেই বা কি? তবে শুধু জানিয়ে যাওয়া। আজ বেতন পেলাম জামাইদা। এর মধ্য দিয়েই সে প্রকাশ করবে অন্তরের অসীম কৃতজ্ঞতা। নীরব পূজা ছাড়া জামাইদা তার কোন পূজাই গ্রহণ করবে না।

জামাইয়ের বাইরের ঘরে এসে বসল দেবু।

ডাক শুনে বেরিয়ে এল জামাই ভেতর থেকে। দেবু তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল ঃ আজ বেতন পেলাম জামাইদা।

ঃ তার জন্যে বুঝি আমাকে প্রণাম করতে হবে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেবুর পিঠে চাপড়ে দিল জামাই ঃ বলিহারি দেবু, আমার মুখ রেখেছিস। মেটা সাহেব তোর ওপর খুব খুশি। তবে হ্যাঁ, ইংরিজিটা ভালো করে রপ্ত করে নিবি।

দেবু বলে ঃ চেষ্টা তো করছি জামাইদা! কিন্তু বিদ্যের দৌড়টাত বুঝতে পারছ।

ঃ আরে না, না। বলে ওঠে জামাইঃ কলেজের ডিগ্রির কোনো দাম নাই। আমার বিদ্যে থার্ড ক্লাশ পর্যন্ত—বলিনা কাউকে। হাতে কলমে কাজ শিখেছি—সেখানে হেঁ হেঁ বাবা, ফাঁকি দিইনি। আর একটা কথা জেনে রাখবি, কখনো মিথ্যে কথা বলবি না। ফাঁকি দিবি না। আর খারাপ কাজ করবি না।

দেবুর বড়মাও এই শিক্ষা দিয়েছে তাকে। দেবুর এমন হয়েছে যে, এখন বোধ করি ইচ্ছে করলেও মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। অন্যায় কিছু করা, ফাঁকি দেওয়া কিছুতেই তার সইবে না।

কিন্তু শুধু নিজের জীবনই তো মানুষের সব নয়। তার সঙ্গে আরও অনেক জড়িয়ে থাকে। সে অচ্ছেদ্য বন্ধন কাটা যায় না। তাই নিজের উন্নত চরিত্র ও কর্তব্যবোধ সাধুতায় এসে ছায়াপাত করে বংশের, পরিবারের কালিমা। সেদিনও তার জন্যে এমনি একটা মর্মন্তুদ দুঃখ বেদনা অপেক্ষা করেছিল।

দেবু কাগজের মোড়ক খুলে জামাইদাকে বড়মার জন্যে কেনা গরদের কাপড়খানি দেখালো। জামাই প্রশংসা করল দেবুর। বেশ কাজ করেছে সে। তার রুচি-জ্ঞান ও পছন্দ আছে।

কাপড়খানা আবার মোড়ক বেঁধে রাখছে দেবু। এমন সময় একটি প্রৌঢ় লোক এসে প্রবেশ করল সে ঘরে। সে আর কেউ নয়, দয়াময়। সেই ভিখিরি বেশ। ছেঁড়া জমা কাপড়, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি।

দয়াময় এখন বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়ায়, জীবন ঘটক আর অপূর্বর ভয়ে। ওরা তাকে তাড়া করে ফিরছে এখন। চাকদায় ক' দিন ঘাঁটি করে বসেছিল। পুলিশে দেবার ভয় দেখিয়ে গেছে মিনুকে। তাই আর বাড়িমুখো হয় না সে। মামলা তো তার টিকলো না। এখন সে ঘুরে বেড়ায়। আর ভিক্ষে করে।

জামাই-এর বাইরের ঘরে প্রবেশ করেই হাতের ব্যাগটি রেখে মেঝেতেই বসে পড়ল দয়াময়। তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বলল ঃ ব্রাহ্মণ আপনারা? প্রণাম হই।

তারপরই শুরু করল ঃ দেখুন, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আমি। কন্যাটি এতো বড় যে, আর রাখা যায় না মশাই, তাই কিছু ভিক্ষে চাইছি আপনাদের কাছে।

সাহেবি পোষাক-পরা দেবুকে চিনতে পারেনি দয়াময়। সে বয়স্ক দেখে জামাই-এর সঙ্গেই কথা বলেছিল। দৃষ্টিও বিশেষ ভাবে সেদিকেই ছিল। কিন্তু দেবু তাকে প্রথম না পারলেও পরমুহূর্তেই চিনেছে। কি গভীর লজ্জা! কি করবে সে এখন? তার বাবা এসেছে ভিক্ষা করতে! মিথ্যে কথা বলে ফাঁকি দিয়ে তার কাছেও ভিক্ষে চাইছে। পালাতে হবে তাকে এখান থেকে। এছাড়া আর পথ নেই। নইলে, সে চাকরি করে প্রথম বেতন পেয়েছে আজ। বাবাকে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ারই তো কথা ছিল। বেদনার্ত দেবু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, হাতের ইঙ্গিতে জামাইকে জানাল সে চলে যাচ্ছে। তারপরই দ্রুত ঘর থেকে চলে গেল।

সে চলে যেতেই দয়াময় আবার বলল ঃ দেখুন, আপনাদের বিবাহযোগ্য কন্যা বোন যদি থাকে, তাহলে আমার জ্বালা আপনারা বুঝতে পারবেন। একজন তো চলেই গেলেন। তা' এ রকম অনেকেই চলে যান। দূর, দূর করে তাড়িয়ে দেন। আবার অনেকে দেন কিছু কিছু। বিপদের ওপর বিপদ দেখুন, চোখে ছানি পড়ে চিকিচ্ছে করাতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। খরচ মানে দেনা। দিন বাবু, যৎকিঞ্চিৎ যা ইচ্ছে, যা' পারেন।

জামাই পকেট থেকে বের করে দু'টো টাকা দিল দয়াময়ের হাতে। বলল ঃ নিন, আর বেশি কিছু দেবার ক্ষমতা থাকলে দিতাম। এই নিয়েই খুশি হয়ে চলে যান।

টাকা দু'টি হাতে নিয়ে খুশিই হল দয়াময়। এই মন্দ কি! সে বলল ঃ ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। প্রণাম!

তারপরই ব্যাগটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দেবু বাইরে দয়াময়েরই অপেক্ষায় বাইরে পায়চারি করছিল। দয়াময় রাস্তায় এলে সে ডাকল ঃ শুনুন।

দয়াময় সাড়া দিল কে?

দেবু বলল ঃ আসুন আমার সঙ্গে।

দয়াময় উল্লিসিত হল ঃ কিছু দেবেন?

দেবু বলল ঃ হ্যাঁ, আসুন।

গলে গেল দয়াময় ঃ চলুন। সজ্জন ব্যক্তিরা দানটা গোপনেই করে থাকেন। কন্যাদায় যে কতো বড় দায়।

দেবু আগে হেঁটে চলেছে। সে মুখ না ফিরিয়েই বলল ঃ কিছু বলতে হবে না! চুপ করুন।

ঃ বেশ বাবা বেশ। বলল দয়াময় এই চুপ করলাম। বলুন। দেবু তার বাড়িতে গিয়ে বাইরের ঘরে প্রবেশ করে একখানি চেয়ার দেখিয়ে বলল ঃ বসুন। আমি আসছি।

ভিতর বাড়িতে যাবার আগে সে দয়াময়ের পা ছুঁয়ে একটা প্রণাম করে গেল। এতোক্ষণ ঘরখানা অন্ধকার ছিল। কেউ আলো জ্বালেনি। শুধু বাইরের আলোয় কিছুটা দেখা যাচ্ছিল ঘরের সব কিছু। এবার দেবু সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল।

প্রণাম পেয়ে কেমন যেন বিস্মিত হল দয়াময়। এতো ভক্তি! মুখে সে বলল ঃ বেঁচে থাকুন বাবা! দীর্ঘজীবী হোন।

ভেতরে গিয়ে চিনুকে ডাকল দেবু ঃ বড়মা, শোন এদিকে।

ঃ কে রে, দেবু এলি? রান্না ঘর থেকে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল দেবু। বেরিয়ে এসেই আবার বলল ঃ কি রে, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ঘরের ভেতরে আয়। কি হয়েছে তোর? দেরী করে এলি, খাসনি কিছু—

দেবু বলল ম্লান হাসি হেসে ঃ না বড়মা। এই নাও তোমার জন্যে এনেছি। আজ প্রথম মাইনে পেলাম কিনা।

কাপড়ের মোড়কটি চিনুর হাতে দিয়ে প্রণাম করল দেবু তাকে।

মোড়ক খুলে দেখে চিনু বলল ঃ ওমা এ যে গরদের কাপড়। এখন এসব কি জন্যে আনলি বাবা? অনেক দাম নিল তো!

দেবু বলল ঃ তা নিকগে। ইচ্ছে হলো তোমার জন্যে কিছু একটা নিয়ে আসি, তাই চট্ করে একটা কিনে ফেললাম। বেশি দাম আর কোথায়?

চিনু অভিভূত হয়ে গেল। সে কাপড়খানা দু'হাতে বুকে চেপে ধরল। তার দু'চোখ জলে ভরে এলো।

বেশি দাম নয়? এর দাম অনেক। এর দাম লক্ষ টাকা।

দেবু বলল ঃ বড়মা, তুমি একবার বাইরে এসো।

বড়মা বলল ঃ কেনরে, তুই আয় না ভেতরে?

দেবু রাজি হল না ঃ না জুতো খুলতে হবে। প্যান্ট পরে রয়েছি। অনেক হাঙ্গামা। তুমি বাইরের ঘরে চল।

চিনু বলল ঃ বাইরের ঘরে? '

—কাকে ধরে এনেছি দেখবে এসো। বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখেছি।

—কে?

—বাবা!

—ভালা করেছিস্। কোথায় দেখা হল?

—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা। জামাইদার বসবার ঘরে বসেছিলাম। বাবা ঢুকল সেখানে। প্রথমে চিনতেই পারিনি পোষাক পরিচ্ছদে। কি বললে জানো? বললে, আমার কন্যাদায়, কিছু ভিক্ষে দিন।

—জামাই চিনতে পারেনি তো?

—না। বাবাও আমাদের কাউকে চিনতে পারেনি। কিন্তু ছিঃ ছিঃ, কি রকম মিথ্যে কথা বলে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে দেখো।

—শুধু এই জন্যেই তোকে আমি ওদের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছি বাবা। চল যাই, ওকে একটু লজ্জা দিই।

লজ্জা! তার বাবাকে বড়মা লজ্জা দেবে!

দু'জন তারা বাইরের ঘরের দিকে গেল। দেবু রইল বাইরে। চিনু গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

দয়াময় বসে বসে ভাবছিল, এ কি অদ্ভুত লোকের ডাকে এলো সে। তাকে বসিয়ে রেখে যে ভেতরে চলে গেল, আর দেখাই নেই। এরকম অভ্যর্থনা, চেয়ারে বসতে দেওয়া, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করা, আবার চুপ্ করুন বলে একটুখানি শাসানোও, যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। যাই হোক! তার আর কিই বা হবে। দেখাই যাক।

চিনু এসে ঘরে ঢুকল। এগিয়ে গেল দয়াময়ের কাছে।

চিনু বলল ঃ তা' মশাই, কন্যাটি কতো বড়ো হল? বলি, রোজগার করবার এই সহজ পথটি কতোদিন ধরেছেন প্রভু?

—কে? আমার চোখে ছানি পড়েছিল, কাজেই দৃষ্টিশক্তি একটু—

—ক্ষীণ হয়েছে। কিন্তু শ্রবণশক্তি যখন ঠিকই আছে আমার প্রশ্নটা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন, তার জবাবটা পেলেই আমি খুশি হব। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, আপনার যে কন্যার বিবাহের জন্যে আপনি ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, সে কন্যাটি আপনার কখন জন্মগ্রহণ করেছে? কারণ, আমি জানি আপনার কোন কন্যা নেই।

—চিনু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি চিন্ময়ী। আপনার পত্নীর সহোদরা ভগিনী, আপনার শ্যালিকা।

—দ্যাখো চিনু, আমার কি দুরবস্থা হয়েছে একবার দ্যাখো। সংসার আর কিছুই চালাতে পারছি না। তাই কখনো কন্যাদায়, কখনো পিতৃদায় মাতৃদায় এমনি সব নানান ছলচাতুরী করে যা'পাই তাই দিয়ে কোনরকমে চালাই। কিন্তু এতেও ঠিক চলে না।

ধরা পড়ে গিয়ে এবার অভিনয় শুরু করল দয়াময়। দক্ষ অভিনেতা সে। লজ্জা পেয়েও সে লজ্জিত হয় না। শুধু লজ্জার অভিনয়ই করে। নিজের ওপর ঘৃণা, তাও নেই তার। ঘৃণা, লজ্জা ভয় কিছুই তার নেই। আজ যখন জানল, তার ছল চাতুরী ধরা পড়ে গেছে তারই ছেলে দেবুর কাছে এবং দেবুই তাকে এনে চিনুর কাছে হাজির করেছে, তখন সে মুখেই শুধু ছি ছি ছি করল। মনে মনে ভাবল, ভালই তো হল। এখানে মাসিকে নিয়ে সাহেব সেজে রয়েছে সে, স্বচক্ষে দেখুক তার বাবাকে কি করে সংসার চালাতে হয়। বিয়ে বিয়েটাও যদি করতো তাহলেও সংসারের দুর্ভাবনা কিছুটা ঘুচতো। ভাল করে অবিনাশ গাঙ্গুলীর ঘাড়ে চাপতে পারতো দয়াময়। উল্‌টো এখন ওদের তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে সে! সে তো ওই চিনু আর দেবুর জন্যেই। দেখুক, দেখুক দেবু, বুঝুক। জানে জানুক লোকে, দেবুর বাবা ভিক্ষে করে বেড়ায় আর সে সাহেব সেজে রাণীগঞ্জে থাকে।

প্রশ্ন করে দয়াময় ঃ তোমার এখানে, দেবু ওরকম সাহেবি পোষাক পরে, ব্যাপার কি বলতো চিনু?

ব্যাপারটা বুঝিয়েই বলে চিনু। দেবু এখন এখানে চাকরি করে। তেমন বড় চাকরি নয়। তবে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

চাকরি করে তার ছেলে দেবু? মাসিকে নিয়ে বাসা করে আছে রাণীগঞ্জে?

দেবুকে ডেকে আনে দয়াময়। নিজেই ডেকে আনে। হতভাগ্য পিতা তার চাকুরে ছেলেকে ভালো করে দেখে ছানি-পড়া নয়ন সার্থক করতে চায়।

দেবু এসে আবার প্রণাম করে বাবাকে।

দয়াময় বলে ঃ আবার কেন? বা-বা-বা, তা যে সায়েবের মতো পোষাকটা খুলে ফেললি কেন বাবা? এদিকে আমার কি হাল হয়েছে দেখ, কি রকম করে মানুষের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াই তো!

দেখেনি! অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবেই দেখেছে দেবু। আবার সে নির্লজ্জের মতো তার কাছে তুলে তার মনে করুণা জাগাতে চেষ্টা করছে তার বাবা! কিন্তু নিরুপায় দেবু! দয়াময় তার বাবা!

দেবু বলল ঃ না, ওরকম করে আর ঘুরে বেড়াতে পারবেন না আপনি। আমি এবার থেকে মাসে মাসে আপনাকে কিছু কিছু করে টাকা পাঠাবো।

দয়াময় উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে আবেগভরা চোখ দু'টি বুঝল। মুখে একটা অস্বস্তির হাসি ফুটিয়ে তুলল ঃ বেশ বাবা, বেশ! তা'হলে আর এসব কেন করবো। করবো না। না, করবো না। কেন করবো। কি বল চিনু।

চিনুকে সাক্ষী মানছে দয়াময়? কিন্তু চিনু দয়াময়কে বহুকাল থেকে দেখে আসছে। স্বভাবটা কি ছাড়তে পারবে দয়াময়? ভিক্ষে করে খাওয়ার সহজ নেশায় তাকে পেয়েছে, সে-নেশা ছাড়তে পারবে?

দয়াময়ের সে-রাতটা কাটাল দেবুর বাসায়।

পরদিন সকলে বিদায় নেবার আগে চিনু এক ঝুড়ি শাক সব্‌জি কিছু ফল দিয়ে বলল, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মিনুকে দিতে। দেবু কিনে এনেছে সব।

দেবু বাবাকে চল্লিশটি টাকা দিয়ে বলল ঃ এবার এই চল্লিশ টাকা নিয়ে বাড়ি যান। সামনের মাস থেকে আরো বেশি পাঠাতো চেষ্টা করব। তবে আর যেন ভিক্ষে করতে না বেরোন।

না, না, এসব কি আর করতে পারে দয়াময়? তবে—নোট পকেটে রাখল। তাই বলল ঃ দেবু যদি আরো দশটা টাকা দেয় তাকে তাহলে খুব উপকার হয়।

সেই ভিখিরির সুর! দেবুর মনটা কেমন খারাপ হয়ে পড়ে। কিন্তু সে আর একখানা নোট বাবার হাতে তুলে দেয়।

॥ কুড়ি ॥

বাড়ি যাবার পথে দয়াময় আসানসোলে এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে সেই শাক-সব্‌জি আর ফলের ঝুড়ি। মনে মনে সে শুধু ভাবছিল, তারই ছেলে দেবু। সে চাকরি করে, আর চিনুটা বাসা করে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। কি আপ্যায়িত করেছে। চিনু, মিনুর জন্যে এগুলো দিলাম। এর একটা প্রতিকার করতেই হবে।

কিন্তু সে কিছুই আর করতে পারবে না। পারে একমাত্র মিনু। সে দেবুর গর্ভধারণী মা।

মিনুর জন্যে একখানা শাড়ি কিনে নেবে দয়াময়। তা'হলে নিশ্চয়ই সে খুশি হবে।

শাড়ি কিনতে যাচ্ছে দয়াময় আর অন্য একটা কথাও ভাবছে। বাড়ি তো ফিরে চলল। গিয়ে যদি দেখে জীবন ঘটক আর অপূর্ব দোর আগলে কাবুলীওলার মতো লাঠি নিয়ে বসে আছে? তাহলে? কি যে বিপদ! তার চেয়ে গভীর রাতে গিয়ে দয়াময় প্রবেশ করবে বাড়িতে। তারপর ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়বে। অথবা—

জীবন ঘটক দয়াময়ের পিছু নিয়েছে তো নিয়েছেই। দয়াময়কে ধরতে না পেবে

সে আর অপূর্ব বাসুদেবপুরে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে খবর পেয়েছে দেবু আর তার মাসিমা আসানসোলে আছে। সেখানে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল দেবু। অমনি রয়ে গেছে। তার খোঁজ যদি বের করতে পারে, তাহলে—কান টানলে মাথাটাও আসতে পারে!

আসানসোলে এসে সন্ধান করে করে জীবন ঘটক আর অপূর্ব গিয়ে বসল অধর চাটুজ্যের দোকানে। উদ্দেশ্য কাপড় কেনার নাম করে দেবুর খোঁজ খবর নেওয়া। যদি কেউ বলতে পারে। চাক্‌দার দয়াময় বাঁড়ুজ্যের ছেলে, বাসুদেবপুরের চিন্ময়ী দেব্যার বোনপো দেবু বাড়ুজ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে এসেছিল এই আসানসোলে। অধর চাটুজ্যে এ অঞ্চলে ডাকসাইটে লোক, তিনি বা তাঁর কোন কর্মচারী খবরটা জানলে জানতেও পারে।

ওরা দু'জনে কাপড়-চোপড় দেখতে আরম্ভ করেছে, আর জীবন ঘটক ভাবছে কি সুযোগে কথাটা তুলবে, এমনই সময় স্বয়ং দয়াময় সশরীরে এসে হাজির হল চাটুজ্যের দোকানে ঃ দিন দেখি শাড়ি একখানি, বেশ সরেস জমিন, চওড়া লাল ফুল ফুল পাড়।

দেখেই লাফ মেরে উঠল জীবন ঘটক ঃ এই দেখ, মেঘ না চাইতে জল। বলি ও মশাই, আমরা যে এদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

যে বিপদের ভয় করেছিল দয়াময় বাড়ি পৌঁছাবার আগেই পথে সেই বিপদ এসে উপস্থিত। এসে গেছেই যখন, তখন তার মুখোমুখী হতেই হবে। ঘাবড়ালে চলবে না।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে দয়াময় বলল ঃ আমাকে কিছু বলছেন?

খেঁকিয়ে উঠল ঘটক ঃ আজ্ঞে আপনাকে! মেয়ে পছন্দ করে টাকা তো নিয়ে এলেন, এক আধ টাকা নয়, ছ'শ পঁচিশ টাকা। তারপর ছুটে মর এখন তুই ব্যাটা ঘটক। একবার চাক্‌দা, একবার বাসুদেবপুর, তারপর শুনলাম এখানে আপনার—

অপূর্ব উগ্রকণ্ঠে বলে উঠল ঃ অত সব কথায় কাজ কি। টাকাটা ফেরৎ দিন। বিয়ে আপনি দিতে পারবেন না বুঝতে পেরেছি।

ঘটক মন্তব্য করল ঃ দেবেন কি করে, ছেলেই তো ওর নয়।

তেড়ে উঠল দয়াময় ঃ কি! ছেলে আমার নয়?

অপূর্ব বলল ঃ হ্যাঁ' আপনার নয়, আমরা এনকোয়ারি করেছি।

বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল দয়াময় ঃ কোথায় এনকোয়ারি করলেন?

অপূর্ব উত্তর দিল ঃ বাসুদেবপুরে। আপনার শালা, শালা বিশু মুখুজ্যেকে চেনেন না? তা চিনবেন কি করে?

ঃ ধেৎ তেরি বিশু মুখুজ্যে—ঘৃণা ভরে উচ্চারণ করল দয়াময়।

চাটুজ্যের কানে গেছে এই ঝগড়ার কোলাহল। তিনি উঠে এলেন।

সবিনয়ে নিবেদন করলেন যে, এটা কারবারের জায়গা, এখানে ঝগড়া মারামারি চলতে পারে না। তাঁরা বরঞ্চ অনুগ্রহ করে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে মারামারিটা সারুন। তারপর দোকানে যদি কোন কাজ থাকে, তাহলে আসবেন।

সহজে কি আর সে ঝগড়া থামে? চাটুজ্যের বিনীত আবেদন ব্যর্থ হয়। আবার তাঁকে সালিশ মানে জীবন ঘটক।

দয়াময় এবার একটা চাল দেয়। ছেলে তার হাজার হাজার টাকা উপার্জন করে, সাহেব হয়েছে, এখন আর দেড় হাজারে হবে না, তিন হাজার চাই। ওরা চায় তো রাণীগঞ্জে গিয়ে দেখুক, খোঁজ খবর নিক, ছেলে তার সাহেব হয়েছে কি না। সাহেব জামাই দেড় হাজার টাকায়? সে কি হয়। টাকা ফেরৎ? বিয়ের টাকা ফেরৎ হয় না, বিয়ে হয়। বিয়ে দিতে দয়াময় খুব রাজি আছে। এখন অবিনাশ গাঙ্গুলী যদি তিন হাজার টাকা দিতে রাজি থাকেন, তাহলে দয়াময়কে খবর দেবেন। তা' নইলে ওই ছ'শ পঁচিশ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। এই হচ্ছে নিয়ম। নালিশ করবে? করতে পারে তারা। দয়াময় হাকিমকে বলবে, অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, হুজুর, যখন আমি প্রথম বিয়ের কথা বলেছিলাম, তখন আমার ছেলে ছিল ছাত্র, তখন যদি দাম হয়ে থাকে দেড় হাজার টাকা এখন সে সাহেব হয়েছে, অনেক টাকা উপার্জন করে, এখন তার দাম কত?

এ লোকের সঙ্গে পারবে না ঘটক আর অপূর্ব।

জীবন ঘটক সাক্ষী মানে অধর চাটুজ্যেকে ঃ আপনি সাক্ষী রইলেন স্যার।

এ ঝগড়া যে করেই হোক থামাতে হবে। দোকানের মধ্যে গোলযোগ।

অধর চাটুজ্যে বললেন ঃ হাই দেখো, তা মশাই সাক্ষী রইলাম।

জীবন ঘটক আর অপূর্ব অগত্যা বিদায় নিল। সব গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে অবিনাশ গাঙ্গুলীকে।

দয়াময় আপাতত শাড়ি কেনায় মনোযোগ দিল। বেশ ভালো দেখে লাল পাড়, ফুল ফুল একখানা শাড়ি।

বাড়ি ফিরে গিয়ে অধর চাটুজ্যে গিন্নীকে ডেকে বললেন যে, গিন্নী তো বুঝলেন না কি ফন্দি করে তিনি দেবুকে দোকানে বসাতে চেয়েছিলেন। আজকাল একটা ছেলে পাওয়া যে কি মুস্কিল। ওই তো পণের টাকা এডভান্স এনে ছেলের বাবা হাঁকছে দেড় হাজারে হবে না, তিন হাজার দিতে হবে। ঘটক হন্যে হয়ে ছেলের বাবার পিছু পিছু ছুটছে। তাই একটি ছেলেকে নিজের মুঠোতে এনে যদি ঢোকান যায়, তাহলে আর দুর্ভাবনা থাকে না।

দু'চোখ কপালে তোলেন গিন্নী ঃ ওমা, তা' আগে বলনি কেন? আঃ আমার পোড়া কপাল। এমন জানলে কি আমি ছেড়ে দিতাম কখনো?

চাটুজ্যে বলেন ঃ তা' ছেড়ে দিয়েছ, বেশ করেছ। আমার জামাইয়ের অভাব হবে না। টাকার লোভে কতো ভালো ভালো ছেলের বাবা এসে সাধাসাধি করবে দেখো। যা' গেছে, তাকে যেতে দাও।

গিন্নী বলেন ঃ তা' হ্যাঁ গা, একবার খোঁজ খবর নিলে হয় না?

কি ভাবলেন চাটুজ্যে। তার পরই বলে উঠলেন ঃ না, না, কখ্‌খনো না। ভেবে দেখলাম, ওরা গরীব মানুষ। জামাই করবার মতলব বুঝতে পেরেছে কি পেয়ে বসবে। বলবে, তোমার এই মেয়েই তো সব পাবে। তা' এখুনি তোমার সব কিছু দিয়ে দাও, দিয়ে তোমরা দুই বামুন বাম্‌নী লোটা কম্বল নিয়ে বোম্‌ বোম্‌ করে বেরিয়ে পড়। যে গেছে সে যাক্‌। তাকে আর টেনে ধরতে যেয়ো না। খারাপ কাজ হয়ে যাবে। যেতে দাও, যেতে দাও।

গিন্নী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

॥ একুশ

দয়াময় চাক্‌দায় ফিরে এলো। এবার গতি বেড়েছে। দেহের গতি, মনের গতিও। কতো কি চিন্তা করছে সে। ছেলে তার চাকরি করে, সাহেব হয়েছে। চট্‌ করে পঞ্চাশটি টাকা বাবার হাতে তুলে দিল। বললে, সামনের মাসে আরো বেশি পাঠাবে। এমন যে ভিক্ষে করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল দয়াময়, তা' তেমন বললে কই? বার বার দু'বার করে প্রণাম করলে। যা' হোক, পিতৃভক্তি আছে!

বাগড়া দেয় শুধু ওই চিনুটা! নইলে দেবু যে বাবার বশম্বদ হয়ে থাকতো তাতে ভুল নেই।

চাকদায় এসে গাড়ি থেকে ঝুড়ি ও ব্যাগ নিয়ে নামে দয়াময়। আরো তাড়াতাড়ি, সে উড়ে আসতে চেয়েছিল। এ কি ধক্কর ধক্কর করে চলা রে বাবা! যেনো গোরুর গাড়ি।

খালাসী ছুটে এসে টিকিটের জন্য ঃ ও মশাই, ও বাবু।

থেমে পড়ে আজ মিটি মিটি হাস্‌তে থাকে দয়াময়, খিঁচিয়ে উঠে না, পালিয়ে যেতেও চেষ্টা করে না। বলে ঃ টিকিট তো! তোদের এ গোরুর গাড়ির লাইনে আর কোনদিন দয়াময় শর্মা চড়বে না, বুঝলি? শুধু রাণীগঞ্জে গিয়ে পৌঁছাতে দে। সে সব জায়গায় বড়ো বড়ো লাইন আর বড়ো বড়ো গাড়ি। আর লোকটা বলে কি? আমার বড় ছেলে দেবু বাড়ুজ্যে সেখানে চাকরি করে, সাহেব হয়েছে। এলে সাহস হবে তার কাছে টিকিট চাইতে? তোর ওই মাষ্টার পর্যন্ত সেলাম ঠুক্‌বে। দেখেছিস্‌, কতো বড়ো কপি দিয়েছে, আর কতো কি! দেখেছিস্‌ জন্মকালে? যা' যা' আর টিকিট চাইতে হয় না। তবে হ্যাঁ।

দয়াময় পকেট থেকে একটি আনি ছুঁড়ে দিলে খালাসির দিকে ঃ এই নে বকশিস্। যা'।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খালাসি। দয়াময় দ্রুতগতিতে গিয়ে পথে পড়ল।

গাঁয়েও যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই জানাল দয়াময়, দুঃখ এবার ঘুচল দাদা। দেবু সাহেব হয়েছে। মস্ত বড় চাকরি। এই দেখ, কতো কি দিয়ে দিয়েছে।

দয়াময় বাড়িতে এসেই প্রথমে ব্যাগ খুলে শাড়িখানা তুলে দিল মিনুর হাতে। মিনু অভিযোগ করে ঃ এসব তুমি কেন আনতে গেলে বল তো।

দয়াময় বলে ঃ কেন, বেশ তো! চিকন চিকন, ফুল ফুল।

হায়রে কপাল! মিনু চিকন চিকন ফুল ফুল কাপড় পরবে। তারপর এতো সব শাক-সবজি, ফল মূল। চাল ধার করে সংসার চালায় মিনু।

দয়াময়ের মাথায় অবিরাম নানা ফন্দি ফিকিরের সৃষ্টি হচ্ছে। নানা উপায় চিন্তা করছে সে।

সে বলল মিনুর কথার উত্তরে ঃ না, না কিনে আনিনি এসব, কিনে আনিনি। সব দিয়েছে তোমার দিদি, চিন্ময়ী। দয়া করে আমাদের ভিক্ষে দিয়েছে।

দিদি ভিক্ষে দিয়েছে? বাসুদেবপুরে গিয়েছিল দয়াময়?

না বাসুদেবপুরে নয়। রাণীগঞ্জে। রাণীগঞ্জে দেবুর সংসারে চিনু এখন রাণী হয়ে বসেছে। মস্ত বড়ো বাসা। ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বলে। দেবু সাহেব সেজে থাকে। দেবু চাকরি করে আর চিনু পায়ের ওপর পা তুলে বসে সংসার চালায়। কতো খোঁজ করছে দয়াময় বাসুদেবপুরে, চিনুরও খবর নেই, দেবুরও খবর নেই। গেল কোথায়? পরীক্ষা উপলক্ষ্যে আসানসোলে গিয়েছিল, আর খবর নেই। ওদিকে তারা রাণীগঞ্জে গিয়ে সুখের সংসার পেতে বসে আছে। দেবু চাকরি করছে।

মিনু দুঃখিত হয় না, বরঞ্চ খুশিই হয়ে উঠে। তার দেবু চাকরি করছে। যে চিনু তাকে মানুষ করেছে, তাকে সে সুখী করেছে। ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানায় মিনু।

একসঙ্গে সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করে না দয়াময়। ধীরে ধীরে সে মিনুকে পথে আনবে।

সে পকেট থেকে টাকা বের করে দেখায় মিনুকে। কর্‌করে নোট। চট্ করে পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে দিয়েছে দেবু। এতেই বোঝা যায়, কতো টাকা পাচ্ছে সে।

আবার এক সময়ে বলে ঃ চিনু না বলেছিল দেবু এখন চাকরি করবে না, এই কি তার চাকরির বয়েস? আর এখন? নিজে তাকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে দিব্যি বসে বসে দেবুর রোজগার খাচ্ছে। চিনু কি আমাদের কম সর্বনাশ করলে!

মিনু বলে ঃ হ্যাঁ, তা বলবে বই কি। ওই সাহেব ছেলে তুমি পেলে কোত্থেকে শুনি? ওই চিনি বামনী তাকে মানুষ করেছিল বলে।

ধমক দিয়ে ওঠে দয়াময় ঃ চুপ কর। চিনুর জন্যে আমি কম বেইজ্জত হয়েছি? ধরেছিল ঐ ব্যাটা ঘটক। বলে কিনা বিয়ে আপনি দিতে পারবেন না, টাকা ফেরৎ দিন। বলে কিনা ছেলে আপনার নয়।

মিনু বলে ঃ ঠিক বলেছে, বাপের কাজ তুমি করেছ?

চীৎকার করে উঠে দয়াময় ঃ কী, বাপের কাজ আমি করিনি?

যতোবারই দয়াময় মিনুকে বোঝাতে যায়, চিনু তাদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তাদের বঞ্চিত করে সে সুখভোগ করছে, ততোই মিনু—চিনুর পক্ষ নেয়। করুক না হয় সুখভোগ দিদিই, সেই তো দেবুকে মানুষ করেছে। মিনুর আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। দেবু মানুষ হয়েছে, সে সুখে থাকবে এই যথেষ্ট।

দয়াময়ের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায় মিনুর কাছে। সে দিদির বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠে না।

এক সময়ে দয়াময় রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ঃ আমার ছেলে—আমি তো দিতে চাইনি, দিয়েছ তুমি। তুমি কি কম শত্রুতা করেছ? মা হয়ে পেটের ছেলেকে বিলিয়ে দিয়েছ। তুমি যদি তোমার দিদির কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে নিতে না পার তো আমি তোমার অপমানের বাকি কিছু রাখবে না বলে দিচ্ছি।

মিনু উত্তর দেয় ঃ কর, কর তুমি অপমান। তোমার যা' খুশি তাই কর। আমি পারব না, পারব না দিদির কাছ থেকে ছেলে কেড়ে নিতে। মা হয়ে মায়ের কোল থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিতে আমি পারব না।

দয়াময় পরাস্ত হয়। পরাজয় কিন্তু সে স্বীকার করবে না।

ছেলে মাসে মাসে টাকা পাঠাবে, এতেই সন্তুষ্ট থাকবে দয়াময়? এইটুকু অধিকারই তার ছেলের ওপর? আর চিনু! চিনু 'যা' বলবে দেবু তাই করবে। চিনু যদি একদিন বলে, তোর বাবাকে আর টাকা পাঠিয়ে প্রয়োজন নেই দেবু, দেবু অমনি হাত গুটিয়ে ফেলবে। যার ধন, তার ধন নয়, নেপো মারবে দই? দয়াময় তা' হতে দেবে না।

কি বোকা এই মিনুটা! নিজের স্বার্থটাও বুঝে না।

দয়াময়কে সে আমল দেয় না! চিনু তো নয়ই। দেবুটাও না। নইলে কি দয়াময়ের এতো ভজতে হতো মিনুকে? দয়াময় জানে, তাকে ওরা উড়িয়ে দিলেও মিনুকে ওরা কেউই ঠেলতে পারবে না। ও যদি মায়ের দাবি নিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে ঃ দেবুকে মানুষ করে তুলেছ দিদি, চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব, তাবলে তাকে বাবা-মার কাছে থেকে কেড়ে নিও না, তাদের পর করে দিও না। তাহলে? ছেড়ে না দিয়ে পারবে না চিনু।

কিন্তু মিনু যে কিছুতেই বাগ মান্‌ছে না।

অবশেষে মোক্ষম অস্ত্র ত্যাগ করল দয়াময়ঃ শোন মিনু, চিনুকে সরিয়ে দিয়ে দেবুকে তোমায় আমার করে দিতেই হবে। না যদি পার, তবে ওই ছেলের দিব্বি রইল তোমার। তার মাথা খাবে তুমি। তার—

আর্তনাদ করে উঠল মিনু। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েমানুষ মিনু। পুত্র স্নেহে দুর্বল মিনু। বাবা হয়ে এই দিব্বি দিল তাকে! এ যে অভিশাপ।

—এ কি বললে? তুমি আমাকে ছেলের দিব্বি দিলে? এতো বড় কথা তুমি বলতে পারলে? চল, আমাকে নিয়ে চল দিদির কাছে। দেখব, আমি তাকে বলব।

মাটিতে গড়িয়ে পড়ল মিনু। ঠাকুর দেবতার কাছে অশ্রুসিক্ত ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা জানাতে লাগলঃ দেবুর যেন কোন অকল্যাণ স্পর্শ করে না ঠাকুর।

দয়াময়ের চোখ দু'টো এবার জয়ের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মিনু রাজি হয়েছে।

সে রাণীগঞ্জ যাবার তোড়জোড় করতে লাগল।

॥ বাইশ

দেবু তখন হাজারীবাগ গেছে। মেটা সাহেব সেখানে ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে। কোম্পানি থেকেই যাতায়াত খরচ পাবে সে।

জামাইকেও লিখেছেন মেটা সাহেব, ওকে পাঠিয়ে দাও।

বাইরে মোটেই যাতায়াত করেনি দেবু। জামাই বুঝিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে তাকে। কি করে কোথায় যেতে হবে। কোন ষ্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ি থেকে নামবে। তারপর ট্রাকে চড়তে হবে। কোম্পানির ট্রাক।

চিনু একা রয়েছে বাড়িতে। সে একটা ওটা করে আর অবসর সময়ে বসে দেবুর কথাই ভাবে। আর ভাবে মিনুদের কথা।

একদিন এমনি বসে ভাবছে চিনু, এমন সময় মিনুর ডাক শোনা গেল, দিদি, দিদি আছিস্?

বিস্মিত হল চিনু। আবার আনন্দিতও হলঃ কে রে, মিনু এলি? আয়, আয়। ভালোই হল।

মিনু গম্ভীর মুখে বললঃ না দিদি, ভালো হয়নি। আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছি। দেবু কোথায়?

দেবু হাজারীবাগে কাজে গেছে, শিগ্‌গিরই আসবে। বলল চিনুঃ ঝগড়া করবি আমার সঙ্গে, তা' কর না। কতো ঝগড়া করবি? আমি কি তোর ঝগড়াকে ভয় করি নাকি? এই সবে চাকরিতে ঢুকেছে। এরই মধ্যে পয়সা খরচ করে কপিটপি আমি

পাঠাতে গেলাম কেন, এই তো বলবি? তা' আমি বুঝতে পেরেছি। হাজার হোক, তোরই তো ছেলে মিনু, ছেলের রোজগার, একে ওকে দশজনকে দেখিয়েও তো সুখ।

মিনু বলল ঃ সেসব আমি মুখেও দিইনি। পাড়াপড়শীকে বিলিয়ে দিয়ে চলে এসেছি।

চিনু বলল ঃ তা' বেশ করেছিস্। বাড়িতে রেখে এলে ফিরে গিয়ে দেখতিস্ সব পচে নষ্ট হয়ে গেছে। ওমা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভাল করে বোস। ওরা আসেনি সঙ্গে? দয়াময়ই তো নিয়ে এসেছে? এ বাড়ি সে দেখে গেছে। ছেলেদের ডাক। দেবুর ঘরকন্না দেখ কেমন সাজিয়ে দিয়েছি, এইবার একটা বৌ হলেই হয়। দেবুর বাপ তো তখন পাগল হয়ে গিয়েছিল বিয়ে দেবার জন্যে। এইবার দিক। মেয়ে একটি আমি দেখে রেখেছি। তবে খুব বড়লোকের মেয়ে, দেবে কিনা জানিনা।

মিনুর বুক ভেঙে আস্ছিল। দিদির সঙ্গে সে এসেছে দেবুকে নিয়ে ঝগড়া করতে। তার স্নেহশীলা দিদি। কিন্তু দয়াময় ছেলের দিব্বি দিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে এখানে। বলেছে, গিয়েই চিনুর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করে নেবে। হয় চিনু দেবুকে নিয়ে থাকবে সেখানে, না হয় দয়াময় মিনু থাকবে। শিবু আর ভুতুকেও আগ্‌লে নিয়ে বসে আছে বাইরের ঘরে। এ বাড়ির সবকিছু তার পরিচিত। এক রাত্রি বাস করে গেছে এখানে।

মিনু বসে না। সে দাঁড়িয়ে থেকেই কণ্ঠকে যথাসাধ্য কর্কশ করে বলে ঃ তোকে অতশত দেখতে হবে না দিদি, যার ছেলে সেই দেখবে।

চিনুর রাগ হয়। সে বলে ঃ থাম্, থাম্, ওসব কথা বলে আমাকে রাগিয়ে দিসনে মিনু। যার ছেলে সে তো খুব দেখেছে। আ, কি দেখবার মানুষটা! ওকে কিছু দেখতে হবে না। সেই এতোটুকু থেকে যে ওকে দেখেছে সেই দেখবে। ওর বাপ যা চায়, তাই পাবে। বিয়েতে পণের টাকাটা বাপ সেজে গুণে গেঁথে পকেটে 'পুরে নিয়ে চলে যাবে। টাকাকড়ি আমি চাই না।

—আচ্ছা দিদি, তুই বিধবা মানুষ, তোর এতো শখ কেন বলতে পারিস?

—কিসের শখ?

—বুঝতে পারছিস্ না, কিসের শখ? পরের ছেলে নিয়ে ঘর করবার শখ?

—পরের ছেলে! মিনু, এ তুই কি বললি রে? এই কথা বলতে তুই এসেছিস্? এই ঝগড়ার কথাই বলছিলি?

—হ্যাঁ, এই ঝগড়াই করতে এসেছি।

—ঠিক বলেছিস্ মিনু, নিজের নয় যখন, তখন নিশ্চয়ই পরের। পরের ছেলে নিয়ে ঘর করবার শখ আমার থাকা উচিত নয়।

—আর ঐ নিমকহারাম বাপের ছেলে ঠিক দেখবি ওই নিমকহারাম বাপের মতো হবে। ও কখনো তোকে সুখে রাখবে না।

—আমাকে সুখে রাখতে হবে না মিনু। ও নিজে সুখে থাক। তাহলেই আমার সুখ। কিন্তু হাঁ রে মিনু, তোর ছেলেকে নিয়ে ঘর আমি করলাম কখন? এই তো সবে ঘর পেতেছি রে। এখনও তো ঠিক ঠিক ওর রোজগারের ভাত আমি খাইনি।

—ওসব কথা আমি শুনতে চাই না দিদি, যার ছেলে তাকে তার ছেলে ফিরিয়ে দে।

—আমি তো তোর স্বামীর ছেলেকে ধরে রাখিনি মিনু, ধরে আমি কোনদিনই রাখব না। জোর করে পয়সা কড়ি হয়তো আদায় করা যায়। স্নেহ-ভালবাসা আদায় করা যায় না তা' আমি জানি। ভালো করলি মিনু, শুরুতেই বুঝিয়ে দিলি তুই আমাকে।

—হ্যাঁ, এবার যার ছেলে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমার বাবা তোকে যা দিয়েছে তাই নিয়েই তুই বাসুদেবপুরেই থাকগে যা।

—বাবা যা দিয়েছে তাও আমি তোর ওই ছেলেকেই দিয়ে দিয়েছি।

—দিয়েছিস্ দিয়েছিস্। তুই যতদিন বাঁচবি ততোদিন তোর ও জমিতে কেউ হাত দিতে যাবে না।

—যতোদিন বাঁচবো! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। কিন্তু বেঁচে থেকেও যে মানুষ মরে, সে খবর তুই জানিস্ না মিনু। জানলে একথা বলতিস্ না। ভালই হল, দেবু এখানে নেই। এখনি চলে যাওয়া ভালো। এসে যদি তার বড়মার খোঁজ করে তো বলিস্, সে চলে গেছে। বলিস্ সে মরে গেছে।

ঝর্ ঝর্ করে চোখের জল পড়তে লাগল চিনুর। মিনু তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারছিল না। সে ডাকাতি করতে এসেছে। তারই সহোদর বোনের ঘরে চুরি কবতে এসে অত্যন্ত জঘন্যভাবে ধরা পড়ে গেছে। চাইবে কি করে ওই মহীয়সী নারীর চোখের দিকে চোখ তুলে?

চিনু পরনের থানখানা ভাল করে পরে নিল। তার নিজেরই একখানা চাদর ছিল, সেখানা গায়ে দিল। বাক্স খুলে একটা টাকা গাঁটে বেঁধে চাবিটা মিনুর হাতে দিয়ে বলল ঃ এই নে মিনু।

মিনু এবার যেন আর্তনাদ করে উঠল ঃ দিদি! তুই কি এখনই চলে যাচ্ছিস?

চোখের জল মুছে ফেলেছে চিনু। সে বলল শান্ত কণ্ঠে ঃ হ্যাঁ, এখনই যাওয়া ভালো। আর দেরি হলে বাধা হতে পারে। যেতে হয়তো পারব না।

মিনু বলল ঃ তা'বলে তুই এক কাপড়ে চলে যাবি?

ঃ আমার কাপড় সেখানে আছে। উত্তর দিল চিনু ঃ তোর ছেলের পয়সায় কেনা

একখানা কাপড় রেখে গেলাম এইখানে। ও আর আমাকে নিয়ে যেতে বলিস্ না। আমি চল্‌লুম।

খেয়ে যাওয়ার কথা বলল মিনু। চিনু বলল ঃ তোর ছেলের ভাত আর আমাকে খেতে বলিস্‌নে। আমার জন্যে ভাবিস্‌নে, আমি বেশ থাকবো।

চীৎকার করে উঠল মিনু। তার অন্তরের কথা যেন আর চেপে রাখতে পারছে না। আহত আত্মা ভেতরে থেকে মাথা কুটে মরছে। তবু তাকে টুটি চেপে ধরে রাখতে হবে। নিষ্ঠুর অমানুষ স্বামীর দিব্বি। চীৎকার করে বলল মিনু ঃ তোর জন্যে ভাবতে আমার বয়ে গেছে দিদি। আমি ভাবছি নিজের জন্যে। ভাবছি, তোর ছেড়ে-যাওয়া সংসারটাকে গুছাব কি করে।

চিনু চলে যায়। এবার ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল দয়াময়। যাচ্ছে তো, ছেলেটাও বাড়িতে নেই। টাকা পয়সা কি রেখে যাচ্ছে, না নিয়েই সটান চলে যাচ্ছে। তাহলে দেবু ফিরে আসা পর্যন্ত কি গাঁটের টাকা ভেঙে খেতে হবে?

মিনুকে উদ্দেশ্য করে বল দয়াময় ঃ তোমার দিদি তো চললেন। তা' বাড়িতে টাকা পয়সা কিছু—

চিনু যেতে যেতে না-ফিরেই বলল ঃ পনের টাকা ছিল মিনু, মাত্র একটি টাকা আমি নিলাম। বাকি চৌদ্দ টাকা বাক্সে আছে। গুণে নে।

চলে গেল চিনু।

দয়াময় বাইরের ঘর থেকে নিয়ে এল শিবু আর ভুতুকে। এবার তারা নিরাপদ!

ভুতু জিজ্ঞাসা করল ঃ মাসি চলে গেল বাবা?

দয়াময় উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ, গেলই তো। দেখলি না?

শিবু বলল ঃ মা বুঝি তাকে তাড়িয়ে দিল?

দয়াময় নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল ঃ তা বোধ হয় তাড়ালই। জানিস্ উড়ে এসে জুড়ে বসলে এমনি যেতে হয়। এবার যা। তোদের দাদার বাসা—দাদা এলে দেখবি, সে সাহেব হয়েছে। পোযাকের কি বাহার! তোদেরও ওরকম পোযাক ক'রে দিতে বলব। এবার চারদিকে ঘুরে ফিরে সব দেখে নে।

ভুতু আর শিবু ধরে বসল বাবাকে, তারা চুপ করে বসে থাকলে পয়সা দিতে বলেছিল বাবা। দিয়ে দিক এবার।

দয়ামায় বলল ঃ সে হবে, হবে।

ভুতু বলে ঃ হবে টবে বুঝি না। তোমার কথার কোন ঠিক নেই। হাতে হাতে এখনই দিয়ে দাও।

কিছুতেই তাদের শান্ত করতে পারে না দয়াময়। তারা তার জামা ধরে ঝুলোঝুলি করতে লাগল। বাধ্য হল দয়াময় একটা করে আনি দিলে ওদের।

শিবু বলল ঃ বড়ো কম দিলে বাবা, ঠকালে। আচ্ছা, আয় ভুতু।

দয়াময় হৃষ্ট মনে এবার ঘরের ভেতর গিয়ে প্রবেশ করল, মিনুকে অভিনন্দন জানাতে। গিয়ে দেখল, মিনু আহতের মতো মেঝেতে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে, আর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদছে।

বোকা! মিনুটা বোকা। মনে মনে বলল দয়াময়।

॥ তেইশ ॥

দেবু হাজারীবাগ থেকে ফিরে এসে দেখে বড়মা তার বাড়ি নেই, চলে গেছে।

রাতের বেলা ফিরেছিল সে রাণীগঞ্জে। বাড়িতে এসে কড়া নাড়তেই দোর খুলে দিল ভুতু। আঁধারে বুঝতে পারলে না দেবু, ও কে হতে পারে। সে প্রশ্ন করল ঃ কে রে তুই?

ভুতু উত্তর দিল ঃ আমি।

ঃ আমি কে? দোরে খিল আঁটতে আঁটতে প্রশ্ন করল দেবু।

ভুতু উচ্চকণ্ঠে মাকে ডেকে বলল ঃ মা, দাদা আমাকে চিনতে পারছে না।

ভেতরে এগিয়ে এলো দেবু। এবার সে ভুতুকে চিনতে পারছে।

প্রশ্ন করে সে ঃ মাও এসেছে? বাবা বুঝি নিয়ে এলো?

মাকে প্রণাম করল দেবু। কিন্তু বড়মা গেল কোথায়? তাঁরই তো সর্বাগ্রে বেরিয়ে এসে সানন্দে জানাবার কথা, দ্যাখ, তোর মা এসেছে, মিনু এসেছে।

কেউ কিছু বলবার আগেই এ-ঘর ও-ঘর খোঁজে দেবু। ডাকে, বড়মা, ও বড়মা। বড়মাকে জানাতে হবে, কেন দেরি হয়ে গেল হাজারীবাগে।

মিনু না জানিয়ে পারে না দেবুকে। শুষ্ক কণ্ঠে সে বলে ঃ বড়মা তোর চলে গেছে।

চলে গেছে? কোথায় গেল? কেন গেল?

মিনু জবাব দিতে পারে না। কি দেবে সে জবাব!

কিন্তু দয়াময় জবাব দেয়। সে এবার দেবুকে শান্ত করবার ভার নেবে। মিনু চিনুকে তাড়াবার বেলা তার ভূমিকায় বেশ কৃতিত্বই দেখিয়েছে। এবার তার পালা। দক্ষ অভিনেতার মতো তাকে অভিনয় করতে হবে।

দয়াময় বলে ঃ কোথায় গেছে সে কি আর বলে গেছে বাবা? আমাদের এখানে আসতে দেখেই ওর মাথাটা বোধ করি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে তোমাকে অমন করে দোষ দিতে থাকবে কেন? যাক্। গেছে, আবার আসবে। তুমি জামা-কাপড় ছাড়ো। হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হও। চা-টা খাও। তারপর সব কথা শুনবে বই কি?

দয়াময় ব্যস্ততা দেখায়। বাইরে থেকে এলো ছেলে, তাকে খাবার-টাবার দিতে হবে না? মিনুটা যে কি!

দেবু চা খাবে না। কিছুই খাবে না।

—আরে, খাবে না কেন? মন কেমন করছে বড়মার জন্যে। তা তো করবেই। এতো কাল একসঙ্গে রইলো। এতো আদর-যত্ন করল! কিন্তু তা'ও তো বলতে বাধা নেই, বড়মা কারো চিরদিনের জন্যে থাকে না। বড়মা আজ যদি তার দেবুর ওপর রাগ করে চলেই যায়, তাহলে কি দেবুকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হবে তার রাগ ভাঙাতে? এটাও তো দেখতে হবে যে রাগটা কেন হ'ল? দেবু একদিন তার বাবাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলো। সেবা যত্ন করল। বাবাকে টাকা দিল। তারপর আবার দেখা গেল সেই বাবাই সবাইকে নিয়ে এসে হাজির। তাহলে তাকে না-জানিয়েই বাপ-ব্যাটায় পরামর্শ করে এ ব্যবস্থা করেছে। তাই রাগ। রাগ তো রাগ, একেবারে—

বাবার এসব কথা সইতে পারে না দেবু। সে এখন ভালো করেই জানে তার বাবাকে। সে চীৎকার করে উঠে ঃ বাবা!

দয়াময় হকচকিয়ে উঠে বলে ঃ কি?

দেবু বলে ঃ বলতে হবে না কিছু, আমি জানি।

দয়াময় মাথা নাড়ে ঃ না, না, বাবা জানো না। শোন।

বলতে থাকে দয়াময় ঃ তোমার বড়মা কি করলে শোন। সে না-খেয়েই চলে যাচ্ছিল। তোমার মা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে বললে, না খেয়ে তোকে আমি যেতে দেব না দিদি, তা'তে আমার ছেলেদের অকল্যাণ হবে। তা' সে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বললে, খবরদার বলছি, দেবুর ভাত আর আমাকে খেতে বলিস্‌নি মিনু। তার ভাত আমি যদি আর কোনদিন মুখে দিই তো—

অহস্য! এ নোংরামি।

দেবু বলে উঠে ঃ বাবা চুপ করুন।

সে গিয়ে নিজের ঘর প্রবেশ করে বাবার মুখের ওপর দোর বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু বড়মা তার ঘরে নেই। শুধু নেই নয়। সে প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে যে গরদের কাপড়খানা বড় সাধ করে এনে দিয়েছিল তাকে, সে সেখানাও ফেলে রেখে গেছে। কতো তীব্র অভিমানে যে এটা করেছে বড়মা, সেটা দেবু বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, তার বাবা তাকে এমন করে নানা কথা বলেছে যার তাপে সে পালিয়েছে। এরা এসে তাকে এখানে থাকতে দেয়নি।

কি অকৃতজ্ঞ এই সংসার! আজকার দেবু তো তার বড়মারই দান। সে তাকে ঘিরে ছিল বলেই তো সে এতোটুকু হতে পেরেছে। শান্তি নেই। স্বস্তি নেই দেবুর।

বাবা মা ভাইরা এসেছে এখানে। কোথায় তার আনন্দিত হবার কথা। বড়মা নেই, তাই আনন্দও নেই।

দেবুরও অভিমান হয়। বললই বা তাকে বাবা যা-খুশি, দেবু তো বলেনি? তবে কেন, দেবুকে একটা কথা না-বলেও এমন করে চলে গেল? কোনদিন কি দেবু তাকে কিছু বলেছে? তার কথার অবাধ্য হয়েছে? যাকে শিশুকাল থেকে মানুষ করে তোলা যায়, তাকে বুঝি এমনি করে ছেড়ে যাওয়া যায়? বাবাকে তো জানে বড়মা। তারই সম্মুখে বাবার মুখের ওপর কতো কথাই তো শুনিয়ে দিয়েছে। চিরকালই বাবার কথা সে গায়ে মাখেনি। তবে?

বিয়ে দেবার জন্যে মাকে দিয়ে মিথ্যে চিঠি লিখে যেদিন দেবুকে চাক্‌দা নিয়ে গিয়েছিল বাবা। সেদিন নিজে সেখানে গিয়ে তাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আসেনি মা? তবে, আজই বা কেন বলতে পারল না। দেবু আমার, তাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে যাব না?

না, সে যাবে না বড়মাকে ফিরিয়ে আনতে। সে দেখবে, দেবুকে ছেড়ে ক'দিন থাকতে পারে বড়মা। সে যদি বড়মাকে ভালবেসে থাকে তা'হলে তাকে একদিন ছুটে আসতেই হবে।

জামাইদা এক সময়ে 'পিসিমা, পিসিমা' ডেকে এসে উপস্থিত হয়। দেবু জানায় পিসিমা এখানে নেই, বাসুদেবপুরে গেছে। কবে ফিরে আসবে? দেবু ছিল না এখানে, বলে যায়নি। জামাই ভাবে পিসিমার মাথায় টাকা সংগ্রহের নেশা রয়েছে, দেবুকে কলেজে পড়াবার টাকা।

বাড়িতে নতুন নতুন মুখ দেখতে পায় জামাই। দেবু পরিচয় করিয়ে দেয়। বিস্মিত হয়ে দেখে জামাই, এমনি একটি লোক—এই দেবুর বাবার মতোই একজন এক সন্ধ্যায় তার কাছে কন্যাদায়ের আবেদন জানিয়ে দু'টাকা আদায় করেছিল। দেবুও সেখানে ছিল সেদিন। রহস্যজনক ব্যাপার দেবুর কাছে। দয়াময়ও চিনতে পারে জামাইকে। কিন্তু সে নির্বিকার, উদাসীন। একটুও বিচলিত হয় না।

জামাই প্রণাম করে দেবুর বাবা-মাকে। তারপর জানতে চায় তার হাজারিবাগের অভিজ্ঞতা। ভালো করে কিছুই বলতে পারে না দেবু। মনে তার উৎসাহ নেই, কণ্ঠে যেন ভাষা নেই। জামাই হেসে ওঠে ঃ পিসিমা না থাকলেই তুমি যেন নেতিয়ে পড় দেবু। লক্ষণ ভাল নয়। চিরদিন কি মায়ের অঞ্চলনিধি হয়ে থাকা যায়। আসুন তিনি, সব বলব। ছেলেটিকে বলো, যেন এতো ন্যাওটা হয়ে না থাকে।

জানে না, কিছুই জানে না জামাই।

মিনু লক্ষ্য করে, দিন দিন দেবু যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে। আপিসে যায়, কাজ করে কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন। শিউরে উঠে সে।

দয়াময় বলে ঃ সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করো না। সে আমি দেখবো। আমারই তো ছেলে।

।। চব্বিশ ।।

চিনুর দিন যে কি করে কাট্‌ছে! একদিন বাসুদেবপুরের ছোট্ট বাড়িটা তার কাছে ছিল স্বর্গ। দেবুকে নিয়ে থাকতো সে সেখানে। এখন? দেবু নেই। শুধু নেই নয়, দেবুকে সে ত্যাগ করে এসেছে। মিনুকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে তার ছেলে। আবার সে একাকী। স্বামী তাকে একাই একদিন ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। সংসার বলে তার জন্যে কিছুই রেখে যাননি। সে নিজেই দেবুকে নিয়ে সংসার গড়তে চেয়েছিল। তাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

বাসুদেবপুরের এই ছোট বাড়িটি আজ চিনুর কাছে যন্ত্রণাগার।

সেদিন সন্ধ্যার পর নিশুর কথকতার আসর বসেছিল।

নিশু রাজা ভরতের উপাখ্যান বলছিল। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে গানও যোগ করছিল। কথা আর গান। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে শুনছিল সবাই। চিনুও সেখানে বসেছিল।

নিশু বলছিল—বন্যার জলে ভেসে-আসা নিরাশ্রয় মৃগশিশুকে আশ্রয় দিলেন রাজা ভরত। তারপর সেই তৃণ-সমাচ্ছন্ন পুষ্পিত কাননে মনের আনন্দে বিচরণ করতে লাগল সেই মৃগশাবক। ভরত একাগ্র মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকেন সেই দিকে, বড় ভাল লাগে তার। হৃদয় ভরে উঠে আনন্দে। ভরত তাঁর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা উজাড় করে ঢেলে দিলেন সেইখানে, মমতার বন্ধনে জড়িয়ে ফেললেন সেই মৃগশিশুকে। সেই মৃগশিশুও তাকে জড়াল। আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। স্নেহবন্ধন জর্জরিত ভরতের পূজা গেল, অর্চনা গেল, উপাসনা গেল, মন্ত্রপাঠ হোমযজ্ঞ সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি সেই দুরন্ত চঞ্চল মৃগশিশুর আগমন প্রতীক্ষায় বসে থাকেন—বেলা বেড়ে যায়, প্রভাত সূর্য উঠে মধ্যাহ্ন গগনে। মনের আনন্দে শিশু তখন বনমধ্যে প্রবেশ করেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে দিক্‌ভ্রান্ত মৃগশাবক পথ খুঁজে পাচ্ছে না, এদিকে ভরত ডাকছেন—ওরে, এই যে আমি এখানে, তুই ফিরে আয়, ফিরে আয়—

নিশু এখানে গান ধরে, "ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয়।"

আবার বলতে থাকে ঃ ফিরে এলো। নাচতে নাচতে চঞ্চল শিশু দুরন্ত শাবক ফিরে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়ল ভরতের উৎকণ্ঠিত বক্ষের ওপর। ভরতের চোখের জল শুকিয়ে গেল। ভরত বললেন ঃ আর আমি তোকে যেতে দেব না। বাঁধলেন তাকে আরো সুদৃঢ় স্নেহের বন্ধনে। ভাবলেন এ বন্ধন ছিন্ন করবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু তাও একদিন ছিন্ন হয়ে গেল। মৃগশাবক শৈশব অতিক্রম করে পরিণত-বয়স্ক হয়ে উঠল। তারপর বনের পশু একদিন বনে চলে গেল। চলে গেল হয়তো বা

চিরদিনের জন্য। আর ফিরে এলো না। এদিকে চলতে লাগল অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত আহ্বান! ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়!

আবার ভরতের সবকিছু গেল। জপ গেল, তপ গেল, পূজা গেল, পাঠ গেল, ধ্যান-ধারণা ব্রত-অনুষ্ঠান সবকিছু হয়ে গেল সেই প্রতীক্ষারত হৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বান—ফিরে আয়, ফিরে আয়! ফিরে আর এলো না, যে যায়, সে বুঝি আর ফেরে না।

কিন্তু সে সব—সবই পারে। তার তরুণ জীবন, তার অক্লান্ত উদ্যম, চোখের সমুখে তার প্রত্যাশা-সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তার সঙ্গী আছে, সাথী আছে, দুর্বার কামনা-পূরণের অফুরন্ত উৎস আছে। আর এই আশাহত, ব্যথাদীর্ণ আসন্ন নির্বাপিত দীপশিখার মতো বিগত পরমায়ু বৃদ্ধ ভরত! সান্ত্বনাহীন, শান্তিহীন জীবনের শুধু বেদনাবিদ্ধ হাহাকার—ওরে, ফিরে আয়, ফিরে আয়!

আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রী ভরত—মুখে এক ফোঁটা জল দেবার মানুষ নেই, নিঃসঙ্গ একাকী। দুই চোখে অশ্রুর ধারা। স্বর্গ চাই না, সান্ত্বনা চাই না, অনাগত আগামী জীবনের নবসূর্যোদয়—সব ব্যর্থ হোক। অনন্ত অন্ধকারময় মহাশূন্যে সব বিলীন হয়ে যাক্—ক্ষীণ দীপালোকের মতো শুধু তার এতোটুকু আশা—যদি তার আজীবনের সাথী স্নেহভালবাসার ধন একটিবার ফিরে আসে! ওরে আয়, ফিরে আয়!

স্তিমিতদীপ অন্ধকার বিদীর্ণ করে যদি ফুটে ওঠে আশার আলো। মৃত্যুর শিয়রে জীবনের মতো একটিবার যদি এসে দাঁড়ায়। ওরে আমার নীলকান্তমণি! ওরে মাণিক, ওরে সোণা, ফিরে আয়, ফিরে আয়!"

আর সহ্য করতে পারে না চিনু। আত্মসম্বরণ করতে পারে না সে।

সে সেখান থেকে ছুটে আসে নিজের বাড়িতে। ওরে মাণিক, ওরে আমার সোনা!

সে আছাড় খেয়ে পড়ে বিছানার ওপর।

তার হৃদয়ের অবরুদ্ধ বেদনা দু'চোখ দিয়ে সহস্রধারায় ঝরে পড়ে অঙ্গে উচ্ছ্বসিত বন্যাবেগ সৃষ্টি করে। সংযমের বাধা আর মানতে চায় না।

তার অন্তরও যেন আকুল কণ্ঠে ডাকছেঃ একবার, শুধু একবার আয় তুই।

ডাক বুঝি শুনতে পায় সে, অথবা অন্তর্যামী তার আকুল আবেদনে সাড়া দেন। চিনু শোনে, দেবু ডাক্‌ছে, বড়মা, বড়মা বলে।

সত্যি কি দেবু? অথবা যে ডাক অহরহ তার অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে এ তারই প্রতিধ্বনি?

অশ্রুতে ঝাপ্‌সা চোখ দু'টি মেলে ধরে চিনু। তাই তো! দেবুই তো এসেছে। দেবু আবার ডাকে বড়মা, বড়মা।

চিনু তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে।

মায়ে ছেলেতে যেন দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলন।

দেবু জিজ্ঞাসা করে, আমাকে ছেড়ে তুমি কেন চলে এলে বড়মা?

চিনু বলেঃ নারে, ছেড়ে আসব কেন? আমি যে সব সময়ে তোর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। তোকে ঘিরে রয়েছি।

অভিমান ভরে বলে দেবুঃ এসব কথায় আমি ভুলব না বড়মা। চল, রাণীগঞ্জে ফিরে চল।

না, সে হয় না রে। বলে চিনুঃ একদিন তোর মা আমাকে তোকে তুলে দিয়েছিল। আবার সে তোকে ফিরে চেয়েছে, তাই আমি তোকে তার হাত ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি। তোর বাবা তোকে চায়। চাইবেই তো, তুই তো তাদের ছেলে।

দেবু বলেঃ এসব আমি জানি না, বুঝি না বড়মা। তুমি ফিরে চল।

—সে হয় না দেবুঃ সে হয় না।

ঃ তাহলে—দেবু বলে ; আমি তা'হলে এখানে, এই বাসুদেবপুরেই থাকব।

ঃ না, না, না। বলে উঠে চিনুঃ তুই রাণীগঞ্জে ফিরে ষা, ফিরে যা দেবু। মাঝে মাঝে আমাকে ভাল আছিস্ বলে খবর দিস্, তা'তেই আমি খুশি থাকব। যা' ফিরে যা। এখান থেকে ফিরে গিয়েই আমাকে চিঠি লিখিস্। কেমন?

কিছুতেই মানবে না চিনু। দেবু উঠে দাঁড়ায়। তারপর এক সময় দৌড়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

চিনু কেঁপে ওঠে, মনে হয়, না এসে ভাল করেনি। তার দেবু ফিরে এসেছিল, সে তাকে ফিরিয়ে দিল। কিন্তু না। সে শুধু কম্পিত জীর্ণ কণ্ঠে বলেঃ তোর চিঠির জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করব দেবু। আস্তে আস্তে আপন মনে বলে, এ নিয়েই আমি বেঁচে থাকব।

নিশুর বাড়িতে তখনও চলছে কথকতা। ভরত তখনও আর্তকণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেনঃ ফিরে আয়, ওরে মৃগশিশু ফিরে আয়। আশ্রমের গৃহে গৃহে অরণ্যের বৃক্ষে বৃক্ষে তার প্রতিধ্বনি উঠছেঃ ফিরে আয়, ফিরে আয়।

চিনু এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এক টুক্‌রো ম্লান হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। সে মনে মনে বলেঃ তার মৃগশিশু ডাক শুনেছিল, সে ফিরে এসেছিল, কিন্তু সে-ই তাকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, তুই যাদের তাদের কাছেই ফিরে যা। ফিরে যা' তোর বনের পরিবেশে।

সে দুর্বল নয়, ভরতের মতো দুর্বল নয়।

দেবু তখন বাসুদেবপুরের পথ দিয়ে চলছে। আঁধারে সে ছুটে যাচ্ছে। কি করবে, কোথায় যাবে সে জানে না। কি করবে এবার?

বড়মা তার ফিরে এলো না। বাসুদেবপুরেও ঠাঁই হ'লো না।

তুমি মাথায় থাকো বড়মা। তোমার সাধ আমি পূর্ণ করব। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই আমি আরো পড়ব, পাশ করার পর আমি বড় হবো।

॥ পঁচিশ ॥

রাণীগঞ্জে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে মিনু। দেবু যে অপিসে বেরিয়ে গেল, আর ক'দিন ধরে ফিরে আসে না। কোথায় গেল সে?

দয়াময় বড় ভাবে না।

মিনু বলে ঃ আর কতো কষ্ট তুমি আমাকে দেবে, বলতে পার?

দয়াময় বসে বসে হুঁকো টানছিল। মুখ খিঁচিয়ে উত্তর দেয় ঃ এতো দিনেও ভুলতে পারলে না? দিদির জন্যে শোক একেবারে উথলে উঠল দেখ্‌ছি।

—না, না, দিদির জন্যে নয়। ছেলেটা কাউকে কিছু না বলে সেই যে গেল, আজ চার পাঁচ দিন কোথায় গেছে, কি করছে একবার খোঁজও তো নিলে না।

—থামো, আর চেঁচিও না। দেখো গে, সে চিনুর কাছে গিয়ে বসে আছে। আবার চিনুকে সঙ্গে নিয়েই না ফিরে আসে। তোমার ঐ দিদিটি কি সহজে ছাড়বে? যতোদিন বাঁচবে, ততোদিন জ্বালাবে। ছেলেকে নিয়ে যে দু'দিন সুখশান্তিতে বাস করব, তা' সে দেবে না কিছুতেই। মর্ না বাবা, তুই তো এবার এগুলেই পারিস। পরের ছেলে নিয়ে তো টানাটানি অনেক দিনই করছিস, আর কেন?

—আঃ, মুখের কি তোমার কোন বাঁধন নেই? ও কথাগুলো আর আমার সামনে বলো না।

—না, বলবে না! দিদিটি তোমার ডাকিনী মন্ত্র জানে। দেবুর মাথাটি একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে। সেদিন চিনুর কথা বলতে গেলাম তো দেবু কি রকম চেঁচিয়ে আমাকে ধমকে উঠল শুনলে না? দেখলে না মুখের ওপর ধড়াস্ করে দরজাটা কি রকম বন্ধ করে দিলে! রোজগেরে ছেলে—মাথার ওপর জুতো মারলেও বলতে হবে 'মার বাবা আরও মার।' কিন্তু বাপের সঙ্গে এমনি ধারা ব্যাভারটা সে শিখলে কোথায়? চিনুর কাছেই তো!

—বেশ তো, এবার পেয়েছ তো ছেলেকে। বাপ তুমি, ভালো ব্যাভার শেখাও।

বাইরে দোরের কাছে এসে ডাকছিল জামাই ঃ ও পিসিমা, দেবু!

দয়াময়ই বেরিয়ে গেল দোর খুলে। জামাই দেখল সেই লোক।

জামাই বলল ঃ আপনি! ওই কি বলেছিল, দেবুর বাবা! তা' ওরা কোথায়? দেবু, দেবুর বড়মা?

দয়াময় বলেঃ দেবুর বড়মা তো আর ফিরে আসেননি, এবার দেবুও যে না বলে কয়ে কোথায় গেল। তার আজ কালই বোধহয় আসবে।

জামাই যেন ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারে। না, একটা কিছু গুরুতর ঘটেছে। দেবু তাকে সব গোপন করেছে। অথবা তাকে যদি সে জানাতো! আরে লজ্জার কি ছিল। তার বাবা যে কি পদার্থ সে তো জেনেই ফেলেছে জামাই। আজ কাল ফিরে আসছে দেবু? জামাইর তা' মনে হয় না। মেটা সাহেবকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে সে চাকরিটা ছেড়ে দেবে বলে, কাজ থেকেও অনুপস্থিত হতে আরম্ভ করেছে।

চাকরি ছেড়ে দেবে বলে টেলিগ্রাম করেছে? সংবাদটা শুনেই লাফিয়ে উঠল দয়াময়ঃ কি বলছো বাবা, এ চাকরিটি দেবু ছেড়ে দিচ্ছে?

জামাই চিন্তিত কণ্ঠে উত্তর দেয়ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, মেটা সাহেব টেলিগ্রাম করে আমাকে সেই কথা জানিয়েছেন। আমিই চাকরিটি করে দিয়েছিলাম। আমাকে কিছু না জানিয়ে একেবারে হট্ করে চাকরিটা ছেড়ে দিলে! ছি, ছি, ছি! এ বাজারে এমনি একটা চাকরি পাওয়া মুখের কথা কি না!

ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে দয়াময়ের।

—তাহলে কি হবে বাবা? এ যে একেবারে মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি করে দিলে। আমি ওর বাবা। আমাকে তাহলে নিয়ে চল, ওই যে কি নাম বললে, ওই সাহেবের কাছে। আমি গিয়ে হাতে পায়ে ধরি। তারপর যাই চল বাসুদেবপুরে। সেখান থেকে কানে ধরে ছোঁড়াটাকে ছিঁছড়ে টেনে নিয়ে আসি।

—থামুন, থামুন আপনি অত ছট্‌ফট্ করবেন না।

—ওরে বাবারে, আমি ছট্‌ফট্ করছি সাধে? সংসারটি যে অচল হয়ে যাবে বাবা। তাহলে কি হবে বাবা! আমি যাব তোমার সঙ্গে?

—আজ্ঞে না। দেবু যে কেন এমন করলে কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখি ব্যাপার কি! বাসুদেবপুরে একবার যাই।

এবার দয়াময়ের নতুন রূপ। সে নতুন সুরে কথা বলছে।

—তাই যাও বাবা। চিনু বড় ভাল মেয়ে। চিনুকে বলো আমি তার জন্যে খুব ভাবছি। চিনু আমাদের দুঃখ বুঝতে পারবে। চিনু বড় ভালো মেয়ে, বড় ভালো মেয়ে।

মোটর সাইকেলে চড়ে চলে গেল জামাই। দয়াময় সদরে খিলটি দিয়েই চীৎকার করে মিনুকে ডাকলঃ ওগো শুনছ? ও দেবুর মা!

মিনু আসতেই তার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠুকতে আরম্ভ করে দিল দয়াময়ঃ এই তোমার পায়ে পেন্নাম আর তোমার দিদির পায়ে পেন্নাম্। তোমার দিদি, বিধবা ডাইনী দিদি, আমার কি সর্বনাশটাই যে করলে।

মিনু শুধু বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শুনে, দয়াময়ের বিকৃত মনের প্রলাপই তো! সে উন্মাদ হয়ে গেছে।

চিনু বেঁচে থাকতে দয়াময়ের দেবুকে দিয়ে আর কোন ভরসা নেই। ও ছেলের রোজগার সে একা একা খেতে চায়। সেই দেবুকে মন্ত্রণা দিয়ে চাকরি ছাড়িয়ে দিয়েছে। মিনু এখন বুঝুক, এখানে এই রাণীগঞ্জে কেমন করে থাকবে। দয়াময়ের কি! সে পথে বেরিয়ে পড়বে। দায়ের কথা জানিয়ে ভিক্ষে করে তার দিন চলে যাবে। এটা কি ধর্ম হল চিনুর! দেবধর্মে সইবে এ অন্যায়? আর ছেলেটাই বা কি! খুব শিক্ষা পেয়েছে। বাবার চেয়ে মাসি হল বড়? মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি? নিমকহারাম! নিমক-হারাম ছেলে।

কে যেন কড়া নাড়ে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দয়াময়। মিনুকে বলে, যাও দোর খুলে দাও। বোধ করি দেবুবাবু এলেন এবার। আমি যাচ্ছি নে। চিনুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে নির্ঘাত। ওই চিনুর মুখ আমি আর দেখব না।

দেবু আর চিনু নয়, আরো দু'খানা মুখ দোর দিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। শিবু আর ভুতু এসেছে। দশটা টাকা দিয়ে তাদের চাক্‌দা পাঠিয়েছিল দয়াময় ইস্কুল থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আস্‌তে। এখানে রাণীগঞ্জের ইস্কুলে তাদের ভর্তি করে দেবে। কিন্তু সার্টিফিকেট তারা পায়নি। সে না পাক। তারা এসেই বর্ণনা করতে লাগল চাক্‌দায় যে বাড়িতে তারা খেয়েছিল, সে বাড়িতে তাদের মাছ দেয়নি, ডিম দিয়েছিল একটুকুন করে। শিবু যদি বলে আস্ত দিয়েছিল তো ভুতু বলে না ভেঙে এক টুকরো। একজন বলে সার্টিফিকেট দিলেন না, বলে চার মাসের মাইনে বাকি। আর একজন বলে, আরে না, বলে ও নাকি পরীক্ষায় গোল্লা পেয়েছে। ভুতু বলে, শিবুর পিঠে বেত দিয়ে জোরে মেরেছে। শিবু বলে, মিথ্যুকে কোথাকার, জোরে মারেনি, আস্তে আস্তে মেরেছে।

দয়াময় শুনে আর চেয়ে চেয়ে দেখে ওদের। ভাবে, দেবুটা তো গেছে। এরা তাদের ভবিষ্যৎটা কি রকম গড়ে তুলবে!

একসময়ে দশটি টাকা ফেরৎ চায় দয়াময়।

ওরা বলে, তা দেবে। তবে ভাড়া না দিলেও সে টাকা দিয়ে তারা সিঙ্গাড়া মিষ্টি খেয়েছে।

মনে হয় যেন উৎসাহিত হয়ে উঠছে দয়াময়ঃ ভাড়া দিস্‌নি?

ভুতু বলেঃ টিকিট একদম করিনি। এইটে মস্ত বড় ইস্টিশান তো। ধরতে এসেছিল টিকিট, টিকিট বলে। ব্যাস্‌ দে ছুট।

দয়াময় মাথা নেড়ে উপদেশ দেয় ছেলেদেরঃ না, না, ছুট্‌তে নেই, ছুটতে নেই। ছুটলে সন্দেহ করে। গাড়ি থেকে টুক্‌ করে নেমে পড়। ব্যাস, গম্ভীর ভাবে এদিক ওদিক পায়চারি করতে থাকে। হাতে তো কিছুই নেই? টিকিট! টিকিট! টিকিট

কিসের? আমরা ইস্কুলের ছেলে। এই ট্রেনে আমাদের বাবার আসবার কথা আছে। আমরা তাই দেখতে এসেছি।

দয়াময় দেবুর কথা ভুলে গেছে। তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের ট্রেনিং দিতে আরম্ভ করেছে। এমন সময় আবার কে দোরের কড়া নাড়ল। তবে কি এবার দেবুই এসেছে?

না, এবার ও দেবু আসেনি, এসেছে একা চিনু।

মিনু দিদিকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে। তাকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলতে থাকে। চিনুর চোখও শুষ্ক থাকে না। কিন্তু দেবু কোথায়? চিনুর কণ্ঠে ব্যাকুলতা। পাঁচদিন হল ছেলেটা তার কাছে গিয়েছিল। কিন্তু সে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তার খবর না নিয়ে চিনু আর থাকতে পারেনি। তাই নিজেই ছুটে এসেছে।

কিন্তু দেবু যে সেই গেল, আর তো এখানে ও ফিরে আসেনি? মিনুও তো উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্যে। তার জামাইদা এসেছিল, সে জানিয়ে গেল, দেবু 'তার' করে চাক্‌রি ছেড়ে দিয়েছে। জামাই তো মোটর সাইকেল নিয়ে চিনুর ওখানে ছুটে গেল দেবুর খবরে।

চিনুর ওখানে দেবুর খবর! সে তো তাকে আমল দেয়নি। তাকে থাকতে দেয়নি। এমন কি শুষ্ক মুখে গেল ছেলেটা, তাকে কিছু মুখে দিতেও বলেনি। গেল কোথায় সে? তা' হলে তার বড়মার ওপর অভিমান করে কি সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? আর্তনাদকরে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে চিনুর। 'দেবু দেবু' করে পথে পথে ঘুরতে হবে তাকে। বলতে হবে হেঁকে হেঁকে, ওরে ছেলে, বড়মার ওপর অভিমান করে তুই দূরে সরে থাকিস্ নে।

ক্রমশ কিছুটা শান্ত হয় মিনু। জামাই, জামাইকে পেতে হবে। সে মিনুকে প্রশ্ন করেঃ জামাই বলেছে যে দেবু চাকরি ছেড়ে দিয়েছে?

দয়াময় আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সে সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

—আহা, তুমি কিছু জান না?

—না।

—তুমি যে না বলবে, তা আমি জানি। কিন্তু দেখো এই রকম করে ছেলেকে দিয়ে আমাকে অপমান করাটা তোমার ভালো হল না।

—তোমাকে আমি অপমান করলাম?

—না, খুব সম্মান করলে। বাপ না হয় গরীব ভিখিরি। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জন্যেই না হয় ছেলের কাছে এসেছিল, সেই ভিক্ষার ভাতে তুমি ধুলো দিয়ে দিলে। দেবুকে জবাব দেওয়ালে চাকরিতে। আমরা না হয় তোমার দু'চক্ষের বিষ, কিন্তু দেবুর কি ভালোটা করলে তুমি? এমন চাকরি আর পাবে সে? এইটে কি তোমার

উচিত হল? আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে, দেবুর ভবিষ্যৎ ফরসা করে দিলে। এটা কি তোমার ধর্মে সইবে?

চীৎকার করে উঠল চিনুঃ ওরে মিনু, ওকে চুপ করতে বল। ভেবেছিলাম তোদের এখানে আর আমি আসব না। কিন্তু থাকতে পারলাম না। হে ভগবান! পরের ছেলে কেউ যেন মানুষ না করে। মিনু, তোরা যা' ভাল বুঝবি করবি, আমি চললাম।

মিনু বলল ঃ এসেই এখন আবার কোথায় যাবি?

চিনু উত্তর দিল ঃ যেখানে খুশি সেইখানে যাব!

চলে গেল চিনু। মিনুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে জীবনে এই প্রথমবার দয়াময় চোখ ফেরালে।

॥ ছাব্বিশ

দেবু রাণীগঞ্জেই রয়েছে। সে জানে, সবাইকে বলাবলি করতে শুনেছে, সংবাদপত্রেও দেখেছে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুবার সময় হয়ে এসেছে। এই ফলের জন্যেই সে অপেক্ষা করছে।

ষ্টেশনে একখানি বেঞ্চিতে আরও অনেক অপেক্ষমান যাত্রীর সঙ্গে সে গাদাগাদি হয়ে বসেছিল। কলকাতার ডাক নিয়ে ট্রেন এসে থামল, সে চেয়ে দেখল। গাড়ির ব্র্যাকভান থেকে খবরের কাগজের বাণ্ডিলগুলো নামল। কারা আগেই বলাবলি করছিল, সেদিনকার কাগজেই পরীক্ষার ফল থাকবে। বুকটা তার দুরু দুরু করে উঠল। যদি তাই হয়? আস্তে আস্তে সে বেঞ্চি ছেড়ে উঠল। এগিয়ে যেতে লাগল কাগজের ষ্টলের দিকে।

ভীড় জমে গেছে ষ্টলের চারদিকে। পরীক্ষার ফল, পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে।

সেই ভীড়ে গিয়ে দেবুও নিজেকে মিশিয়ে দিল।

আনন্দবাজার! যুগান্তর! অমৃতবাজার! হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড!

একখানা 'আনন্দবাজার' কিনে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলো দেবু।

ফলেরা পৃষ্ঠা খুলে চোখকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ কি সত্যি! বার বার চোখ মুছল, আবার দেখল। অন্যান্য কাগজগুলি যারা কিনেছিল, তাদের কাগজেও চোখ বুলালো। সব কাগজেই এক। তাহলে ছাপার ভুল নয়।

আর শুধু তো রোল নাম্বার আর ডিভিসনই নয়। আলাদা এক জায়গায় বক্স করে পরীক্ষার সফল প্রথম দশজনের নামের তালিকায় তিন নম্বর নাম, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেবপুর স্কুল।

অধীর, উত্তেজিত হয়ে উঠল দেবু। তিন—তৃতীয় হয়েছে সে।

চীৎকার করে উঠল দেবু, বড়মা বড়মা গো!

সবাই চাইল তার দিকে। ছেলেটা কি পাগল?

পাগল বই কি? নইলে 'বড়মা' ডেকে ডেকে সে বাড়ির দিকেই ছুটবে কেন? সে আনন্দে ও উত্তেজনায় ভুলে গেছে বড়মা রাণীগঞ্জে নেই, সে চলে গেছে বাসুদেবপুরে।

পথ দিয়ে ছুটছে দেবু। কণ্ঠ তার শুষ্ক, ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ছুটছে আর মাঝে মাঝে বলছে, বড়মা! আমি তৃতীয় হয়ে পাশ করেছি।

ওদিকে আসানসোলেও কাগজ কিনে ফল দেখেছে অমলা। সেও প্রতীক্ষা করে ছিল, জানতো সেদিনই সম্ভবত ফল বেরুবে। রোল নাম্বার সে জানতো। কাগজখানা হাতে নিয়ে বাড়িতে এসেই সে দৌড়ে ওপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে অমলা। তথাপি ডাকছেঃ বাবা! বাবা!

অধর চাটুজ্যে জিজ্ঞাসা করলেন অধীরভাবেঃ কিরে, এমন করছিস্ কেন? হল কি?

অমলা বাবার সম্মুখে খবরের কাগজখানা মেলে ধরে বললেঃ এই দেখো বাবা, দেবুদা পাশ করেছে।

মুচকি হেসে বললেন চাটুজ্যেঃ পাশ করেছে? করবে আমি জানতাম।

অমলা বলেঃ শুধু পাশ করেনি বাবা, এবার যতো ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের মধ্যে দেবুদা থার্ড হয়েছে।

তৃপ্তির ও আত্মসন্তোষের হাসি হাসলেন অধর চাটুজ্যেঃ আমি এইটের জন্যেই শুধু অপেক্ষা করে বসেছিলাম। তোর মা আমার মনের কথা বুঝতে পারলে না তখন, 'দোকানে ঢোকালে দোকানে ঢোকালে বলে' দিলে ছেলেটাকে বিদেয় করে। কোথায় থাকে জানিস তো? রাণীগঞ্জে না।

অমলা আগ্রহভরে উত্তর দেয়ঃ হ্যাঁ বাবা, জানি।

চাটুজ্যে আদেশ করেনঃ গাড়ি বের করতে বল।

অমলা উৎসাহিত হয়ে ওঠেঃ এক্ষুণি বল্‌ছি বাবা।

বাসুদেবপুরও নীরব নয়। বাসুদেবপুরে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে আগের দিন অপরাহ্লেই। হেডমাষ্টার তার পেয়েছেন, তাঁর ইস্কুলের ছাত্র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষায় তৃতীয় হয়েছে।

হেডমাষ্টার স্বয়ং এসেছিলেন দেবুকে অভিনন্দন জানাতে, কিন্তু দেবু নেই বাসুদেবপুরে, তার মাসি চিন্ময়ী দেবীও নেই, তখন বিশু মুখুজ্যের খবর করলেন তিনি।

বিশু খবরটা শুনেই এমন উল্লসিত হয়ে উঠল যে, হেডমাষ্টার বিস্মিত হয়ে ভাবতে আরম্ভ করলেনঃ লোকটার কি মাথার ছিট্ আছে?

হেডমাষ্টার বললেন ঃ দেবু আমার স্কুলের, এ অঞ্চলের গৌরব।

বিশু উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠল ঃ আর মুখুজ্যে বংশ? আগে দেখুন কোন বাড়ির দৌহিত্র সে।

নিশুর কাছে ছুটে গেল বিশু।

ঃ শুনেছিস্, শুনেছিস্, দেবুটা কি কাণ্ড করে বসেছে?

নিশু হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করে ঃ দেবু আবার কি কাণ্ড করল?

ঃ বলিহারী বাবা চিনুর। যতোই রাগ অভিমান করি না কেন, মেয়ে বটে। আমার দুঃখ কি জানিস্, তুই আমাদের ছোট বোন, আমরা জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছি, কোন কিছুতে আমাদের পরামর্শ নিস্? না, কোনো দিন এসে বলেছিস্ যে, দেবুকে আমি পড়াব বড়দা, একটা ব্যবস্থা করে দাও? দেবুটাও, কি কোনদিন বলেছে যে, বড়মামা আমি পড়ব?

—কি হয়েছে, বলই না দাদা!

—হেডমাষ্টার, ইস্কুলের হেডমাষ্টার এসেছিলেন।

—তারপর? এখন তো আর ইস্কুলে যায় না দেবু, সে তো রাণীগঞ্জে।

—তাইতো এসেছিলেন। এসে বললেন, দেবু কোথায় চিন্ময়ীদেবী কোথায়?

—কেন, কি করেছে দেবু?

—সাংঘাতিক কাণ্ড করেছে। 'তারে' তিনি খবর পেয়েছেন, দেবু পরীক্ষায় পাশ করেছে।

—পাশ করেছে দেবু? সে আমি জানতাম।

—ছাই জানতে, কিছুই জানতে না। শুধু পাশই করেনি, হাজার হাজার ছেলের মধ্যে সে তৃতীয় হয়েছে।

—দাদা! চমৎকার! কি যে আনন্দ হচ্ছে।

বিশু এবার গম্ভীর হয়ে পড়ল। নিশুকে বলল ঃ থাম্ থাম্। আনন্দে এতো উতলা হয়ে উঠিস্নে। এখন, আরো পড়াতে হবে দেবুকে। চিনুটা কি না জায়গা জমি বিক্রি করে ফেলতে চায়। কেন? তাহলে আমরা মামারা রয়েছি কি জন্যে? কি বলিস্?

নিশু বলে ঃ ঠিক বলেছ দাদা, পড়াতেই হবে।

বিশু বলে ঃ হ্যাঁ, পড়াতেই হবে। কিন্তু বললেই তো হবে না। তৈরি হয়ে থাকিস, রাণীগঞ্জে কাল ভোরেই গিয়ে পৌঁছাতে হবে। নইলে চিনুটা আবার কি করে বসবে।

নিশু সানন্দে স্বীকৃতি দিল ঃ তাই যাব।

দেবু ছুট্ছে তো ছুট্ছেই। হঠাৎ তার মনে হল, তাইতো! বড়মাকে তো বাসাতে গিয়ে পাবে না? সে তো রয়েছে বাসুদেবপুরে। তাহলে? মনটা তার দমে যায়। কিন্তু সংবাদটা আগে বড়মাকেই দিতে হবে। তার পায়ের ধুলো নিয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হবে।

তাহলে জামাইদাকে গিয়ে ধরতে হবে। সে যদি তার মোটর সাইকেলে করে তাকে নিয়ে যায়? নিশ্চয়ই যাবে জামাইদা।

জামাই তখন কিন্তু ফিরে আসছে বাসুদেবপুর থেকেই। চিনুর বাড়ি বন্ধ। সে নেই সেখানে। রায়বাড়ির লোকই বলল।

দূরে থেকে দেখতে পেল দেবু, জামাই মোটর সাইকেলে করে তার বাসার দিকেই যাচ্ছে। পেছন পেছন দৌড়াতে লাগল দেবু আর ডাকতে লাগল ঃ জামাইদা, জামাইদা।

মোটর সাইকেলের শব্দে দেবুর ডাক ডুবে যায়। সহজে জামাইয়ের কানে পৌঁছায় না। কিন্তু এক সময়ে সে বুঝতে পারে, কে একজন তার পিছু পিছু ছুটছে আর তাকেই যেন ডাকছে। হ্যাঁ, তাকেই। আর এ তো দেবু, 'জামাইদা, জামাইদা' ডেকে দৌড়ে আসছে।

পথের পাশ ঘেঁসে মোটর সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জামাই। দেবু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তাকে আবেগভরে জড়িয়ে ধরে ঃ জামাইদা, জামাইদা!

জামাই বিস্মিত হয় দেবুর এই উচ্ছ্বাসে। আবার তাকে পেয়ে মনের ক্ষোভটাও প্রবল হয়ে ওঠে। বলে ঃ জামাইদা! খুব হয়েছে। তুই চাকরি ছাড়লি কেন বল।

দেবু বলল ঃ সে সব কথা পরে বলব জামাইদা, তুমি এই গাড়িতে করে আমাকে তাড়াতাড়ি বড়মার কাছে নিয়ে যেতে পার জামাইদা?

জামাই বলল ঃ তোর বড়মা নেই সেখানে। আমি এই সাইকেল নিয়েই তাঁর খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কি এমন হল? তবে যে টেলিগ্রাম করে মেটা সাহেবকে জানিয়ে দিলি তুই চাকরি করবিনে? আমি তোর চাকরি করে দিলাম, আর তুই কিনা আমাকে কিছু না জানিয়েই—

দেবু চেয়ে দেখল, বড়মা তার জামাই-এর বাড়ির দিক থেকেই আসছে। চিনু হয় তো জামাইর খোঁজেই তার বাড়ি গিয়েছিল।

দেবু চীৎকার করে উঠল ঃ এই তো বড়মা। বড়মা! বড়মা দৌড়ে গিয়ে চিনুর পায়ের কাছে সে লুটিয়ে পড়ল। বলল ঃ বল বড়মা, তুমি রাগ করনি।

চিনু তাকে দু'হাতে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। যেন বহুকাল পরে মাতা পুত্রে মিলন হলো। দু'জনের চোখেই অশ্রু ঝরতে লাগল। জামাই চেয়ে চেয়ে এই মিলন-দৃশ্য দেখছে। তারও দু'চোখ জলে ভরে এলো। সে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ দু'টো রগড়াতে লাগল।

দেবু বার বার বলে ঃ বল বড়মা, আর তোমার রাগ নেই?

চিনু বলে ঃ হাঁ আছে। চাকরি কেন ছাড়লি? তোর বাবা আমার অপমানের আর কিছু বাকি রাখলে না।

দেবু বলল ঃ তুমিও আমাকে বকো বড়মা, মারো যা ইচ্ছে কর। চাকরি আমি করব না। আমি পাশ করেছি। আমি পড়বো। থার্ড হয়েছি। জামাইদা, শোন।

জামাই দূরে থেকেই বলল ঃ পরে শুনবো, পরে শুনবো। কান্নাকাটি আমি সহ্য করতে পারি না। তোদের সে পর্ব শেষ হোক, তারপর শুনবো।

চিনুর চোখ থেকে আবার জলের ধারা নেমেছে। মুখে ফুটে উঠেছে একটা অপূর্ব হাসি। সে সার্থক, সে ধন্য! স্বর্গে থেকে আশীর্বাদ করেছেন তাকে দেবতারা, তার কল্যাণ কামনা করছেন তার বাবা, তার স্বামী।

চিনু ডাকল জামাইকে ঃ শোন বাবা, আমার দেবু পাশ করেছে, বলছে খুব ভাল করে পাশ করেছে।

দেবু বলল ঃ থার্ড হয়েছি জামাইদা! স্কলারশিপ পাব! এই দ্যাখ, খবরের কাগজ!

ঃ এ হে হে হে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জামাই ঃ তাই বল্ হতভাগা, তাহলে বেশ করেছিস্ চাকরি ছেড়েছিস্।

চিনু বলল ঃ তাহলে চল বাসুদেবপুরে যাই। জমি দশ বিঘে যেমন করেই হোক বিক্রি করে দিয়ে টাকা এনে তোকে এখানকার কলেজে ভর্তি করে দিই।

জমি বিক্রি করে দেবে? আপত্তি জানায় দেবু ঃ না, তা হবে না বড়মা। তুমি খাবে কি?

জামাই বলে ওঠে ঃ এ কিহে আমাকে তোমরা গ্রাহ্যই করছ না দেখছি? জমি বিক্রি করে দেবুকে পড়াতে হবে তার জামাইদা থাকতে? দু'বেলা একটা ছেলেকে দু'বেলা ভাতও দিতে পারব না।

দেবু বলে, সে জলপানি পাবে, প্রাইভেট ছাত্র পড়াবে, তাতেই কুলিয়ে নিতে পারবে।

তাই সই। জামাই এর কাছে এটা উত্তম প্রস্তাব। সে মুখ্য সুখ্যু মানুষ, তাকেই প্রাইভেট পড়াবে দেবু। জামাই-এর বাড়ির সে হবে হাউস টিউটার।

দেবুকে নিয়ে যেতে চায় চিনু, তার বাবা-মাকে গিয়ে প্রণাম করতে হবে দেবুকে। নইলে দেবুর বাবা ধরে বসবে, মেটা সাহেবের কাছে চল, আমি তার পায়ে ধরব, তোকে চাকরি করতে হবে।

॥ সাতাশ ॥

এবার রাণীগঞ্জ ছাড়তে হবে, তারই জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। দয়াময়। না ছেড়ে আর উপায় কি? দেবু চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, এই বাসাও ছাড়তে হবে। সে তো পালিয়ে গিয়েছে। এখন মেটা সাহেবের লোক এসে দয়াময়কেই বলবে, যাও, বেরিয়ে যাও। না গেলে হয় তো ঘাড়ই ধরবে।

যাবে, যাবে দয়াময়। উপযুক্ত পুত্র পিতৃকৃত্য খুব ভাল ভাবেই করেছে। আর কেন, এখন চাক্দার ছেলেকে চাকদায়ই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দিনের বেলা যাওয়া আর চলবে না। রাতের আঁধারে লুকিয়ে মুখ ঢেকে চাকদায় গিয়ে ঢুকতে

হবে। নইলে চাকদার লোক বলবে, কি হে দয়াময়, বড়ো যে তোমার সাহেব ছেলের বাংলো বাড়িতে থাকতে গিয়েছিলে, তা' ফিরে এলে কেন? আবার ওই অবিনাশ গাঙ্গুলীর চরেরা। ওরা ঠিক কাবুলিওলা। কেমন তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই রাতে যাবে, আবার রাত শেষ হতে না হতেই বেরিয়ে পড়বে।

পথের মানুষ আবার পথেই বেরিয়ে পড়বে। বলেছিল, ও আর তুমি করতে পারবে না বাবা। মাসে মাসে তোমাকে টাকা পাঠাব। চাকরি ছেড়ে পালিয়ে গেলি—মাসে মাসে টাকা পাঠাবি! তুই তো দয়াময়ের কিছু নোস্, তুই চিনুর। ডাইনী চিনু!

মিনুটাও কম নয়। ফেলে গেলে মন্দ হয় না তাকেও। কিন্তু শিবু আর ভুতুটা। না, তাদের চাকদার বাড়ি ফেলে রেখেই সে বেরিয়ে পড়বে।

আবার সেই কন্যাদায় বাবা! ছেলের পৈতে, স্ত্রীর শ্রাদ্ধ! টাকা, টাকা জুটে যাবেই। বাংলা দেশের লোক, পুণ্যের বড় লোভ তাদের। দান করে ভিক্ষে দিয়ে পুণ্যলাভের জন্যে সবাই উন্মুখ হয়ে রয়েছে। দেবেই। দু'দশ জন যদি না-ই দেয় আরো পঞ্চাশ ষাটজন দেবে। নিন্দা কিসের? এও তো একরকম ব্ল্যাক-মার্কেট। দয়াময় সেই ব্ল্যাক-মার্কেটই করছে। মিথ্যা কথা? আরে লক্ষ লক্ষ লোকই তো মিথ্যা কথা বলে কাজ গুছিয়ে নেয়? বড়রা নেয়, ছোটরা নেয়। তা' কেবল দয়াময়ের বেলাই হল অপরাধ।

আপনমনে বলে দয়াময় আর হুকো হাতে নিয়ে পায়চারি করে ঃ খুব হল। এবার যাত্রা করি। ওগো শুনছ?

ওদিকে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ে একজন ঃ বলি ও মশাই! সদরটা খুলে একটুখানি বাইরে আসুন।

ঃ কে? দোর খুলে বাইরে এসেই দেখে অপূর্ব। সঙ্গে জীবন ঘটকও রয়েছে। (কি ভীষণ লোকরে বাবা, এখানে এসেও উপস্থিত?

ঃ হ্যাঁ, এ বাড়ি থেকে পালাবার আগেই ধরা পড়ে গেল। বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ার আর কোন মানে হয় না। আবার একটা ভাঁওতা মেরে যদি অন্তত আজকার জন্যে এদের হাত এড়াতে পারে।

দয়াময় বলল, ও ঃ আপনারা? তা' আমার তো একটা জরুরী কাজ রয়েছে। অন্য সময় আসুন, কথাবার্তা হবে।

অপূর্ব বলে উঠল ঃ বেশ তো মশাই, এখান থেকেও পালাতে চান? সে আর হবে না?

ঃ হবে না মানে? কাজে যেতেও দেবেন না? বলেই দয়াময় দ্রুত এগিয়ে যেতেই একখানি মোটর এসে তাকে চাপা দিতে দিতে থেমে গেল। সে মোটর থেকে নামলেন, চাটুজ্যে মশাই আর অমলা।

অপূর্ব ঃ আ-হাহা যাক্ বাবা! আর একটু হলে গিয়েছিল টাকাটা।

দয়াময় মোটরের সম্মুখে পড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিল। এবার মুখ খিঁচিয়ে বলল ঃ বলে আমার প্রাণটা যাচ্ছিল, তা' আপনার টাকা! চামার—একেবারে চামার।

সংঘর্ষ বেঁধে গেল তিনজনে। দয়াময়, জীবন ঘটক আর অপূর্ব গাঙ্গুলী। অবিনাশ গাঙ্গুলী অগত্যা সিদ্ধান্ত করে বসেছেন, ওই অপূর্বটাই জীবন ঘটকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দয়াময়কে ছেলের বাপ সাজিয়ে নিয়ে এসে তাঁর ছ'শ পঁচিশ টাকা মেরে দিয়েছে। তাড়া করে উঠেছিলেন অপূর্বকে, তোর ভাগে কতো পড়েছে রে হতভাগা?

অপূর্ব আজ আর ছাড়বে না দয়াময়কে। টাকাটা সে আদায় করবেই। আসুক দয়াময়ের ছেলে। তারই সম্মুখে অপমান করবে দয়াময়কে, বাবার অপমানে যদি ছেলে টাকাটার ব্যবস্থা করে?

দয়াময় তেড়ে ওঠে ঃ খবরদার, কথাবার্তা বলতে হিসেব করে বলবেন। বলেছিলাম তো, তিন হাজার টাকা দিতে আপনার দাদা যদি রাজি থাকেন। রাজি কি না তাই বলুন।

লাফিয়ে ওঠে অপূর্বও ঃ তিন পয়সা দিতেও রাজি নন আমার দাদা। আমাদের ছ'শ পঁচিশটি টাকা ফেরৎ চাই।

অমলা অধৈর্য হয়ে পড়ে। এই তো বাসা। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? দেবুদার খোঁজ করতে হবে না বাসায় গিয়ে?

চাটুজ্যে এদিকে যে বিষম হাঙ্গামায় পড়েছেন। অপূর্বও তাঁকে সাক্ষী করে, দয়াময়ও। চাটুজ্যে সত্যি বিব্রত হয়ে পড়েন ঃ আচ্ছা বিপদে ফেললেন দেখছি। আমি এসেছি একটা জরুরী কাজে। এখন আপনাদের এই ঝামেলা।

অমলা বাড়ির সম্মুখে গিয়ে ডাকতে লাগল ঃ দেবুদা, ও দেবুদা।

ঃ দেবুদা? দয়াময় ভ্রূ কুঞ্চিত করে ঃ দেবুদা এখানে নাই। সে তো আমারই ছেলে।

চাটুজ্যে বলেন ঃ আপনার ছেলে দেবু? তা' সে গেল কোথায় বলুন।

দয়াময় বলে ঃ আর বলেন কেন, আমার ছেলেকে নিয়ে আমার এক শালী, চিন্ময়ী দেব্যা চরকী ঘোরান ঘোরাচ্ছে। ওই—ওই তো।

জামাই আর দেবুকে নিয়ে চিনু সেখানেই এসে উপস্থিত হল।

চিনু বলল ঃ তোর বাবাকে আর চাটুজ্যেদাকেও দেখছি, তাঁকেও প্রণাম কব দেবু।

দেবু তার বাবাকে প্রণাম করতেই দয়াময় বলে উঠল ঃ থাক্, থাক্ খুব হয়েছে। গোরু মেরে আর জুতোদান করতে হবে না। চিনু, তোমাকে আমি হাত জোড় করে

বলছি। ছেলেকে আমার ছেড়ে দাও। বিয়েটা সেরে নিই—নইলে এই ভদ্রলোক আমাকে কি যে অপমান করছেন।

অপূর্ব বলল ঃ না মশাই, বিয়ে দিয়ে হবে না, আমার ছ'শ পঁচিশটি টাকা দিয়ে দিন।

দয়াময় বলে ঃ দিন দিন বললেই দেওয়া যায় আর কি! টাকা ফেরৎ দিতে আমি পারব না। বিয়ের টাকা ফেরৎ চলে না। পণের টাকা থেকে ঐ টাকা কেটে নেবেন। বিয়ে আমি দেবো।

চিনু বলে ঃ না, না, আজই আমি আমার জমি জমা সব বিক্রি করতে চললাম। আপনার টাকা আমি দেব। আমি দেবুর মা।

দেবুর মা! দয়াময় বিয়েই দেবে। ঐ টাকা দিলেই তো শুধু চলবে না, দয়াময়ের সংসার চলবে কি করে। দেবুও তো চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। দেবুকে ডাকে দয়াময়। আয় আয় আমার কাছে আয় দেবু, তুই আমার ছেলে।

এই শেষবার যেন দয়াময় তার পিতৃত্বের অধিকার জারী করতে চায় দেবুর ওপর। এই এরা অনেকে উপস্থিত আছেন। সবাই দেখুন, জানুন, দেবু তার ছেলে। তাকে সে চাইছে, আর চিনু বাধা দিচ্ছে। সে তার ছেলেকে কেড়ে নিচ্ছে। দয়াময়ের চোখ দু'টি জ্বলতে থাকে। চিনুর সঙ্গে লড়বে সে। ছেলের ওপর পিতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে।

চিনুর ঠোঁট দু'টি কাঁপতে থাকে। বোধকরি বুকের স্পন্দনও বেড়ে যায়। সে চেয়ে থাকে দেবুর দিকে। দেবু মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। অমলা এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। এই আনন্দের দিনে কোথায় হাসিমুখে অমলার সঙ্গে দু'টো কথা বলবে, তারও উপায় রাখেনি তার বাবা। বলতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু বলতে পারে না দেবু, পিতৃত্বের দাবি খাটাতে হলে সত্যিকার পিতা হতে হয়। পারে না দেবু। চোখ তুলে কারো দিকেই সে তাকাতে পারছে না। তার সব পরিচয় যেন আজ অত্যন্ত নগ্নভাবে ধরা পড়ে গেল সকলের কাছে। জামাইদা আগেই জেনেছে তার বাবা মিথ্যে দায়ের দোহাই দিয়ে লোকের কাছে ভিক্ষে করে বেড়ায়। তার বাবার পরিচয় পেলেন এখন অধর চাটুজ্যে, পেল অমলাও। নিজের কৃতিত্ব, নিজের পরিচয় সবার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। মাথা তুলতে পারছে না দেবু। প্রতারণা করে ছ'শ পঁচিশ টাকা নিয়ে এসেছেন তার বাবা, তারই জন্যে একটি লোক এসে সবার সম্মুখে অপমান করছে তাঁকে। এ যে কত বড় লজ্জা! চরম লজ্জা!

আর চিনু? অনেকক্ষণ পরেই যেন কথা বলে চিনু ঃ দেবুকে নিয়ে যাবে তুমি? কিন্তু দেবু কি আমার কেউ নয়? দেবু আমার। আমি ওর মা। সে আমার ছেলে। চাটুজ্যেদা! আজ বড়ো আনন্দের দিন। আপনাদের দেখে কতো যে খুশি হয়ে উঠেছিলাম। আমার দেবু পাশ করেছে, থার্ড হয়েছে।

ঃ জানি, আমরা জেনেই আসছি। বললেন অধর চাটুজ্যে।

এবার চাটুজ্যে এগিয়ে গেলেন অপূর্বর দিকে। বললেন ঃ আমার দোকানে যাবেন, আমি এখান থেকে ফিরেই আপনার ছ'শ পঁচিশ টাকা গুণে দিয়ে দিব।

অপূর্ব বলে ঃ সত্যি সত্যি দেবেন তো, না ভাঁওতা মেরে তাড়াচ্ছেন।

চাটুজ্যে হেসে উঠেন ঃ আজ্ঞে না, ভাঁওতা দেওয়া আমার অভ্যেস নেই। আমার দোকানে সব এক দর—fixed price.

অপূর্ব চলে যেতেই চাটুজ্যে বলেন ঃ আমরা কি বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলব?

চিনু বলে ঃ না না, চলুন সবাই বাড়ির মধ্যে।

জামাই বলে ঃ হ্যাঁ, আজ একটা উৎসব হবে পিসিমা। এঁরাও রয়েছেন, ভালই হয়েছে। ইনিই একদিন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমি দেবুর খোঁজে গিয়েছিলাম। আর এই মেয়েটি নেমে এসেছিলেনা দোতলা থেকে। সেদিনের ওই কষ্টটুকুর জন্যে ধন্যবাদ। আসুন সবাই—কি বলিস্ দেবু, একটা উৎসব হবে আজ, তোর পরীক্ষা পাশের আনন্দ উৎসব।

দেবু বড়ো করুণ দৃষ্টিতে তাকায় তার জামাইদার দিকে। তার সমস্ত আনন্দ ও উত্তেজনা ম্লান স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

জামাই বুঝতে পারে। সে দেবুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে ঃ আজকের দিনে এমন করে মিইয়ে যেতে নেই ব্রাদার। আশ্চর্য মানুষ তো তুমি। ডানে বাঁয়ে একটুখানি চোখ ফেরাও। দেখো কে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে যাও। কতোদিন তাদের বাড়িতে রইলে।

দেবু তাকাল অমলার মুখের দিকে। অমলা এবার হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিল।

চিনু সবাইকে নিয়ে দেবুর বাসায় চলল। বলল ঃ মিনু এখনো কিছুই জানে না। দেবু চল, তোমার মাকে প্রণাম করবে চল। আসুন দাদা।

বাড়ির ভেতর যেতে যেতে দয়াময় প্রশ্ন করল ঃ দাঁড়ান তো মশায়। আপনার একটি মেয়ে আছে, এই মেয়ে?

হাসিমুখে চাটুজ্যে বলেন ঃ আপনার কি মনে হয়?

দয়াময় বলে ঃ আমি ঠিকই ধরেছি ঃ আপনি দিতে পরাবেন সাড়ে তিন হাজার? ছেলে পাশ করেছে, এখন তিন হাজার হবে না।

গম্ভীর মুখে চাটুজ্যে বলেন ঃ দেখি চেষ্টা করে।

দয়াময় অঙ্ক কষতে থাকে ঃ তা'হলে ওই ছ'শ পঁচিশ টাকা কেটে নিয়ে বাকি থাকে দু'হাজার আটশ' পঁচাত্তর বাকিটা—'বিয়ের দিনটা করছেন কবে?

চাটুজ্যে উত্তর দেন ঃ ছেলে যতদূর পড়তে চায় ততদূর পড়িয়ে নিয়ে ছেলের বাজার দর বাড়িয়ে, তারপর।

আঁতকে উঠে দয়াময় ঃ ওরে বাবা, তাহলে আমার চলবে কিসে এতদিন?

হাসতে হাসতে বলেন চাটুজ্যে ঃ চলবে আগামের ওপর। আগাম নেবেন আর কি।

দেবু গিয়ে প্রণাম করল তার মাকে।

চিনু বলল ঃ ওরে মিনু, তোর ছেলে পাশ করেছে, থার্ড হয়েছে। তাকে আশীর্বাদ কর।

মিনুর দু'চোখে জল ঝরতে লাগল।

মিনু বলল ঃ আমার নয় দিদি, তোর ছেলে। তোর আশীর্বাদই তার সব।

॥ আঠাশ

সত্যি উৎসব লাগিয়ে দিল জামাই। মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল যে, নিয়ে এলো একটা হারমোনিয়াম। সঙ্গীত হবে। গাইবে কে? মুখ দেখেই সে বুঝতে পেরেছে, অমলা গান জানে।

এবার মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা। চিনু বলে, জামাই এদিকে এসো, দেখি কি করতে পারি।

জামাই বলে ওঠে ঃ পিসিমা! আমি থাকতে—

চাটুজ্যে বলেন ঃ দাঁড়াও তোমরা। উৎসবে মিষ্টিমুখ, সে ব্যবস্থা আমিই করব। কি বলেন দয়াময়বাবু! এটাও না হয় আগাম বলেই ধরা যাবে।

জামাই বলে ঃ ক্ষমা করবেন। আমি হলাম বাসুদেবপুরের জামাই আর রাণীগঞ্জের ইঞ্জিনিয়ার। অধিকারের দিকে থেকে আমার দাবি ঠেলবার নয়। আমার দেবু ভাইয়ের পাশ করার উৎসব, আমিই করব। এবার মিষ্টি আনতে যাব। দেবু, এসো তো আমার সঙ্গে।

সবাইকে আশ্চর্য করে এসে বাড়িতে ঢুকল বিশু আর নিশু মুখুজ্যে। বিশু আসতে আসতে জামাই-এর কথা কিছুটা শুনেছে। সে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল ঃ কি বললে জামাই? অধিকারের কথা বলছিলে না? এবার! আমরা ছিলাম না বলে খুব অধিকার ফলাচ্ছ। এবার আমরা, ওই দেবুর মামারা এসে গেছি। হিসেব করে কথা বলবে। যা' করবার সব আমরা করব। উৎসব যদি করতে হয়, কি ভাবে কি করতে হবে, আমাদের বলো।

দেবু এসে প্রণাম করে মামাদের। চিনু বলে ঃ দেবু পাশ করেছে দাদা—থার্ড হয়েছে।

বিশু বলে উঠে ঃ তোকে এ খবর দিতে হবে আমাদের? তোরা জেনেছিস আজ, আমরা কালই জেনে গেছি। বুঝলি, আমরা বাসুদেবপুরে বাস করি, আর দেবু

সেখানকার ইস্কুলের ছাত্র। চিনু, তুই এসেছিস্ খবর দিতে, খবর পেয়ে এই রাণীগঞ্জে ছুটে আসার পর। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি চিনু, মুখুজ্যেকে ডিঙিয়ে আর কর্তৃত্ব ফলাতে যাস্‌নে। আবার রেগে গেলে কি কাণ্ড যে করে বসব। আমরা দু'ভাই কেন এসেছি জানিস্? দেবুকে পড়াতে হবে, আর সে পড়ার ব্যবস্থা করব আমরা।

চিনু বলে ঃ সে তো ভালোই দাদা।

ঃ সে তো ভালই দাদা! বলে বিশু ঃ আজ একথা বলছিস্? কিন্তু নিজের অলঙ্কারপত্র বেচে, বন্ধক রেখে সর্বস্বান্ত হয়ে দেবুর পড়ার খরচ চালিয়েছিস, আবার ক'বিঘে জমি আছে, তাও বিক্রি করতে গিয়েছিলি। পারিসনি একবারও আমাকে গিয়ে বলতে যে দাদা, দেবুর পড়ার একটা ব্যবস্থা কর? তুই বড় দাম্ভিক চিনু, বড় দাম্ভিক। কিন্তু আর এসব সইব না আমরা। বলল নিশু।

বিশু মাথা নেড়ে সায় দেয় ঃ ঠিকই দাদা!

উৎসব জমে উঠে। শুধু অমলার গান নয়। গানের আসর বসিয়ে দেয় নিশুও। বিশু হাঁকে, বাঁয়া তবলা, কেউ এক জোড়া বাঁয়া তবলা এনে দিতে পার না।

কোথায় পাওয়া যাবে এখানে বাঁয়া তবলা। কিন্তু তাল না হলে গান?

ভেতরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে চিনু আর মিনু।

মিনু বলে ঃ দিদি, সত্যি বলেছিস্ দেবুকে আরো পড়াতে হবে। আমাদের যা' হয় হবে। এতোকাল তো উপোস দিয়ে কাটিয়েছি, আরো কিছুকাল কাটাব না হয়। যদি অদৃষ্ট লেখা থাকে—

ঃ রাখ এখন এসব। ধমক দেয় চিনু ঃ অনেক বুদ্ধি আছে রে আমার মাথায়। আচ্ছা, এখন বলতো, ওই যে মেয়েটি অমলা! পছন্দ হয় তোর?

মিনু বলে ঃ চমৎকার মেয়ে দিদি!

'তাহলে', চিনু বলে ঃ এই আমাদের দেবুর বৌ। কিন্তু এ বৌ নিয়ে ঘর করতে হলে দয়াময়কে মানুষ হতে হবে।

সে আর বলিস নে দিদি। মন্তব্য করে মিনু ঃ ও যদি মানুষ হত তাহলে আজ কি হতো বল দেখি। ও তো অমনি, আবার ওই শিবুটা আর ভুতুটা। একেবারে বখে গেছে।

চিনু যেন নতুন করে বল পেয়েছে। বলে ঃ দেখব, আমি দেখব মিনু। তুই ভাবিস্ নে। দাদাদের কথা শুনলি তো!

দয়াময় যেন বাক্যহারা মূক হয়ে গেছে। সে হুঁকো হাতে নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তামাক টানছে। চিনু মিনুর কথা সে কান পেতে শুনল। কিছু বলল না।

শিবু আর ভুতুর উৎসাহ! তারা আনন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাদের দাদা পাশ

করেছে। থার্ড হওয়ার মানে তারাও বুঝে। তাদের ইস্কুলে তারা যদিও প্রায়ই ফেল করে, কিন্তু ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড থার্ড হয়ে ছেলেরা প্রমোশন পায় যে তারা জানে। শিবু ব্যস্ততার ফাঁকে দাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে, তোমরা কতো ছেলে এবার পরীক্ষা দিয়েছিলে দাদা।

দেবু বলে ঃ ঠিক জানি না রে। হাজার বিশেক ধরে নে।

ঃ ও বাব্বা—তার মধ্যে থার্ড। শিবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

দয়াময় ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে, উৎসাহের বন্যায় ভেসে চলেছে শিবু আর ভূতুও।

তারওতো উৎসাহিত হয়ে উঠবারই কথা। চাটুজ্যে বলেছেন, আগাম দেবেন। হয় তো বা দু'হাজার আটশ' পঁচাত্তর টাকাই দিয়ে দেবেন।

ওদিকে বিশু আর নিশু জমিয়ে তুলেছে।

আর জামাই। মোটর সাইকেল ভট্‌ ভট্‌ করে যায় আসে।

দেবুও ছুটোছুটি করে।

দয়াময় আড় চোখে চেয়ে দেখে, এক ফাঁকে দেবু আর অমলার মধ্যে কতো কি কথাবার্তা!

অমলা বলে ঃ তা'হলে পাশ তুমি করেই ফেললে?

দেবু বলে ঃ হ্যাঁ, করেই ফেললাম। তোমার আর আমার একসঙ্গে পরীক্ষা দেওয়া হল না।

ঃ না হয়ে ভালই হয়েছে। উত্তর দেয় অমলা ঃ তাহলে তোমার গর্বটা অনেকখানি বেড়ে যেতো! থার্ড হয়েছ কি না?

ঃ তা গর্ব তো এখনও হতে পারে? বলে দেবু।

অমলা বলে ঃ কাথাটা বুঝলে না? আমার সঙ্গে তো আর তুলনা করতে পারবে না। আমি বলতে পারব তোমাদের বছরে পরীক্ষা অনেক সোজা হয়েছিল।

ঃ বুদ্ধি তোমারই বেশি দেখা যাচ্ছে। গম্ভীর কণ্ঠ দেবুর।

রাগত কণ্ঠে বলে অমলা ঃ তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?

ঃ ঠাট্টার সম্পর্ক কি নয় তোমার সঙ্গে? একথা বলতে গিয়েই দেবু দেখতে পেল, দয়াময় তাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। অমলাও দেখল। তার মুখখানা অপ্রসন্ন মলিন হয়ে উঠল। উনি এ ভাবে চেয়ে আছেন, হয়তো তাদের কথাবার্তাও শুনছেন। সে সেখান থেকে দ্রুত সরে গেল। দেবু গেল নিশুর আসরে।

অধর চাটুজের দেরি হয়ে যাচ্ছে, তিনি চলে যেতে চান।

বিশু বলে ঃ দেখুন, আমি এখন কর্তা। আমি হুকুম না করা পর্যন্ত কারো যাওয়া চলবে না। আর-একটা গান, তার পর জলযোগ, তারপর যাত্রা। ব্যাস্‌ কোথায় হে দয়াময়। আচ্ছা তুমি এমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? এসো তো ভায়া।

কিন্তু কোথায় দয়াময়?

দয়াময় শোনে না সে ডাক। অথবা শুনেও গ্রাহ্য করে না। সে এগিয়েই চলে।

দেবু ছুটে চলে। বাবা! বাবা! বাবা!

মাঝে মাঝে হুঁচোট খেয়ে পড়ে যায় দেবু।

ধেয়ে আসছে কালো দৈত্য। এখন মাঝে মাঝে আগুনের ফুল্‌কিও ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

প্রাণপণ, প্রাণপণ করে ছুটে দেবু।

বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে টেনে বাইরে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। অবশেষে গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ধাক্কা দিয়ে দয়াময়কে লাইনের বাইরে ঠেলে দেয়। দয়াময় গড়িয়ে যায় অনেকখানি। দেবুও হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ে দয়াময়ের পাশে। দু'জনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে।

দৈত্যটা চলে যায় মাটি কাঁপিয়ে ভূমিকম্প সৃষ্টি করে। উৎকট আর্তনাদ করে ওঠে স্লিপার আর বোল্ডারগুলো।

কিন্তু দেবুর মুখে ফুটে উঠে হাসি।

চিনু এসে কাছে দাঁড়ায়।

দয়াময় চিনুর দিকে চেয়ে বলে ঃ তুমিও এসেছ আমাকে বাঁচাতে? কেন এলে!

চিনু উত্তর দেয় ঃ কেন এলাম? তুমি যে দেবুর জন্মদাতা পিতা আর আমার ছোট বোন মিনুর স্বামী।

জমিদার শিবনাথ চৌধুরী বলেন, চিকিৎসা ব্যবসাটা বৈদ্যদের একচেটে—এই ত, শুনি চিরকাল, কিন্তু আমাদের বংশটা বামুন হ'য়েও কেন যে বদ্যি হ'লো জানি না।

শ্রোতার দল হাঁ করে' তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

শিবনাথ বলেন, আমার ঠাকুরদাদার এ-সব বালাই ছিল না। তিনি শুধু প্রাণপণে খেটেছেন, টাকা খাটিয়েছেন, আর জমিদারি করে' গেছেন ; কিন্তু আমার বাবা ছিলেন মস্ত বড় কোবরেজ। শেষ বয়সে অবশ্য কোবরেজি তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কেন ছেড়ে দিয়েছিলেন সে-কথা সবাই জানে। কারণ এই একই গল্প তাঁর কাছ থেকে তা'রা বহুবার শুনেছে। তবু জমিদার মানুষ, কথাটা আর একবার বলে' যদি তিনি আনন্দ পান, ত' আর-একবার শুনতেই বা দোষ কি!

শ্রোতাদের মুখের পানে তাকিয়ে কথাটা তিনি এই বল্লে' শেষ কর্লেন—যে, তাঁর এক পিসিমার একবার গলায় হ'য়েছিল ক্যানসার, ভেবেছিলেন কবিরাজি ঔষধেই রোগটা তিনি সারিয়ে দেবেন, কিন্তু সারাতে কিছুতেই যখন পারলেন না, তখন কবিরাজি চিকিৎসা তিনি পরিত্যাগ করলেন।

শিবনাথবাবু বললেন, পিসিমার মৃত্যুর দিনে বাবা ঠিক ছেলে-মানুষের মতই কেঁদেছিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বলেছিলেন—যে-দেশের মাটিতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেই দেশের মাটিতে ভগবান যেমন তার ক্ষুধার অন্ন ঠিক করে' রাখেন, তেমনি তার সব রকমের সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধির ওষধিও সেই মাটিতেই থাকে। আমরা জানি না, জানতে চাই না, তাই আমরা বিদেশী ডাক্তার আর ওষুধের মুখ তাকিয়ে বসে' থাকি।

এমন ছিল তাঁর মনোভাব।

অবশ্য কবিরাজি ছেড়ে দিয়ে চুপ করে তিনি বসে' ছিলেন না। শেষ বয়সে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার অনেকগুলো ভাল ভাল বই তিনি কিনেছিলেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমি তাই এই বিদ্যেটা আমার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি!—এই বলে শিবনাথবাবু তাঁর হোমিওপ্যাথী ঔষধের কাঠের বাক্সটা হাতের কাছে টেনে এনে সমবেত রোগীদের রোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ প্রকাণ্ড একটা খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন।

নিতান্ত মারাত্মক ব্যাধি না হ'লে ঔষধ অবশ্য প্রথম দিনে পাওয়া যায় না। দুদিন সময় লাগে তাঁর ঔষধ নির্বাচন করতে। বলেন, বিদেশী হ'লেও মহাপুরুষ যারা তাঁদের কীর্তি আমাদের স্বীকার করতে হবে। এই হোমিওপ্যাথী জিনিসটি হানিম্যান-

সাহেবের অনেক দিনের সাধনার ফল। এ একেবারে অদ্ভুত—অব্যর্থ। না কি বল হে জনার্দন?

সূর্য হয় ত' কোনো দিন ঠিক সময়ে না দেখা দিতেও পারেন, কিন্তু জমিদার শিবনাথবাবুর বৈঠকখানায় প্রত্যহ ঠিক নিয়মিতভাবে এই জনার্দনের আবির্ভাব যে হবেই, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। জনার্দনের একটি অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র একদিন এক নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে প্রচণ্ড গুরুভোজনের পর একটি টাকা বাজি রেখে আড়াই দিস্তা লুচির সঙ্গে সের-দেড়েক রসগোল্লা প্রাণপণে আহার করে ফেলে, এবং তার ফলে কঠিন আমাশয় রোগে ছেলেটি হয় মরণাপন্ন। পরে একদিন শিবনাথবাবুর মাত্র একটি ফোঁটা হোমিওপ্যাথী ঔষধে সে উঠে বসে।

সেই থেকে এই বুড়ো জনার্দন হয়েছে তাঁর এবং হোমিওপ্যাথীর একজন গোঁড়া ভক্ত।

শিবনাথবাবুর বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য দয়াল কিন্তু অন্য কথা বলে।

বলে, ভক্ত না ঘোড়ার ডিম! সকাল বেলা খরচ হবে বলে বুড়ো নিজের বাড়িতে চা না খেয়ে এইখানে চা খেতে আসে। চা খায় আর ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানে। বাবু ত আমাদের শিবতুল্য! জনার্দনের তিন বছরের খাজনা বাকি ছিল, বাবু সেদিন তাও দিলেন মকুব করে; এমন হলে বাবা, ভক্ত সবাই হয়।

কথাটা অন্য লোকেও বলে বটে!

বলে, জমিদারবাবুর ও একটা রোগ! তাঁর হোমিওপ্যাথী ওষুধে রোগী যদি না সারে, তবু বলতে হবে সেরেছে। সারেনি বললেই রেগে কাঁই! বলেন, তাহলে কি বলতে চাও, ওষুধ আমি ঠিক নির্বাচন করতে পারিনি? অসম্ভব। আমরা হলাম গিয়ে চিকিৎসকের বংশ। আমাদের আর যেখানেই ভুল হোক, রোগীতে ওষুধে ভুল কখনও হবে না।

এর ওপর একটি কথা বলেছ কি—বাস্! তার আর রক্ষা নেই।

এই নিয়ে গ্রামে একটা বিশ্রী রকমের কেলেঙ্কারিও ঘটে গেছে।

সুরেন চাটুজ্যে নামে এক ভদ্রলোক কয়েক বৎসর আগে তার একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর হুগলী জেলার কোন এক গ্রাম থেকে এই গ্রামে এসে বসবাস করেন। হুগলী থেকে আসবার সময় ম্যালেরিয়ার বীজ বোধ করি তিনি সঙ্গে করেই এনেছিলেন। ভদ্রলোক প্রায়ই জ্বরে ভোগেন, মেয়েটির বয়স বেশি নয়, একা বাড়িতে রোগী নিয়ে বেচারা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ে। শিবনাথবাবু খবর পেয়ে একদিন তাকে দেখতে গেলেন। বললেন, এ কিছু না, আমি তোমাকে ভাল করে দেবো। সেইদিন থেকে শিবনাথবাবুর হোমিওপ্যাথী ওষুধ চলতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ওষুধের পর ওষুধ চলতে থাকে, সুরেনের জ্বর আর সারে না!

জ্বরও ছাড়ে না, ডাক্তারও ছাড়ে না!

সুরেন যত বলে, আমি একবার শহরে গিয়ে এ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকে দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে আসি, শিবনাথবাবুর জেদ যেন তত বেশি চেপে বসে! রাত জেগে বই পড়ে ওষুধ দেন, আর অধীর আগ্রহে তার জ্বর ছাড়বার অপেক্ষা করেন। কেমন আছে দেখবার জন্যে দয়ালকে ঘন ঘন তার বাড়ি ছুটতে হয়। দয়াল ফিরে এসে বলে, ও হুগলীর মেলোয়ারী বাবু, ওকে দখনে মেলোয়ারী বলে। ও দক্ষিণে না নিয়ে যায় না।

শিবনাথবাবু জিজ্ঞাসা করেন, তুই কেমন করে জানলি দয়াল?

দয়াল বলে, হুগলী জেলায় আমার এক মাসির বাড়ি ছিল বাবু, আমি একবার গিয়েছিলুম।

শিবনাথবাবু তখন হোমিওপ্যাথী মেটিরিয়া মেডিয়া পড়ছিলেন। বললেন, তারপর? গিয়ে কি দেখলি?

দয়াল বললে, দেখলুম গাঁকে-গাঁ জ্বরে ভুগছে। এমনি সময় জঙ্গল থেকে একদিন একটা বাঘ বেরুলো। ঘরে ঘরে রুগী, বাঘ তাড়াবে কে? বাঘটা একজনের ঘরে ঢুকে একটা মেলোয়ারী রুগীকে খেয়ে ফেললে। দিনকতক পরে দেখা গেল, গাঁয়ের ধারে একটা বাবলা গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে বাঘটা কাঁপছে। দলে দলে সব বাঘটাকে দেখতে গেল। সবাই বললে, ব্যাটাকে মেলোয়ারীতে ধরেছে। জব্দ হয়ে গেছে। ব্যাটা মরবে। বাস, উপোস দিয়ে কুঁহুর কুঁহুর করে কাঁপতে কাঁপতে ব্যাটা সেই বাবলা তলাতেই মরে গেল।—এ সেই বেঘো-মেলোয়ারীবাবু ওষুধে ওর কিছু হবে না।

বেঘো মেলোয়ারীর গল্পটা শুনে শিবনাথবাবু হেসে উঠলেন।

হেসে উঠলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে মনে তখন হোমিওপ্যাথীর ওপর না হোক অন্তত নিজের ওপর কেমন যেন একটুখানি অবিশ্বাস হয়েছে।

তাঁর একমাত্র পুত্র অমরনাথ তখন আই-এস-সি পাশ করে বাড়িতে বসে আছে। তার পরের দিনই কাউকে কিছু না জানিয়ে অমরনাথকে নিজে তিনি সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় গেলেন। গিয়ে অনেক টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে এ্যালোপাথী একটা মেডিক্যাল ইস্কুলে তাকে ভর্তি করে দিয়ে বললেন, যেমন করেই হোক এখান থেকে তোমাকে পাশ করতে হবে অমরনাথ। আমাদের বংশে মস্ত বড় একজন ডাক্তার হোক, এই আমি চাই।

অমরনাথ কলকাতায় রইলো। শিবনাথবাবু গ্রামে ফিরে এলেন।

ফিরে এসেই একদিন কি একটা কাজের জন্য গ্রামের বারোয়ারি তলায় তিনি বেড়াতে গেছেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো—অনেকগুলো লোকের মাঝখানে সুরেন চাটুয্যে রয়েছে বসে ; জ্বর তার সেরে গেছে দেখে মনে মনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সেরে গেছে সুরেন? আমি তখন বললাম আমার ওধুষ—

কথাটা তাঁকে সে শেষ করতে দিলে না। কেমন যেন বিরক্ত ভাবে সুরেন জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সেরেছি! কিন্তু আপনার ওষুধে নয়।

শিবনাথবাবুর মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। তবু তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কার ওষুধ খেয়েছ?

সুরেন বললে ঃ সে সব আপনার শুনে কি হবে? আপনি শুধু জেনে রাখুন—ডাক্তারি আপনি জানেন না।

এতগুলো লোকের সুমুখে তাঁরই জমিদারিতে বাস করে তাঁর মুখের ওপর এই জবাব! শিবনাথবাবুর মুখের চেহারা অন্যরকম হ'য়ে গেল। ইচ্ছে করলে তিনি তাকে অপমান করতে পারতেন, কিন্তু মনের রাগ মনেই চেপে তিনি গুম হ'য়ে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে শুনতে পেলেন, কে যেন সুরেনকে বলছে, ছি ছি, এমনি ক'রে ওঁকে বলে!

সুরেন জবাব দিলে ঃ না, বলবে না! মিছেমিছি আমাকে জল খাইয়ে খাইয়ে তিন মাস শুইয়ে রেখে—এখন বলে কি না, আমার ওষুধ—

আর কিছু শোনবার জন্যে তিনি অপেক্ষা করলেন না। জনার্দন সঙ্গে ছিল। বললেন, এসো জনার্দন!

এই বলে' জনার্দনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

এ অপমান শিবনাথবাবু মনের মধ্যে চেপে রাখলেন। বাড়িতে এসে তাঁর অবস্থা হ'লো আরও খারাপ। রাজবাড়ির মত প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়িতে এমন একটি মানুষ নেই যার কাছে দু'দণ্ড বসে' অন্তত মনের কথা বলতে পারেন। স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন। একটি মাত্র ছেলে অমরনাথ, তাকেও ত' কলকাতায় রেখে এলেন ডাক্তারি পড়বার জন্যে। এত বড় বাড়িতে মাত্র তাঁর বহুদিনের পরাতন ভৃত্য দয়াল। নীচে কাছারি-বাড়িতে আমলা গোমস্তা দাসদাসী পাইক পেয়াদার অভাব নেই, কিন্তু তাদের সঙ্গে জমিদার শিবনাথ চৌধুরীর কিসের সম্বন্ধ? আজ এতদিন পরে তাঁর মনে হ'লো—বাড়িটা একেবারে ফাঁকা।

প্রতিদিন সকালে রোগীরা যেমন ওষুধ নিতে আসে, তার পরের দিনও তেমনি এলো। পূজা আহ্নিক শেষ করে, শিবনাথবাবুও গম্ভীর মুখে নীচে নেমে এলেন খড়ম পায়ে দিয়ে। প্রত্যহ যেখানে বসেন, সেদিনও সেইখানেই বসলেন, দয়াল গড়গড়ায় তামাক দিয়ে গেল, শিবনাথবাবু নলটা মুখে নিয়ে বললেন ঃ ওষুধ আজ আর দেব না।

জনার্দন বলে উঠলো ঃ কেন?

শিবনাথ বললেন ঃ নাঃ, তোমরা অন্য ডাক্তার দেখাও গে।

মাত্র জনার্দন বুঝতে পারলে—কেন তিনি এ-কথা বলছেন। তৎক্ষণাৎ সে উঠে গিয়ে নিজেই ওষুধের বাক্সটা তুলে এনে তাঁর হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে ঃ ও সব চলবে না। ওষুধ আপনাকে দিতে হবে।—কোথাকার কে এক হারামজাদা—

এতগুলো লোকের সামনে সুরেনের নামটা পাছে সে বলে' বসে, শিবনাথবাবু তাই কৌশলে তাকে চোখ টিপে নিষেধ করলেন। তারপর গড়গড়াটা সরিয়ে দিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন ঃ কিছুতেই ছাড়বে না তাহলে? আচ্ছা বল!

বলে রোগীদের খাতাটা টেনে নিয়ে তিনি রোগীর নাম ও রোগের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করলেন।

এমনি করে দু' একদিনের ভেতরেই হয়ত সুরেনের কথাটা তিনি ভুলে যেতে পারতেন, কিন্তু গ্রামের লোক বোধকরি ভুলতে তাঁকে দিলে না। প্রায় প্রত্যহই কেউ না কেউ এসে বলতে লাগলো ঃ সুরেন কি বলে জানেন? বলে হোমিওপ্যাথী আবার ওষুধ!

হোমিওপ্যাথীর নামে কলঙ্ক শিবনাথবাবু সহ্য করবেন না! রেগেই জিজ্ঞাসা করেন ঃ কি বলে?

লোকটা হয়ত তাঁকে আরও বেশি করে রাগাবার জন্যে বলে ঃ সুরেন বলতে আরম্ভ করেছে—শিবনাথবাবু একটি বদ্ধ পাগল!

ফল হয় উলটো। শিবনাথবাবু একটু হেসে বলেন ঃ—তা বলুক। আমাকে যা খুশি তাই বলুক ক্ষতি নেই, কিন্তু হোমিওপ্যাথীর অপমান আমি সহ্য করব না।

এর একটা যা হোক কিছু প্রতিবিধান করবার উদ্দেশ্য বোধকরি ছিল জনার্দনের। সে ঠিক এক মাসের মধ্যে অনুসন্ধানের পর সুরেন সম্বন্ধে এমন একটা সংবাদ শিবনাথবাবুর কাছে বহন করে নিয়ে এলো—যা শুনে তিনিও একটুখানি অবাক হয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সত্যি বলছ ত জনার্দন?

জনার্দন বললে ঃ প্রমাণ চাই?

শিবনাথ বললেন ঃ হ্যাঁ, চাই।

একজন বিশ্বাসী লোক দিন আমার সঙ্গে। হুগলী জেলায় চলুক সেই পাঁচথুপি গ্রামে—সুরেন যেখান থেকে এসেছে, আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি।

শিবনাথবাবু একবার চোখ বুজে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন ঃ মরুকগে, ওসব ছেড়ে দাও জনার্দন। সুরেনের ভগ্নী গৃহত্যাগই করুক আর কুলত্যাগই করুক, তার জন্যে সুরেনের শাস্তি হওয়া বোধ হয় উচিত নয়।

জনার্দন সেকেলে মানুষ। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শিবনাথ চৌধুরীর মুখে এ কথা শুনবে আশা করেনি। তার ওপর লোকটাকে জব্দ করবার এত বড় একটা সুযোগ হাতে পেয়েও তিনি যদি চুপ করে থাকেন তা হলে তাঁর অপমানের প্রতিশোধই বা নেওয়া হলো কোথায়?

জনার্দন কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে, আপনার অপমান আপনি নিজে হয়ত ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমি ভুলব না। আপনাকে নিজে যেতে হবে।

কোথায়?

আমার সঙ্গে—সেই পাঁচথুপি গ্রামে।

কেন?

ঘটনাটা সত্যি কি না বেশ ভাল করে জেনে আসি চলুন।

শিবনাথবাবুর এতটা করবার ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না। কিন্তু ভক্তের অসাধ্য কিছু নেই। ভগবানকে নরকে টেনে নিয়ে যেতেও সে পারে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সত্যিই তাঁরা দু'জনে একদিন গোপনে পাঁচথুপি রওনা হয়ে গেছেন।

যেমন গোপনে রওনা হলেন, আবার তেমনি গোপনেই ফিরে এলেন। শিবনাথবাবু নিজে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু জনার্দনের মুখে শোনা গেল, ঘটনাটা সত্যি।

জনার্দনের ইচ্ছা ছিল—এই নিয়ে গ্রামের মধ্যে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, কিন্তু যার জন্যে এত কাণ্ড, সেই শিবনাথবাবুই বাদ সাধলেন। বললেন, ছি জনার্দন, তুমি চুপ করে থাকো। এ রকম করলে আমারই দুর্নাম হবে।

কাজেই প্রায় বছর-খানেক ধরে গ্রামের মধ্যে কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে মুখরোচক এই মজার সংবাদটা লোকের মুখে মুখে ধোঁয়াতে লাগলো, দপ করে জ্বলে ওঠবার অবসর পেলে না।

এক বছর পরে, সেবছর ফাল্গুন মাসে হঠাৎ শোনা গেল, সুরেনের একমাত্র কন্যা মায়ার বিবাহ। মেয়েটি দেখতে পরমা সুন্দরী. অনেক কষ্টে সুরেন একটি পাত্র জোগাড় করেছে। পাত্রটি দেখতে শুনতে তেমন ভাল না হলেও শোনা গেল, সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের সন্তান, মেয়েটির মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কোনদিনই হবে না।

জনার্দন শুনলে। শুনে একটুখানি হাসলে মাত্র।

বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। সুরেন আয়োজন মন্দ করলে না। বিয়ের রাত্রে বরযাত্রীদের সঙ্গে, সুরেন ঠিক করলে, গ্রামের ষোল আনা ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দেবে।

সন্ধ্যায় বর এলো পালকি চড়ে, বরযাত্রী এলো। বিবাহ-মণ্ডপে বর গিয়ে বসবে, ওদিকে ঘরের ভেতরে খাবার আয়োজন চলছে, এমন সময় বরযাত্রীদের মধ্যে অকস্মাৎ একটা সোরগোল সুরু হলো। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার? বরযাত্রীরা এ বাড়িতে কিছুতেই খাবে না, বিয়েও এ-বাড়িতে হতে পারে না।

সুরেন জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

একজন বৃদ্ধ বরযাত্রী বলে উঠলো ঃ যে ব্যাপারটা এইমাত্র শোনা গেল, আগে তার মীমাংসা হোক!

ব্যাপারটা প্রকাশিত হলো নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে। সুরেন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বরকর্তা বললেন, চুপ করে রইলেন কেন? জবাব দিন।

সুরেন প্রাণের দায়ে সত্য গোপন করে বললে, জানি না।

জানি না?—বরকর্তা গেলেন চটে। বললেন, চল এ-গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করা যাক।

কে একজন বললে, জমিদারের কাছে চল।

সেই ভাল।

হৈ হৈ করে সকলে এসে হাজির হলো শিবনাথবাবুর কাছে।

সর্বনাশ!

শিবনাথ চৌধুরী মিথ্যা কথা জীবনে বলেন না। সত্যনিষ্ঠ সদাচারী ব্রাহ্মণ শিবনাথ! বলতে তিনি প্রথমে চাননি। চেয়েছিলেন—কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের দায় উদ্ধার আগে হয়ে যাক। বললেন, তাই যদি হয়ে থাকে, সুরেনের দোষ কি? বিয়ে আপনারা দিন।

বরকর্তা বললেন, সে সব কথা পরে হবে। আপনি আগে বলুন—সুরেনের চাটুজ্যের বংশের এ কলঙ্কের কথা সত্যি কি না!

শিবনাথ বললেন, সুনের এ-গ্রামের লোক নয়। পিসিমার বিষয় সম্পত্তি পেয়ে এ গ্রামে এসে সে বাস করছে মাত্র।

বরকর্তা বললেন, তা জানি। আপনাকে যে-কথা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আপনি কি জানেন বলুন।

শিবনাথবাবু আর সত্য গোপন করতে পারলেন না। বললেন শুনেছি বটে!

কি শুনেছেন?

শুনেছি—সত্যি।

বাস, এইখানেই শেষ।

হৈ হৈ করে যেমন তারা এসেছিল, আবার তেমনি হৈ হৈ করেই চলে গেল।

সুরেন চাটুজ্যের মেয়ের বিয়ে আর হলো না।

সুরেন কাঁদতে লাগলো, মায়া কাঁদতে লাগলো।

হিন্দুর মেয়ের এর চেয়ে বড় সর্বনাশ আর হয় না। এই লগ্নে মায়ার বিয়ে যদি দিতে না পারে, তার বিয়ে আর হবে না—অন্তত হিন্দুর আইন তাই বলে। কাজেই গলায় কাপড় দিয়ে, হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে সুরেন এর বাড়ি ওর বাড়ি ছুটোছুটি করে অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু কোথাও কিছুই হলো না। মায়ার মত সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবার মত ছেলে যে গ্রামে ছিল না, তা নয়। একদিকে যেমন ছেলেও ছিল অনেক, প্রলোভনও ছিল প্রচুর, অন্যদিকে তেমনি গ্রামের সমাজও ছিল গোঁড়া, তার অনুশাসনও ছিল কঠোর। কাজেই শেষ পর্যন্ত কোথাও কিছুই হলো না। রাত্রি দেখতে দেখতে প্রভাত হয়ে গেল।

জনার্দন সেদিন একটু সকাল সকাল শিবনাথবাবুর বৈঠকখানায় এসে চীৎকার করতে লাগলো ঃ দয়াল! দয়াল!

দয়াল এসে দাঁড়াতেই বুড়ো হাসতে হাসতে বললে ঃ

গরম গরম এক পেয়ালা চা দে বাবা—খাই।

আরও বছর পাঁচ ছয় পার হয়ে গেছে।

অমরনাথ গ্রামে ফিরেছে ডাক্তার হয়ে। কিন্তু ডাক্তার হয়ে ফিরলে কি হবে, তাতে কোনও কাজ নেই, এখনও সে ডাক্তারখানা খোলেনি। কাজেই দিন তার কাটে শুধু দাবা খেলে আর গান গেয়ে। গান সে চমৎকার গায়, দাবাও সে বেশ ভালই খেলে।

শিবনাথ প্রায়ই বলেন, 'বই পড়ে' ডাক্তারি শুধু পাশ করলেই ত চলবে না, এইবার রুগী ভাল কর। রোগের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হোক।

অমরনাথ বাপের সুমুখে দাঁড়িয়ে ভাল করে' দুটো কথাও বলতে পারে না—এমনিই তার চিরকালের স্বভাব। বলে, হাসপাতালে রুগী আমাদের অনেক দেখতে হয়েছে, নানান রকমের রুগী দেখেছি।

যক্ষ্মা রোগী দেখেছ?

দেখেছি।

ক্যানসার?

দেখেছি।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করেন, সারিয়েছ?

না, তবে—

কথাটা তিনি আর তাকে শেষ করতে দেন না। বলেন ঃ হুঁ। মানুষের শত্রুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে শুধু, এখনও তার শক্তি পরীক্ষা করনি। কলকাতায় যাও, আমি একটা ডাক্তারখানা খুলে দিই।

অমরনাথ বলে ঃ আমার ইচ্ছে, এইখানে—আমাদের গ্রামে—

শিবনাথ বলেন ঃ না। গ্রামে এমন বিশেষ কিছু মারাত্মক ব্যাধি কারও হয় না, যা হয় তা আমি আমার হোমিওপ্যাথীতেই সারিয়ে দোবো। তোমাকে যেতে হবে শহরে—মানুষ সেখানে নানা রকমের নতুন নতুন ব্যাধির সৃষ্টি করছে।

বাপের মুখের ওপর অমরনাথ কিছু বলতে পারলে না। তার ইচ্ছা নয় যে, গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। কারণ সে জানে—শহরে যেমন নতুন নতুন মারাত্মক ব্যাধি আছে, তেমনি আছে বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ, বড় বড় দামি দামি ওযুধ ইনজেকসান। পল্লীগ্রামে যারা নিরক্ষর, যারা নিতান্ত দরিদ্র সামান্য ব্যাধিরও চিকিৎসা তারা করাতে পারে না, ডাক্তার তাদেরই জন্য সব চেয়ে বেশি দরকার। কিন্তু বাবাকে এইসব কথা বলতে গেলেই তিনি হয়ত চীৎকার করে উঠবেন! তার চেয়ে কাজ নেই, চুপ করে থাকাই ভাল।

রাত্রে গ্রামের ইস্কুলে দাবা খেলে, ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে গান গেয়ে বেহালা বাজিয়ে বাড়ি যখন সে ফিরে এলো—শিবনাথবাবু তখন শুয়ে পড়েছেন। অমরনাথ

গ্রাম ছেড়ে যাবে না—এই কথাটাই ভেবেছিল বাবাকে একটু নিরিবিলি পেয়ে বলবে। কিন্তু শুয়ে যখন পড়েছেন তখন যাওয়া তার উচিত কি না ভাবছে, এমন সময় দয়াল এসে দাঁড়াল। বললে ঃ রোজ রোজ এত রাত কেন হচ্ছে দাদাবাবু?

মাতৃহীন অমরনাথকে শৈশব থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে এই দয়াল।

অমনরাথ বললে ঃ দাবা খেলছিলাম।

দয়াল বললে ঃ দাবা খেললে মাথা খারাপ হয়ে যায় শুনেছি, দাবা আর খেলিসনি। গান গা'স্, বেহালা বাজাস, সেই ভালো, আবার দাবা কেন? চল—খাবি চল্।

অমরনাথ বললে ঃ আমি কলকাতা চললাম দয়াল। বাবা বলছেন—কলকাতায় ডাক্তারি করতে হবে।

'বাবুর যেমন কথা!'—দয়াল বললে, না, আর কলকাতায় যেতে হবে না। তুই বাড়িতে না থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। তোকে ত আর রোজগার করতে হবে না, তুই কি জন্যে কলকাতায় যাবি?

অমনরাথ বললে ঃ কিন্তু বাবাকে আমি বলতে পারছি না। তুই পারবি বলতে?

দয়াল বললে ঃ কেন পারব না? তুই গ্যাঁট হয়ে বসে থাক এইখানে। তারপর আমি দেখে নেবো।

অমরনাথ গ্যাঁট হয়ে বসে রইলো বটে, কিন্তু দয়াল বলি-বলি করেও কথাটা বাবাকে বলতে পারলে না।

প্রত্যহ সকালে শিবনাথবাবু সমাগত রোগীদের যেমন বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করতেন, এখনও তেমনি করেন।

জনার্দন প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে ঃ অমরনাথ ডাক্তারি পাশ করে এলো, এবার সে বসবে কোথায়?

শিবনাথ বলেন ঃ কলকাতায়।

জনার্দন বলে ঃ সেই ভালো। ও-সব এলোপ্যাথী চিকিচ্ছে আমাদের পোষায় না। ছেলেবেলায় ডাক্তারি ওষুধ একদাগ খেয়েছিলাম। বমি করে 'করে' মরি আর-কি! আমাদের এই হোমিওপ্যাথীই ভাল। কোনাও জ্বালা নেই, জঞ্জাল নেই টুক্ করে জিবে ফেলে দাও, রোগ সেরে যাবে।

শিবনাথ বলেন ঃ কিন্তু হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা অনেক সময় লোকে যে বিশ্বাস করে না জনার্দন।

জনার্দন চীৎকার ক'রে উঠলো—কে বিশ্বাস করে না? কোন্ ব্যাটা বিশ্বাস করে না শুনি!

কথাটা সে এমন ভাবে বললে, মনে হলো যেন হোমিওপ্যাথীতে বিশ্বাস যার নেই তাকে সে হাতের কাছে পেলে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না।

শিবনাথ ঈষৎ হাসলেন। হেসে বললেন ঃ কিন্তু গায়ের জোরে ত বিশ্বাস করানো

যায় না জনার্দন! সেই জন্যেই অমরনাথকে ডাক্তারি পড়ালাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—ডাক্তারি বিদ্যেটা শুধু পড়ে পাশ করলেই হয় না। ওকে এখনও কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে রুগী দেখতে হবে।

এমনি করেই দিন কাটছিল, এমন দিনে গ্রামে হঠাৎ একদিন শোনা গেল—বাগ্‌দি পাড়ার দু'জন লোকের কলেরা হয়েছে।

শিবনাথবাবু তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়ে রুগী দেখে এলেন, অনেক ভেবে চিন্তে হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিলেন।

সন্ধ্যার সময় একজন গেল মরে। আর একজন, মনে হলো যেন সেরে উঠবে।

জনার্দন বললেঃ ও-ব্যাটার পরমায়ু ছিল না তাই মরলো, নইলে বাবুর ওষুধ একবার পেটে পড়লে রোগ আর থাকে না।

কিন্তু তার পরের দিন, সর্বনাশ, আবার খবর এলো পাঁচ জনের হয়েছে। এবার বামুন-পাড়ায় দুজনের।

শিবনাথবাবুর ওষুধ চলতে লাগলো। বড় ভীষণ কলেরা, শিবনাথবাবু রোগীর কাছে বসে থেকে ঘন-ঘন ওষুধ বদলে অনেক চেষ্টা করলেন। তিন জন মারা গেল। দু'জন বাঁচলো।

সেইদিনই আবার আরও দুজনের হলো।

অমরনাথ আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বাবাকে বললেঃ বাবা, আপনাকে আমি আর রুগীর কাছে যেতে দেবো না। আমি নিজে চিকিৎসা করব।

শিবনাথবাবু হাসলেন। বললেনঃ ছোঁয়াচে রোগ, তোমাকেই বা আমি যেতে দেবো কেমন করে?

অমরনাথ বললেঃ যাদের হয়নি, তাদের আমি কলেরার ইন্‌জেক্‌সান দিয়ে দেবো, আর হবে না। আর যাদের হয়েছে—স্যালাইন না দিলে সারবে না।

শিবনাথ বললেনঃ আমার ওষুধেও ত সারলো জন-কতক।

অমরনাথ বললেঃ তারা বোধহয় ওষুধ না খেলেও সারতো।

তাহলে বলতে চাও—আমার হোমিওপ্যাথীতে তোমার বিশ্বাস নেই?

অমরনাথ বললেঃ না।

অমরনাথ না বললে এ তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। চমকে তার মুখের পানে একবার তাকিয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই তিনি বলতে পারলেন না। গুম হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বললেনঃ তাহলে তুমিও চিকিৎসা কর, আমিও করি। পিতা পুত্রেই প্রতিযোগিতা চলুক।

এই বলে শুকনো একটু হাসি হেসে শিবনাথ ডাকলেনঃ দয়াল! দয়াল আসতেই শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেনঃ আজ থেকে তোমার খোকার ব্যবস্থা করে দাও, উনিও ডাক্তারি করবেন।

কথার ধরণ শুনেই দয়াল বুঝলে, বাবু রাগ করেছেন।

অমরনাথের মুখের পানে তাকিয়ে চোখ টিপে ইসারায় তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দয়াল বললেঃ তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কি কখনও হবে না খোকা? বাবুকে চটালি কেন?

অমরনাথ বললেঃ কলেরার রুগী নিয়ে উনি কি রকম ঘাঁটাঘাঁটি করছেন দেখতে পাচ্ছিস না?

দয়াল বললেঃ হ্যাঁ তা ঠিক। ও—এই কথা! আচ্ছা, কাল থেকে আমি আর ওঁকে যেতে দেবো না।

অমরনাথ বললেঃ আমি আজ কলকাতা চললাম ওষুধ আনতে, ইন্‌জেক্‌সান আনতে। তোকে একটি কাজ করতে হবে। পুরনো ইস্কুল ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে হাসপাতালের মতন করে রাখিস।

দয়াল বললেঃ হাসপাতালের মতন? সে আবার কেমন?

অমরনাথ বললেঃ হাসপাতাল কখনও দেখিস্‌নি?

দয়াল বললেঃ হাসপাতাল দেখতে যাব কোন দুঃখে? আমি বাপু জলটল দিয়ে বেশ করে ধুয়ে মুছে রাখব, তারপর যা করতে হয় তুমি কোরো।

অমরনাথ বললেঃ তাহলেই হবে। সুকুমারকে বলে যাচ্ছি, পাড়ার ছেলেদের দিয়ে সে সব ঠিক করে নেবে।

অমরনাথ কলকাতায় চলে গেল।

এদিকে গ্রামের মধ্যে কলেরা তখন মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। গ্রামের লোকে সকলেই সন্ত্রস্ত। শিবনাথবাবুর বিশ্রাম নেই। দিবারাত্রি তিনি বসে আছেন ওষুধের বাক্স নিয়ে। ওষুধের একেবারে দানছত্র খুলে দিয়েছেন।

গ্রামের কয়েকজন ছোকরা অমরনাথের আদেশ অনুসারে সাবাদিন ধরে কাজ করে বেড়াচ্ছে।

অমরনাথ লক্ষ্য রাখতে ব'লে গেছে—

যে দুটো পুকুর থেকে গ্রামের লোক খাবার জল নিয়ে যায়, সে দুটো পুকুর কেউ যেন স্নানের জন্যে কিম্বা কাপড় কাচবার জন্যে ব্যবহার না করে।

খাবার জিনিসে মাছি যেন বসতে দেওয়া না হয়।

এ-সময় যেন কেউ অনিয়ম অত্যাচার না করে।

কলেরা রোগীকে যারা সেবা করবে তারা যেন অত্যন্ত সাবধানে থাকে।

সুকুমার দলের পাণ্ডা। বাইকে চড়ে দলবল নিয়ে এই সব কথা সে গ্রামের মধ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

সমস্ত জিনিসপত্র কিনে কলকাতা থেকে ফিরতে অমরনাথের একদিন দেরি হয়ে গেল।

টেলিগ্রাম এসেছে আজ সে জিনিসপত্র নিয়ে ফিরছে। দয়াল ষ্টেশনে গেল গাড়ি নিয়ে।

ছোট্ট ষ্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। অমরনাথ নামলো ট্রেন থেকে। দয়াল জিনিসপত্র নামাতে নামাতে বললেঃ কি জন্যে আনলি এতসব জিনিস কিনে খোকা? তোর হাসপাতালে কেউ যাবে না।

অমননাথ বললেঃ তার মানে?

দয়াল বললেঃ মানে আবার কি! ও-পাড়ার রসিক-ঠাকুরের কলেরা হয়েছে বাড়িতে কেউ সেবা করবার লোক নেই। সুকুমার গিয়েছিল তাকে তোর হাসপাতালে আনতে। বলেছে—মরতে হয় এইখানে মরব, হাসপাতালের চালায় মরতে যাব কেন?

অমরনাথ বললেঃ এলো না?

দয়াল বললেঃ না।

তার পর?

তার পর আর কি! এত করে বারণ করলাম, বাবু কিছুতেই শুনলেন না। নিজে গিয়ে ওষুধ দিয়ে এলেন।

ষ্টেশনের বাইরে গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র চড়ানো হচ্ছে, এমন সময় দুজন ছোকরা এলো গ্রাম থেকে বাইকে চড়ে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেঃ কি খবর সুকুমার?

সুকুমার কিছু বলবার আগেই অমরনাথ দেখলে তার কপাল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। অমরনাথ বললেঃ কপালে তোর রক্ত কিসের সুকুমার?

'ও কিছু না'। বলে সুকুমার তার কাপড় দিয়ে রক্তটা মুছে ফেলে বললেঃ এসো, আমরা এগিয়ে যাই।

সুকুমারের সঙ্গে ছিল বিজন। যে-কথাটা সুকুমার বলতে চাইলে না বিজন অমরনাথকে তাই দিল বলে। বললেঃ কি হয়েছে জানো অমরদা। হিতু মুখুজ্যে খড়ম্ দিয়ে সুকুমারের মাথায় এক বাড়ি মেরেছে।

অমরনাথ বললেঃ কেন?

বিজন সুকুমারকে দেখিয়ে দিয়ে বলেঃ ওকেই জিজ্ঞাসা কর না!

সুকুমার বললেঃ হিতু মুখুজ্যে সংকীর্তনের একটা দল বের করেছে, বলছে হরিনাম সংকীর্তন করে মা-শীতলার পূজো দিলেই কলেরা ভাল হয়ে যাবে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলে, তারপর?

সুকুমার বললেঃ পচু ময়রার দোকান থেকে বাতাসা কিনে আনছে, হরির লুট দিচ্ছে, আর সবাই মিলে সেই বাতাসা কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে। হিতু মুখুজ্যেকে আমি

বারণ করলাম, বললাম—দোকানের বাতাসার মাছি ভন্ ভন্ করছে, ওগুলো তোমরা এরকম করে খেয়ো না। এই নিয়ে একথা সেকথা হতে হতে মুখুজ্যে উঠলো চটে, আমার মাথায় খড়মের বাড়ি মেরে দিয়ে বললেঃ বেরো তুই এখান থেকে, ম্লেচ্ছ কোথাকার! আমরা খাব, আমরা হরির লুট দেবো, আমাদের কেউ বারণ করতে পারবে না।

অমরনাথ বিজনের বাইকটা নিয়ে বললেঃ বিজন, তুই আয় আমার গাড়ির সঙ্গে। আমি আর সুকুমার এগিয়ে যাচ্ছি। দেখি একবার হিতু মুখুজ্যেকে।

এই বলে সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে অমরনাথ বাইকে চড়ে চলে গেল।

মা-মনসার মন্দিরের পাশে প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় শীতলাদেবীর স্থান। সেইখানে সঙ্কীর্তন হচ্ছে। গ্রামের বহু লোক জড়ো হয়েছে। কাঁসর বাজছে, ঘণ্টা বাজছে, আর একদিকে খোল-করতাল বাজিয়ে সকলে মিলে চীৎকার করছেঃ গৌর নিতাই রাধে শ্যাম!

অমরনাথ আর সুকুমার বাইক থেকে নামলো।

হিতু মুখুজ্যে প্রকাণ্ড একটা ধূপদানিতে ধুনো ছিটিয়ে ছিটিয়ে ধূপের ধোঁয়ায় জায়গাটা একেবারে গুলজার ক'রে তুলেছিল। যেই অমরনাথের সুকুমারকে দেখেছে, অমনি সে চোখ বুজে একেবারে ধ্যানস্থ!

অমরনাথ চীৎকার করে ডাকলেঃ হিতু!

হিতু নির্বিকার! চোখ সে কিছুতেই চাইবে না!

অমরনাথ ঈষৎ হেসে সুকুমারের মুখের পানে তাকালে। সুকুমারও হাসলে।

এমন সময় দেখা গেল, রঞ্জন একধামা বাতাসা এনে 'হরি হরি হরিবোল' বলে লোকজনের মাঝখানে দিলে ছড়িয়ে!

কীর্তন বন্ধ হয়ে গেল। হুড়মুড় করে সব হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাতাসা কুড়োবার জন্যে। অমরনাথ ছুটে গিয়ে তাদের নিষেধ করলে। বললেঃ খেয়ো না, ও বাতাসা খেয়ো না!

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

ছেলে বুড়ো সকলে মিলে তখন গব্ গব্ করে বাতাসা গিলছে।

রঞ্জন বলে উঠলোঃ—এ কি বলছ তুমি অমরনাথ? হরির লুটের বাতাসা খাবে না?

অমরনাথ বললেঃ না। খাবে না।

রঞ্জন বললেঃ তুমি দেখছি ডাক্তারি শিখে এসে একবারে গোল্লায় গেছ। তোমার বাবাও ত ডাক্তারি করেন, কই, তিনি ত বারণ করেন না।

অমরনাথ বললেঃ দোকান থেকে বাতাসা কিনে আনছেন। দোকানের বাতাসায় মাছি ভন ভন করছে। ওই বাতাসা যদি আপনারা এমনি করে খান—কলেরা কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না।

রঞ্জন চীৎকার করে উঠলো ঃ আলবাৎ যাবে। আমরা শীতলার পূজো করছি, সংকীর্তন করছি—

কথাটা তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই অমরনাথ বললে ঃ পূজো সংকীর্তন করতে বারণ করনি। বারণ করছি—বাতাসার হরির লুট দিতে।

রঞ্জন বললে ঃ একশবার দেবো। আবার দেবো।

এই বলে আবার সে বোধহয় বাতাসা আনবার জন্যে দোকানে ছুটলো।

অমরনাথের দলের আর-একজন ছোকরা এলো বাইকে চড়ে। বাইক থেকে নেমেই সে অমরনাথের কাছে এসে জানালে—পশ্চিম পাড়ায় রীতিমত একটা মজলিস বসে গেছে। আমাদের হাসপাতালে কেউ আসবে না।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলে ঃ বুঝিয়ে বলেছিলি?

ছোকরাটি বললে ঃ নিশ্চয়। তুমি একবার এসো। হরিশদের বাড়ির একটা রুগীও বোধহয় বাঁচবে না।

অমরনাথ তার দলবল নিয়ে চলে যাচ্ছিল, রঞ্জন এলো বাতাসা নিয়ে। এবার বোধহয় সে অমরনাথকে দেখাবার জন্যেই ধামাভর্তি প্রচুর বাতাসা নিয়ে এসেছে।

কিন্তু বাতাসা ছড়াতে গিয়ে বাধলো বিভ্রাট। সুকুমার তার হাত থেকে ছোঁ মেরে ধামাটা নিয়ে কেড়ে। কেড়ে নিয়েই ছুটলো।

অমরনাথ হো হো করে হেসে উঠলো। তার দেখাদেখি অনেকেই হাসতে লাগলো। আবার অনেকগুলো মুখ দেখা গেল রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কার যেন কান্নার শব্দে সবাই চমকে থেমে গেল। পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে—সুরেনের মেয়ে মায়া। সেই মেয়েটি,—বিয়ের আসর থেকে যার বর উঠে গেছে। পরমা সুন্দরী পরিপূর্ণ যুবতী মায়া আলুথালু বেশে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে দাঁড়ালো অমরনাথের কাছে।

অমরনাথের যাওয়া আর হলো না। জিজ্ঞাসা করলে ঃ কি হয়েছে মায়া? তুমি এমন করে, কাঁদছো কেন?

মায়া অমরনাথের মুখের পানে তাকিয়ে বললে ঃ তুমি একবার এসো আমাদের বাড়ি।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলে ঃ কেন?

বাবার কলেরা হয়েছে। তোমার বাবার কাছে গিয়েছিলাম—ওষুধ তিনি দিলেন না। বললেন—তোমার বাবার রোগ আমার ওষুধে সারবে না।

রঞ্জন বলে উঠলো ঃ ঠিক বলেছেন!

আর-একজন বললে ঃ বলবে না? মনে নেই সেই অপমান।

অমরনাথ আর সেখানে অপেক্ষা করলে না। মায়াকে বললে, চল।

কিন্তু যেই সে এগিয়েছে, লোকজন একেবারে হৈ হৈ করে উঠলো।

কে একজন বলে উঠলো ঃ তুমি করছ কি অমরনাথ?

অমরনাথ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে ঃ কি করছি?

যেয়ো না ওদের বাড়ি। তোমার বাবা ভয়ানক রাগ করবেন।

না। তোমাদের চেয়ে আমার বাবাকে আমি ভাল চিনি।

সুরেন তোমার বাবার শত্রু।

অমরনাথ বললে ঃ রুগী কখনও শত্রু হয় না।

এই বলে সে আর সেখানে দাঁড়ালো না। মায়াকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে গেল। বন্ধুদের বললে, তোমরা এসো।

গিয়ে দেখলে সুরেন ছটফট করছে। ডাকছে, মায়া! মায়া!

মায়া তার কাছে ছুটে গিয়ে বললে ঃ বাবা, অমরদাদাকে ডেকে এনেছি। তোমাকে ওষুধ দেবে।

কে? কে অমরনাথ? বলে সুরেন অমরনাথের মুখের পানে তাকিয়েই চীৎকার করে উঠলো ঃ তুমি কি জন্যে এসেছ অমরনাথ? তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়েছেন—আমি কেমন করে মরছি তাই দেখতে?

মায়া বললে ঃ বাবা তুমি চুপ কর। ছি, ও-সব কি বলছ?

সুরেন বললে ঃ কি বলছি? ঠিকই বলছি মা, ঠিকই বলছি। আজ যে আমি মরতে পারছি না তোর মুখের পানে তাকিয়ে—কেন? কেন জানিস? ওই—ওই অমরনাথের বাবার জন্যে। উনি যদি তোর বিয়ের রাত্রে কথাটা না বলতেন, তাহলে আজ—আজ আমি সুখে মরতে পারতাম।

এই বলে সে অমরনাথের দিকে আবার তাকালে। তাকিয়ে বললে ঃ চেয়ে দ্যাখো, আমার ওই মেয়ের মুখের পানে চেয়ে দ্যাখো। এখনও আমি ওর বিয়ে দিতে পারলাম না—আর পারব বলে মনেও হয় না। আমি মরে' গেলে কোথায় যাবে ও? কে আশ্রয় দেবে ওকে? তোমার বাবা? যাও—তুমি চলে যাও আমার সুমুখ থেকে। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে—

মায়া আবার চীৎকার করে উঠলো ঃ বাবা!

অমরনাথ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলে না। সুকুমারকে বললে ঃ হাসপাতাল থেকে স্যালাইন্ ইন্‌জেক্‌সানের জিনিসপত্র সব নিয়ে এসো। যাও তাড়াতাড়ি। বিজন, তুমি একটা খাটের ব্যবস্থা কর। এখান থেকে এঁকে নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে।

দু'জনেই চলে গেল।

অমরনাথ মায়াকে বললে ঃ একটু জল গরম করতে হবে।

করছি। বলে মায়া তৎক্ষণাৎ ঘরের এককোণে একটা ষ্টোভের কাছে গিয়ে বসলো।

সুরেন ডাকলে ঃ অমরনাথ!

অমরনাথ দেখলে, সুরেনের চোখদুটো জলে ভরে এসেছে।

অমরনাথ বললেঃ বলুন!

সুরেন বললেঃ তোমার বাবা যে অপরাধ করেছেন তুমি কি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছ?

অমরনাথ বললেঃ ধরুন, তাই।

সুরেন বললেঃ শুনেছি তুমি ডাক্তারি পাশ করেছ। আমাকে ওষুধ দেবে? পারবে বাঁচাতে?

চেষ্টা করে দেখব।

সুরেন একবার চোখ বুঝলে। চোখ বুজে কি যেন ভেবে আবার বললেঃ যদি বাঁচাতে পারো, ভাল ; আর যদি না পারো, মায়াকে দিয়ে গেলাম তোমারই কাছে। ওকে দেখো। ওকে দেখবার আর কেউ নেই এ পৃথিবীতে।

এই পর্যন্ত বলে সুরেন আবার চোখ বন্ধ করলে। দু' চোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়াতে লাগলো।

সুকুমার এলো ডাক্তারি সরঞ্জাম নিয়ে।

অমরনাথ সুরেনকে ইন্‌জেক্‌সান দিলে।

বিজন লোকজন নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিল তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে। অমরনাথ তাঁকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে মায়াকে কাছে ডেকে বললেঃ তুমিও ওঁর সঙ্গে যেয়ো। কিন্তু দেখো যেন কেঁদে কেটে লোকজনকে বিব্রত করে তুলো না, আমি একবার বাবার সঙ্গে দেখা করেই আসছি।

শিবনাথবাবু হোমিওপ্যাথীর একটা বই পড়ছিলেন, অমরনাথকে এতক্ষণ তিনি দেখতে পাননি। ঘরে ঢুকে চুপ করে সে দাঁড়িয়েছিল। দেখে মনে হলো কি যেন সে বলবার জন্যই এসেছে।

হঠাৎঃ একসময় শিবনাথবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

জিজ্ঞাসা করলেনঃ কিছু বলবে?

অমরনাথবাবু বললেঃ সুরেন চাটুজ্যে—

কথাটা তার মুখে যেন আটকে গেল।

শিবনাথবাবু বললেনঃ সুরেন চাটুজ্যে—কী?

সুরেন চাটুজ্যের কলেরা হয়েছে।

শিবনাথবাবু বললেনঃ জানি। তুমি তার বাড়ি গিয়েছিলে সে খবরও পেয়েছি।—কেমন আছে?

ভাল আছে।

তার পর দু'জনেই চুপ।

শিবনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেনঃ আর কিছু বলবে?

অমরনাথের আর বলা হলো না। 'না' বলে সে বেরিয়ে এলো! সুরেন চাটুজ্যের অসুখের কথা বলবার জন্যে সে যায়নি। গিয়েছিল তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে—এমন কি অপরাধ তিনি করেছেন যার জন্যে তাঁর ওপর সুরেনের এত আক্রোশ! আহা বেচারা! সত্যিই ত! এত বড় মেয়েটার এখনও বিয়ে পর্যন্ত দিতে পারেনি! আর পারবে বলে মনেও হয় না।

নীচে নামতেই দেখলে, দয়াল তার হাতদুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে আপন মনেই চোখ বুজে কাকে যেন প্রণাম করছে আর বলছেঃ হে মা শেতলা, হে মা ওলাই-চণ্ডী, রোগ ব্যাধি সব ঠাণ্ডা করে দাও মা!

অমরনাথ হেসে বললেঃ ওতে ঠাণ্ডা হবে না দয়াল-দা, তোমাকে ইন্‌জেক্‌সন্‌ নিতে হবে।

দয়াল আচম্‌কা বলে উঠলোঃ কেন?

হ্যাঁ, ইনজেক্‌সন্‌ নিলে কলেরা আর হবে না। বলতে বলতে অমরনাথ তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

দয়াল বললেঃ ইন্‌জেক্‌সন্‌ তুই নে, তাহলেই হবে।—আবার মরতে সুরেনের বাড়ি কি জন্যে গিয়েছিলে?

অমরনাথ বললেঃ যাব না? তার যে কলেরা হয়েছে। তাই তাকে দেখতে গেছলাম।

দয়াল বললেঃ হোক না। তোমার কি? ওই লোকটা তোমার বাবাকে কি রকম অপমান করেছিল জানো?

অমনরাথ বললেঃ জানি। বাবাও তার প্রতিশোধ নিয়েছেন। মেয়েটার এখনও বিয়ে হয় নি।

দয়াল বলে উঠলোঃ এই রে! মেয়েটার ওপর নজর পড়েছে! আমি শুধু এই ভয়টাই করেছিলাম। আয় খাবি আয়।

অমরনাথ বললেঃ কেন? কি ভয় করেছিলি?

দয়াল চেপে গেল। বললেঃ না কিছু না। আয়।

অমরনাথ জেদ ধরে বসলোঃ না বললে আমি কিছুতেই যাব না। তুই বল্‌। বল্‌ তুই কি ভয় করেছিলি?

দয়াল একটুখানি হাসলে। হেসে বললে, গেলি ত রুগী দেখতে? রুগী দেখলি, বাস্‌ চলে' এলি! মেয়েটার বিয়ে হলো না হলো তোর কি?

অমরনাথ হেসে উঠলো। বললেঃ ও! এই!

কথা কিন্তু দয়ালের তখনও শেষ হয়নি। সে বলতে লাগলোঃ তুই রাজার ছেলে, রাজার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, তোর কি আর ওই সুরেন চাটুজ্যের মেয়ের দিকে নজর—

চুপ! তুই যা-তা বলিস দয়াল-দা! এই বলে অমরনাথ তাকে যেই থামিয়েছে,

অমনি দেখা গেল, সুমুখে ক্রিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ফটকের সুমুখে বাইক থেকে নামলো সুকুমার।

সুকুমার এসে দাঁড়াতেই অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেঃ কি খবর?

সুকুমার বললেঃ তুমি একবার চট করে এসো অমরদা!

কেন? নতুন আবার কারও—

সুকুমার বললেঃ না। সুরেন চাটুজ্যে কেমন যেন করছে।

দয়াল বললেঃ করুক।

বলেই সে অমরনাথের হাতখানা জোর করে' চেপে ধরে টানতে টানতে বললেঃ আগে খাবি আয়, মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আগে নিজের প্রাণটা বাঁচা, তার পর পরকে বাঁচাবি। আয়।

অমরনাথকে বাধ্য হয়ে যেতে হলো খাবার ঘরে। সুকুমারও সঙ্গে গেল।

খেতে তার বেশি দেরি হলো না। খেয়েই সে সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলো পুরোনো ইস্কুল বাড়িতে—তার নতুন হাসপাতালে!

কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে যে-দৃশ্য সে দেখলে, তা সে দেখবার কল্পনাও করেনি। দেখলে, সুরেন চাটুজ্যের শিয়রের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে মায়া ফুলে ফুলে কাঁদছে।

বিজন বললেঃ এখানে আনবার পর থেকেই কেমন যেন নেতিয়ে পড়লো। কিছুতেই কিছু হলো না।

অমরনাথ মাথা হেঁট করে' ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ইস্কুলের বেঞ্চিগুলো এক করে হাসপাতালে অনেকগুলি বেড্ তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক বেডের ওপর কলকাতা থেকে সদ্য কিনে-আনা নতুন অয়েল ক্লথ বিছানো। আসবাব-পত্র সবই রয়েছে। নেই শুধু রুগী! প্রত্যেকটি 'বেড্' খালি পড়ে আছে। মাত্র একটি 'বেডে' যদি-ই বা একটি মাত্র রুগী এলো, তাকেও সে বাঁচাতে পারলে না।

ডাক্তারি-জীবনে এই তার প্রথম রোগী এবং এই তার প্রথম অকৃতকার্যসতা।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলেঃ মায়ার কি হবে?

অমরনাথ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো।

সুকুমার বললেঃ আমার বাড়িতে নিয়ে যাব?

অমরনাথ মাথা তুলে বললেঃ পারবি?

কেন পারব না? আমার বাড়িতে আমি আর আমার বিধবা দিদি ছাড়া আর ত কেউ নেই।

অমরনাথ বললেঃ সেই ভালো। সৎকারের ব্যবস্থা করে' মায়াকে তুই তোদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখ্। তারপর যা করতে হয় আমি করব।

গ্রামের একটেরে সুকুমারের বাড়ি।

সুকুমারের দিদিকে মায়া আজ কয়েকদিন ধরেই বলছে ঃ আমি এবার যাই দিদি, আমাকে ছেড়ে দাও।

দিদি বলে ঃ যা না পোড়ারমুখী, তোকে কি আমি ধরে রেখেছি নাকি?

কথাটা রাগের কথা। মায়া বলে ঃ না দিদি, আমি সত্যি বলছি।

দিদি বলে ঃ আমিও কি মিথ্যে বলছি নাকি? যেরকম অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছ, তোমার কপালে আরও অনেক দুর্গতি আছে। নইলে ওই আগুনের মতন রূপ নিয়ে একা বাড়িতে গিয়ে বাস করতে চাও! সাহস ত' কম নয় মেয়ের!

মায়া আর কথা বলতে পারে না। দিদির মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আর চোখের কোণ বেয়ে টস টস করে জল গড়ায়।

দিদি বলে ঃ হ্যাঁ কাঁদো! অমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব করে কেঁদে নাও! জীবনে কাঁদবার আর সময় পাবে না! সুকুমার এসে এক্ষুনি হ্যাঁ হ্যাঁ করে খেতে চাইবে, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে তরকারিগুলো কুটে দিলে যে আমার উপকার করা হতো, তা করবে কেন? কাঁদো।

মায়া তাড়াতাড়ি বঁটি নিয়ে তরকারি কুটতে বসলো।

দিদির কথা বলবার ধরণই ওই রকম! রাঁধতে রাঁধতে আবার সে বলতে লাগলো ঃ পৃথিবীর মধ্যে দুঃখু তুই আজ একা পেয়েছিস, নয় মায়া? আর আমরা সব একেবারে সুখে হাবুডুবু খাচ্ছি! আমাদের বাপ্‌ও মরেনি, মাও মরেনি, স্বামীও মরেনি!—ওই সুকুমার এসে গেল।

সাইকেলের ঘণ্টা শুনেই দিদি বুঝতে পেরেছিল সুকুমার এসেছে। সুকুমার একা নয়, সঙ্গে অমরনাথ। মায়াকে দেখবার জন্যে অমনরাথ প্রত্যহ একবার করে আসে।

অমরনাথকে দেখেই দিদি বলে উঠলো ঃ অমরনাথ, তুমি নিয়ে যাও ভাই তোমার মায়াবতীকে।

অমরনাথ বললে ঃ কেন দিদি?

দিদি বললে ঃ না ভাই এখানে ওর মন টিকছে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, তোমাদের সঙ্গে ওকেও কাজে লাগিয়ে দাও, সোমত্ত মেয়ে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে রুগীদের সেবা-টেবা করবে, ভালই হবে।

এই বলে দিদি হাসতে লাগলো।

অমরনাথ মায়ার দিকে তাকিয়ে বললে ঃ কেন, যেতে চাচ্ছ কেন?

মায়া বললে ঃ বাড়ি যাব না?

অমরনাথ বললে ঃ না।

এইখানে থাকবো?

হ্যাঁ।

কতদিন?

আমি যতদিন না কোনও ব্যবস্থা করি।

কি ব্যবস্থা করবে।

আমি যা ভাল বুঝবো। মনে আছে ত'—তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে দিয়ে গেছেন তোমার বাবা?

মনে আছে। কিন্তু—

কিন্তু নয় ; শোনো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। উঠে এসো। মায়া ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

দিদি উনোনের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বললে, গোপনীয়?

অমরনাথও একটুখানি হাসলে।

সসঙ্কোচে মাথা হেঁট করে মায়া তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অমরনাথ বললে ঃ আমার বাবা যে অপরাধ করেছেন, আমি—তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

তোমার বাবা ত কোন অপরাধ করেননি!

অমরনাথ বললে ঃ করেছেন। তোমার বিয়ের রাত্রে তিনি যদি কিছু না বলতেন তাহলে আজ আর তোমার এ দুর্গতি হতো না।

মায়া বললে ঃ যা বলেছেন তা মিথ্যে নয়, সত্যি। সত্যি কথা বললে অপরাধ হয় না।

তা জানি। কিন্তু তোমার বাবার শেষদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, আমার বাবার জন্যেই তোমার বিয়ে হয়নি। আমার বাবাই তোমার সর্বনাশ করেছেন।

মায়া মুখ তুলে অমরনাথের মুখের পানে সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ঃ তা না হয় হলো, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত কেমন করে করবে শুনি?

মায়ার সুন্দর মুখখানির ওপর অমরনাথের দৃষ্টি পড়তেই সে আর সহজে সেদিক থেকে মুখ ফেরাতে পারলে না। না পারলে মুখ ফেরাতে না পারলে জবাব দিতে।

অথচ অমরনাথের চোখে মায়া কি যে লক্ষ্য করলে কে জানে, লজ্জায় সে তক্ষুনি চোখ নামিয়ে নিলে। অমরনাথ চুপ করে আছে দেখে ধীরে ধীরে বললে ঃ বল!

অমরনাথও তেমনি অনুচ্চকণ্ঠে বললে ঃ আমি তোমাকে বিয়ে করব।

হঠাৎ এরকম কথা যে তার মুখ থেকে শুনতে পাবে মায়া তা ভাবেনি। আনন্দে না লজ্জায় জানি না, মায়া আর মুখ তুলতে পারলে না। হেঁটমুখে নীরবে সে তার নিজের কাপড়ের পাড়টা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো।

এমন করে এখানে কতক্ষণই বা সে দাঁড়িয়ে থাকবে। চট করে অমরনাথের দিকে একবার তাকিয়েই সে পিছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু অমরনাথ তাকে যেতে কিছুতেই দিলে না। তার হাত খানা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে ঃ তুমি কি বলতে চাও?

মায়া শুধু একবার মুখখানি তুলে ঠোটের ফাঁকে একটুখানি হেসে চুপ করে রইলো।

অমরনাথ হেসে বললে ঃ বিয়ে তুমি করতে চাও না?

মায়া বললেঃ না।

কেন?

তোমার বাবাকে আমি চিনি।

বাবাকে প্রথমে জানাব না।

যখন জানবেন?

তখন কি আর ফেলতে পারবেন?

মায়া বললেঃ না। এমন করে নিজের সর্বনাশ তোমাকে আমি করতে দেবো না।

অমরনাথ বললেঃ কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। বিয়ে আমি কর্‌বই তাতে আমার যা হয় হবে।

মায়া বললেঃ আমি তাহলে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।

অমরনাথ বললেঃ পাগল হয়েছ?

না, আমি পাগল হইনি, তুমি হয়েছ। যাও, তুমি তোমার কাজ করগে যাও। এই বলে মায়া সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

দিদি বললেঃ হয়ে গেল তোদের গোপনীয় কথা?

মায়া তার মাথাটি ঈষৎ কাৎ করে একটুখানি হেসে বললেঃ হুঁ।

দিদিও মুখ টিপে একটুখানি হাসলে।

মায়া বললেঃ হাসছো যে?

দিদি বললেঃ আমাদের নেমন্তন্ন করবি ত?

মায়া অবাক হয়ে গেল। সর্বনাশ! দিদি তবে শুনেছে নাকি?

দিদি বললেঃ ভালই ত!

মায়া বললেঃ তুমি কি তাই বলছ দিদি?

কেন বলব না? ভালবাসা সহজে হয় না। হয়েছে যদি ত বুড়ো বয়সে ন্যাকামি করিসনি।

মায়া কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বলা তার হলো না। বাধা পড়লো অন্য কারণে।

অমরনাথের দলের একটি ছোকরা ছুটতে ছুটতে এসে সংবাদ দিলে—রায়ের পুকুরে কলেরা রুগীর কাপড়-চোপড় কাচা বন্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্মীকান্তর বোন কিছুতেই শুনছে না, জোর করে কাপড় কাচছে।

অমরনাথ আর সুকুমার দুজনেই ছুটলো রায়ের পুকুরের দিকে।

সেখানে বাধলো এক হুলুস্থুল কাণ্ড!

ভট্‌চাজ-পাড়ার পাশেই রায়ের পুকুর।

লক্ষ্মীকান্ত ভট্‌চাজের এই বোনটা ডাকসাইটে ঝগড়েটে—সেকথা সকলেই জানে। সুকুমার তাকে ভাল করে বুঝিয়ে বললেঃ কাপড় কেচো না দিদি, আমরা এত চেষ্টা করছি—

মেয়েটি নাক সিটকে বলে উঠলো ঃ দিদি কে রে তোর, দিদি কে? ঢং দ্যাখো ছোঁড়ার! বেশ করব কাপড় কাচবো, তোর কি? তোদের বাড়িতে ত কাচতে যাইনি!

অমরনাথ বললে ঃ না তুমি কাপড় এখানে কাচতে পাবে না। সুকুমার, কাপড়গুলো তুলে ফেলে দে।

মেয়েটা দুহাত দিয়ে কাপড় আগলে চীৎকার করে উঠলো ঃ ওরে আমার কে রে! জমিদারের ছেলে আছিস আপনার বাড়িতে আছিস! খবরদার বলছি, আমার কাপড়ে হাত দিয়েছ কি আমি কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে দেবো।

তার চীৎকার শুনে ভট্‌চাজ-পাড়া থেকে লক্ষ্মীকান্ত বেরিয়ে এলো, শিরোমণি এলো, ত্রিলোচন এলো জগন্নাথ এলো।—বলি ব্যাপার কি হে! কাপড় কেচেছে ত হয়েছে কি? ঘাটে ত কাচেনি, আঘাটায় কাচছে।

সুকুমার বললে ঃ তা হলেও জল খারাপ হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীকান্ত বললে ঃ শোনো ত্রিলোচন, শোনো! প্রতিষ্ঠা করা পুকুরের জল— বলে কিনা খারাপ হয়ে যাবে!

ত্রিলোচন বললে ঃ এমনি করে ওঁরা কলেরা বন্ধ করবেন! পুকুরে কাপড়-কাচা বন্ধ করে—শীতলা পূজা বন্ধ করে—

অমরনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, ত্রিলোচন তার কাছে গিয়ে বললে ঃ কেন আর মিছেমিছি ঘাঁটাচ্ছ বাবা, সুরেনের মেয়েটাকে নিয়ে সবাই মিলে ফূর্তি করছ করগে, আবার এ-সব কেন?

অমরনাথ বললে ঃ কি বললেন?

জগন্নাথ এগিয়ে এলো। বললে ঃ মারবে নাকি?

বিজন চীৎকার করে উঠলো। বললে ঃ হ্যাঁ মারব। ও-কথা ফের বলেছ কি মেরেছি।

অমরনাথ হাত তুলে তাকে নিষেধ করলে।

কিন্তু জগন্নাথ থামলো না। বললে ঃ আমাদের জানতে কিছু বাকি নেই বিজে, আমরা সুরেনের মেয়েকেও জানি, সুকুমারের বিধবা বোনটাকেও জানি। থামো, তোমাদের আর দেশ উদ্ধার করতে হবে না, তোমরা বাড়ি যাও, আমাদের ভাল আমরা দেখে নেবো।

সুকুমার আর সহ্য করতে পারলে না। জগন্নাথকে এক ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে এগিয়ে গেল লক্ষ্মীকান্তর বোনের হাত থেকে কাপড়গুলো কেড়ে নেবার জন্যে।

জগন্নাথের হাতে ছিল একটা লাঠি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সেই লাঠি দিয়ে মারলে সে সুকুমারের মাথায়।

সুকুমারও রুখে দাঁড়ালো। মার খেয়ে লাঠিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে—

দিলে জগন্নাথের পিঠের ওপর ঘা-কতক বসিয়ে হা হা করে সবাই মিলে এগিয়ে গেল, কিন্তু সুকুমারকে সহজে কেউ থামাতে পারলে না।

ওদিকে লক্ষ্মীকান্তর বোনের হাত থেকে কাপড়গুলো ছিনিয়ে নিয়ে পুকুরের পাড়ের ওপর বিজন দিলে ছড়িয়ে!

একদিকে লক্ষ্মীকান্তর বোনের প্রাণপণ চীৎকার, আর একদিকে মারামারি।

লোক জড়ো হতে দেরি হলো না। দেখতে দেখতে রায়ের পুকুরের পাড় একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

খবরটা ওদিকে সুকুমারের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোলো। মায়া শুনলে, দিদি শুনলে। কিন্তু শুনলে ঠিক যা ঘটেছে তা নয়। শুনলে ঠিক তার উলটো।

শুনলে, মায়াকে চুরি করে' লুকিয়ে রাখবার জন্যে ভট্‌চাজপাড়ার সবাই মিলে জোট পাকিয়ে লাঠি দিয়ে অমরনাথের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আর তাই নিয়ে সবাই মিলে হৈ হৈ করে চলে গেছে জমিদার শিবনাথবাবুর কাছে নালিশ করতে।

মায়া এই কথা শুনে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। বললে ঃ দিদি, আমি চললুম।

কোথায়?

দেখতে।

তারপর কি যে সে বললে কিছুই শোনা গেল না। ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটলো জমিদারের বাড়ির দিকে।

ওদিকে রায়ের পুকুরের ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল অন্যরকম। আরম্ভ হয়েছিল পুকুরের জলে কলের রোগীরা কাপড় কাচা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীকান্তর বোনের চেঁচামেচি অগ্রাহ্য করে বাদানুবাদ চলতে লাগলো অন্য কথার। ভট্‌চাজপাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই মিলে এসে জুটলো একজায়গায়। গ্রামের স্বাস্থ্য যাক্ ক্ষতি নেই, কিন্তু নীতি যে গেল—এই হয়েছে মুরুব্বিদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা। অমরনাথ আর মায়ার আলোচনাই দেখতে দেখতে প্রচণ্ড হয়ে উঠলো।

অমরনাথ বললে ঃ আমি কি করেছি না করেছি সে আলোচনা পরে করবেন, এখন এই পুকুরে আপনারা কাপড় কাচা বন্ধ করবেন কি-না বলুন!

জগন্নাথ বললে ঃ না করব না।

ত্রিলোচন বললে ঃ এই পুকুরের জলে আমরা বরাবর কাপড় কাচি, এখনও কা'চব, চিরকাল খাই, এখনও খাব।

অমরনাথ বললে ঃ খাও ক্ষতি নেই, কিন্তু কাপড় কাচতে পাবে না।

লক্ষ্মীকান্ত বললে ঃ কাপড়ও কাচব, খাবও।

অমরনাথের আর প্রতিবাদ করবার প্রবৃত্তি হলো না। সুকুমারকে বললে ঃ আয়। চাপরাশী বসিয়ে এদের জোর করে বন্ধ করতে হবে।

এই বলে সে তার দলবল ডেকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, শিরোমণি এগিয়ে এলো। বললেঃ শোনো বাবাজী, তুমি আমাদের উপকারের জন্যেই বলছ বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের বাড়ির মেয়েদের একটা মান-ইজ্জৎ ত আছে। তারা কাপড় কাচবার জন্যে যাবে কোথায়?

ত্রিলোচন বললেঃ কি যে বলছ তুমি শিরোমণি। আসল কথাটা রইলো চাপা, আর তুমি কি-না মান ইজ্জতের কান্না কাঁদছো! এসো তুমি আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে বলছি ওদের কি মতলব। শোনো।

শিরোমণির হাতখানা চেপে ধরে ত্রিলোচন তাকে চড়্ চড়্ করে টানতে লাগলো।

অমরনাথ সুকুমারকে বললেঃ যা তুই বাড়ি যা, খেয়ে দেয়ে বোস, আমি আসছি বাড়ি থেকে। বাবাকে বলে জনকতক চাপ্‌রাশী পাঠিয়ে দিচ্ছি এইখানে।

বিজনকে জিজ্ঞাসা করলেঃ তোমাদের কি খবর?

বিজন বললেঃ বাগ্‌দি-পাড়ায় জেলে-পাড়ায় আর একজনেরও হয়নি।

সবাই ইন্‌জেক্‌সান নিয়েছে?

হ্যাঁ সবাই নিয়েছে।

অমরনাথ ম্লান একটুখানি হেসে বললেঃ নিলেন না শুধু এঁরা না?

বিজন বললেঃ হ্যাঁ, যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলি, তাঁরা নিলেন না।

অমরনাথ বললেঃ যাও, আমি আসছি।

এই বলে সে বাড়ির দিকে চলে গেল।

বাড়ির ফটকে ঢুকতে যাচ্ছে, দেখলে মায়া দাঁড়িয়ে।

অমরনাথ অবাক হয়ে গেল। বললেঃ তুমি এখানে?

মায়া বললেঃ কই, দেখি কোথায় লেগেছে?

লাগবে কেন? কি হয়েছে?

মায়া বললেঃ লুকিয়ো না আমার কাছে। আমি সব শুনেছি।

কি শুনেছে অমরনাথ বুঝতে পারলে। বললেঃ এখানে দাঁড়িয়ে নয়। এসো, এইদিকে চুপিচুপি এসো, আমার ঘরে এসো।

মায়া বললেঃ না, তোমার ঘরে আমি যাব না। কেউ যদি দেখতে পায়, তোমার কেলেঙ্কারির কিছু বাকি থাকবে না।

অমরনাথ বললেঃ আমার কেলেঙ্কারি দেখতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কেলেঙ্কারির কথা ভাবো। এসো।

না, যাব না।

অমরনাথ চোখ রাঙিয়ে জোর করে বললেঃ এসো!

মায়া মুখ টিপে একটুখানি হেসে বললেঃ মার খেয়ে মেজাজ বুঝি গরম হয়ে আছে?

কথা কাটাকাটি করবার জায়গাটি বেশ!

মায়া কিছুতেই শুনবো না। বললে ঃ আমি তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করব।

এমন সময় পেছনে একটা গোলমাল শুনে অমরনাথ তাকিয়ে দেখলে সর্বনাশ, যা ভয় করেছে তাই। ভট্চাজপাড়ার লোকজন সব সদলবলে এইদিকেই আসছে।

অমরনাথ এবার আর মায়ার কোনও কথা শুনলে না। জোর করে তার হাতে ধরে তাকে একরকম টানতে টানতে পেছনের দরজা দিয়ে তাকে তার ওপরের ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই অমরনাথ দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

মায়া বললে ঃ করছ কি?

অমরনাথ বললে ঃ তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। এ কি ছেলেমানুষি জেদ ধরে বসে আছে বল ত? বাবার সঙ্গে কি জন্যে দেখা করবে? কি বলবে?

মায়া বললে ঃ তোমার জেদও ত কম নয়!

আমার আবার কিসের জেদ?

জেদটা যে কিসের মায়া সেকথা খুলে বলতে পারলে না বটে, কিন্তু চোখদুটি তুলে এমনভাবে সে তার মুখের পানে তাকিয়ে একটু হাসলে যে, বুঝতে আর কারও কিছুই বাকি রইলো না।

অমরনাথ বললে ঃ বয়ে গেল! মানুষের উপকার করতে চেয়েছিলাম, তা নিজের ভাল কেউ যদি না বোঝে ত আমার কি!

মায়া বললে ঃ এরকম উপকার আমার আরও অনেকে করতে চেয়েছিল।

আমাকেও কি তাদের দলে ফেলতে চাও?

না। তাদের চেয়ে তুমি একটু বোকা। তোমার মত তারা নিজের সর্বনাশ করতে চায়নি।

এই বলেই মায়া চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

অমরনাথ তার হাত চেপে ধরলে। বললে ঃ যেয়ো না। ওরা তোমাকে এখানে দেখতে পেলে কিছু আর বাকি রাখবে না।

মায়া বললে ঃ দেখতে ওরা আমাকে পেয়েছে।

অমরনাথ বললে ঃ না পায়নি।

হ্যাঁ পেয়েছে।

না পায়নি।

হ্যাঁ পেয়েছে।

তোমার এত ভয়! বলে অমরনাথ হো হো করে হেসে উঠলো।

ওদিকে শিবনাথবাবুর কাছে ভট্‌চাজপাড়ার মুরুব্বিরা এসে এই বলে নালিশ করলে যে, তাদের বাড়ির মেয়েরা বাড়ি থেকে আর বেরুতে পারছে না, রায়ের পুকুরে জল নেবার উপায় নেই, কাপড় কাচবার উপায় নেই, গ্রামের ছোক্‌রারা এমন-সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে, যে, বাড়ির বৌ-ঝির মান ইজ্জৎ আর থাকে না।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ কি করতে হবে?

ত্রিলোচন বললে ঃ অমরনাথকে বারণ করে দিন। সে-ই দলের পাণ্ডা।

শিবনাথবাবু হাসলেন। বললেন ঃ রায়ের পুকুরে কাপড় কাচা সে বন্ধ করেছে তোমাদের ভালর জন্যেই।

লক্ষ্মীকান্ত বললে ঃ আজ্ঞে না, ওদের মতলব ভাল নয়। সেই কথা বলতে গেলাম বলেই ত আমাকে মারলে।

শিবনাথবাবু একটুখানি বিস্মিত হলেন। বললেন ঃ মারলে? তোমাকে?

বারমাস হাঁপানিতে ভুগে ভুগে অস্থিচর্ম্মসার দেহ নিয়ে অনবরত যাকে লাঠি নিয়ে চলতে হয়, সেই লক্ষ্মীকান্তর গায়ে কেউ হাত তুলতে পারে শিবনাথবাবু প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি।

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কে মারলে?

লক্ষ্মীকান্ত বললে ঃ সুকুমার। অমরনাথের বন্ধু।

শিবনাথবাবু শিরোমণির মুখের পানে তাকালেন।

শিরোমণি মাথা নেড়ে বললে ঃ সত্যি। আমি দেখেছি।

এবার আর অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। শিরোমণির কথা তিনি বিশ্বাস করেন।

কিন্তু মারলে কেন?

লক্ষ্মীকান্ত বললে ঃ সেই কথা বলবার জন্যেই ত আমরা এসেছি।

কি কথা বল!

কিন্তু তাঁরই ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ—লক্ষ্মীকান্ত যত সহজে বলবে ভেবেছিল তত সহজে বলতে পারলে না, মুখে যেন আটকে যেতে লাগলো। তবু সে শেষ পর্যন্ত শিবনাথবাবুকে এই কথা জানিয়ে দিলে যে, গ্রামের ছোক্‌রাদের সঙ্গে মিশে অমরনাথের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে, সুকুমারের বিধবা বোন, আর সুরেনের মেয়ে মায়াকে নিয়ে যে-কাণ্ড সে আরম্ভ করেছে তা আর মুখে আনবার নয়। এইবার নজর পড়েছে ভট্‌চাজপাড়ার ওপর। এবং লক্ষ্মীকান্তর বোনকে পুকুরের ঘাটে একা পেয়ে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্য তাদের—

থাক, আর বলতে হবে না।

শিরোমণি বললে ঃ হ্যাঁ, দিন একটু শাসন করে! সুরেনের মেয়েকে নিয়ে এই যে ব্যাপারটা—আর যেই করুক, আপনার ছেলে অমরনাথের শোভা পায় না।

ত্রিলোচন, মহীতোষ, মনোহর,—সবাই এ-কথায় সায় দিলে। গ্রামের এতগুলো লোক যখন একসঙ্গে এসে একই কথা বলছে তখন সত্য এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু আছে।

শিবনাথবাবুর আত্ম-সম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। মুখ-চোখ তাঁর লাল হয়ে উঠলো। গম্ভীরভাবে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোথায় সে?

লক্ষ্মীকান্ত বললে ঃ এলো ত আমাদের আগে-আগে। বাড়িতেই আছে হয়ত।

মায়াকে কেউ তাহলে দেখেনি। কিম্বা দেখলেও হয়ত দূর থেকে চিনতে পারেনি।

শিবনাথবাবু ডাকলেন ঃ অমরনাথ!

সে তখন মায়াকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর ডাক সে শুনতে পেলে না।

শিবনাথবাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। সঙ্গে গেল ত্রিলোচন, শিরোমণি, জগন্নাথ আর লক্ষ্মীকান্ত। আর সব নীচে দাঁড়িয়ে রইলো।

শিবনাথবাবু যে এমন অতর্কিতে অমরনাথের সন্ধানে ওপরে উঠে আসবেন অমরনাথ বা মায়া—দুজনের মধ্যে কেউই তা বুঝতে পারেনি।

অমরনাথ!

বলে শিবনাথবাবু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

অমরনাথ ও মায়া মুখোমুখি দাঁড়িয়ে!

এতখানি অপ্রস্তুত শিবনাথবাবুকে তার পরম শত্রুও কোনোদিন করতে পারেনি।

লক্ষ্মীকান্ত সকলের আগেই বলে উঠলো ঃ দেখুন, আমি যা বলেছি সত্যি কি-না।

শিরোমণি, ত্রিলোচন, জগন্নাথ—সবাই অবাক!

শিবনাথবাবু কি যেন একবার বলতে গেলেন, কিন্তু গলায় তাঁর কথাটা যেন আটকে গেল। একটি কথাও তিনি বললেন না। রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

যে-মায়া শিবনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এতদূর ছুটে এলো, শিবনাথবাবুকে কত কথা যার বলবার ছিল, সেও হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইলো ঠিক বোবার মত।

ওদিক থেকে শিবনাথবাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেল ঃ দয়াল! দয়াল!

দয়াল এতক্ষণ বাড়িতে ছিল না, ফিরে এসেই বাড়িতে গোলমাল দেখে হন্তদন্ত হয়ে উপরে উঠে এলো।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ ওদের বেরিয়ে যেতে বল, আমার বাড়ি থেকে ওদের বেরিয়ে যেতে বল!

দয়াল প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলে না। হ্যাঁ করে' অবাক হয়ে শিবনাথবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

শিবনাথবাবু বললেনঃ দাঁড়িয়ে রইলি কেন হতভাগা! অমরনাথকে বল্— আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। বল—আমি আর ওর মুখ দেখতে চাই না। আমি জানবো—

শিরোমণি বললেঃ থামুন। আপনি এত উত্তেজিত হবেন না।

শিবনাথবাবু বললেনঃ উত্তেজিত হব না। না? তাহলে কি করব? যাও তোমরা সব চলে যাও আমার সুমুখ থেকে। আমায় একটুখানি একলা থাকতে দাও।

দয়াল তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। শিবনাথবাবু তার মুখের পানে তাকিয়ে বললেনঃ 'তোমারই মানুষ-করা ছেলে দয়াল, আজ এই বুড়ো বয়সে আমার মুখ পুড়িয়ে দিলে। যাও—বল আমি সেরকম বাপ নই। আমি সব পারি, আমি সব সহ্য করতে পারি। জানবো—আমার ছেলে নেই, আমার কেউ নেই।

ভট্চাজপাড়ার ভদ্রলোকেরা একে একে চলে গেল।

দয়াল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, শিবনাথবাবু চীৎকার করে উঠলেনঃ এখনও দাঁড়িয়ে রইলি? বলতে তোর কষ্ট হচ্ছে? আমি নিজে বলব।

তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন।

দয়াল বললেঃ আমি যাচ্ছি।

বলেই সে অমরনাথের ঘরের দরজায় এসে দেখল কেউ নেই।

ডাকলেঃ অমরনাথ! খোকা! খোকা!

একটা চাকর দাঁড়িয়েছিল দোরের পাশে। বললেঃ সেই মেয়েটির সঙ্গে চলে গেলেন।

শিবনাথবাবুর কথাগুলো সে শুনেছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু মেয়েটি কে? দয়াল কিছুই যে বুঝতে পারছে না!

এমন সময় শিবনাথবাবুর প্রিয় পাত্র জনার্দন এলো। দয়ালকে জিজ্ঞাসা করলেঃ বাবু কোথায়?

দয়াল সে-কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেঃ খোকাকে দেখলে?

জনার্দন বললেঃ দেখলুম বই-কি!

কোথায় দেখলে?

দেখলুম—সুরেনের মেয়েটার সঙ্গে যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে?

জনার্দন বললেঃ যেখানেই যাক্ না বাবা, তাতে হয়েছে কি?

দয়াল বললেঃ বাবু যে ওকে রেগে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে।

জনার্দন হাসতে হাসতে বললে ঃ তুইও যেমন! লোকজনের সাক্ষাতে ওরকম বলতে হয়!

দয়াল বললে ঃ বাবুর রাগ তুমি জান না বাবু, খোকা কোনদিকে গেল? আমি ওকে ফিরিয়ে আনি।

জনার্দন তাকে যেতে দিলে না। বললে ঃ দূর বোকা! জমিদারের ছেলে—একটু আমোদ আহ্লাদ করতে চায়, করুক না! আরে, সুরেনের মেয়েটা ত, না আর-কেউ? বাবুর রাগ পড়ে যাবে, অমরনাথও ফিরে আসবে, সবই হবে বাবা, তুই চেঁচাসনে, তোর সবই বাড়াবাড়ি।

শিবনাথবাবু ডাকলেন ঃ দয়াল!

দয়াল বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

শিবনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

জনার্দন ঘরে ঢুকলো। বললে আমার সঙ্গে।

এসো!—শিবনাথবাবু বললেন ঃ শুনলে জনার্দন? আমার ছেলের কাণ্ডটা শুনলে?

জনার্দন বললে ঃ কয়েকদিন থেকেই ত শুনছি।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ কি শুনছো?

জনার্দন বললে ঃ মায়া আর অমরনাথের কথা।

অথচ আমাকে বলনি?

জনার্দন বললে ঃ এমন কি অপরাধ করেছে অমরনাথ, যে তোমার কাছে নালিশ করতে হবে? তবে জমিদারের ছেলে, এরকম লোক জানাজানি না করে, একটু গোপনে করলেই হতো।

এই বলে জনার্দন হো হো করে হেসে উঠলো।

শিবনাথবাবু জনার্দনকে এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। বললেন ঃ হেসো না জনার্দন, তুমি থামো।

জনার্দন থামলো, শিবনাথবাবুর গুম হয়ে চুপ করে রইলেন, কিন্তু দয়াল কিছুতেই পারলে না চুপ করে থাকতে।

কিছুক্ষণ পরে সে ভয়ে ভয়ে শিবনাথবাবুর কাছে গিয়ে বললে ঃ যাব?

শিবনাথবাবু বললেন ঃ কোথায়?

খোকার কাছে। রাগ করে' গেল হয়ত ; ফিরিয়ে আনি।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ তা হলে তুইও যা, তুইও বেরো আমার বাড়ি থেকে।

বাধ্য হয়ে দয়ালকে বাড়িতেই থাকতে হলো।

কিন্তু দয়াল সে তাকে নিজের হাতে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। বাড়িতেই বা সে থাকে কেমন করে?

দুপুরের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লো! ক্রমে সন্ধ্যা হলো।

অমরনাথ এলো না।

আবার সে মরীয়া হয়ে বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলে ঃ যাব?

শিবনাথবাবু গম্ভীরভাবে মুখ তুলে চাইলেন। বললেন ঃ উ।

কথাটা তিনি শুনতে পাননি। সেই থেকে একই জায়গায় একা একা বসে বসে কি যেন তিনি ভাবছেন!

দয়াল বললে ঃ খোকা এখনও বাড়ি ফিরলো না।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ এ সময় ফেরে কোনোদিন?

তাও ত বটে! দয়াল জবাব দিতে পারলে না।

রাত্রি হলো। প্রত্যহ যে-সময় সে বাড়ি ফেরে, সে সময়টাও উত্তীর্ণ হয়ে গেল। অমরনাথ ফিরলো না।

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। এত রাত পর্যন্ত বাইরে সে কোনদিন থাকে না। দয়াল আর কতক্ষণ তার খাবার আগলে বসে থাকবে?

পল্লীগ্রামের রাত্রি। শিবনাথবাবু শুয়ে পড়েছেন। দয়াল কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্ধকার পথে হোঁচটা খেতে খেতে দয়াল প্রথমেই গিয়ে দাঁড়ালো সুরেনের বাড়ির দরজায়। দরজা বন্ধ। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দয়াল ডাকলে ঃ খোকা! খোকা!

বাড়ির ভেতর মানুষ আছে বলে মনে হলো না। দয়ালের গলার আওয়াজ পেয়ে দূর থেকে কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো।

দয়াল বেশি জোরে ডাকতেও পারলে না। আশ-পাশের বাড়ির লোক যদি তার ডাক শুনে জেগে ওঠে! কি সে বলবে তাদের? এত রাত্রে সুরেনের বাড়িতে খোকাকে ডাকতে আসার মানে হয়ত অন্যরকম হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে কাজ নেই। দয়াল হাত বাড়িয়ে দরজার শিকলি খুলতে গিয়ে দেখলে, দরজায় তালা বন্ধ। তাহলে কেউ নেই এ-বাড়িতে?

দয়াল জানে অমরনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু—সুকুমার।

গ্রামের এক ধারে সুকুমারের বাড়ি। দয়াল তারই বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো।

পথের ধারে পুরনো ইস্কুল-বাড়ি,—অমরনাথের হাসপাতাল। দেখলে, ইস্কুলের বাইরের চালায় টিম টিম করে' একটা আলো জ্বলছে। জিনিষপত্র আছে বলে লখু বাগ্‌দি চালার একপাশে রাত্রে শুয়ে শুয়ে পাহারা দেয়। দয়াল দেখলে, এত রাত্রেও লখু সেইখানে বসে বসে তামাক টানছে। জিজ্ঞাসা করলে ঃ এখনও ঘুমোসনি লখু?

লখু বললে ঃ ঘুমোতে আর দিচ্ছে কই দাদা! ওই শোনো না, সুজন মারা গেছে, সুজনের বৌ কেঁদে কেঁদে আমার ঘুমটা দিলে মাটি করে।

বাগ্‌দিপাড়া কাছেই। এত রাত্রে সুজন বাগ্‌দির বৌ-এর একটানা কান্নার শব্দটা দয়ালও আর সহ্য করতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে ঃ খোকা এসেছিল?

লখু বললেঃ না। তামাক খাবে নাকি?

দয়াল ঘাড় নেড়ে বললেঃ উঁহু!

বলেই সে হন্ হন্ করে এক রকম উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে দাঁড়ালো সুকুমারের দরজায়। ডাক্‌লেঃ খোকা! খোকা! অমরনাথ!

লণ্ঠন হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো দিদি।

দরজা খুলতেই দয়াল জিজ্ঞাসা করলেঃ খোকা আছে?

দিদি তার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসলে। বললেঃ এসো, তুমি বাড়ির ভেতরে এসো দয়াল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

দয়াল বললেঃ খোকা আছে কি-না বল দিদি আগে, তারপর আমি বসবো।

দিদি বললেঃ বুড়ো-মিন্‌সেকে বুঝিয়ে বলতে পারলে না দয়াল? সুরেন চাটুজ্যের মেয়ে মায়া হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল ত নয়! ছেলের সঙ্গে ভালবাসা যদি হয়েই থাকে, কি এমন অন্যায়টা হয়েছে শুনি?

দয়াল জিজ্ঞাসা করলেঃ কোথায় তারা?

দিদি বললেঃ তা আমি কেমন করে জানবো দয়াল! এই দ্যাখো চিঠি!

দিদি তার আঁচলের খুঁট থেকে একখানি চিঠি বের করে দয়ালের হাতে দিয়ে বললেঃ পড়তে জানো ত?

দয়াল বললেঃ না দিদি, তুই পড়্।

দিদিই পড়ে' দয়ালকে শুনিয়ে দিলে।—প্রকাণ্ড চিঠি। মায়া তার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি বাড়ি-ঘর সবই দিয়ে গেছে দিদিকে। লিখেছে, তুমি ঠিকই বলেছ দিদি, ভালবাসা যার-তার সঙ্গে হয় না। যদি-বা হলো, তাকে হেলায় হারিয়ে সারাজীবন কাঁদতে আর পারব না। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে ত' হয়! তাই তিনি বিসর্জন দিলেন তাঁর রাজত্ব, তাঁর যথাসর্বস্ব, আর বিসর্জন দিলাম লোকলজ্জা।

অমরনাথ লিখেছে সুকুমারকে। গ্রামের জন্যে কি করতে হবে উপদেশ দিয়ে শেষে জানিয়েছেঃ দুজনেই আমরা গ্রাম ছেড়ে হয়ত বা চিরজীবনের জন্যেই চলে গেলাম। কোথায় যাচ্ছি নিজেরাই জানি না। দয়ালদার সঙ্গে দেখা হলে তাকে বোলো—

দিদি থামতেই দয়াল জিজ্ঞাসা করলেঃ তারপর?

দিদি বললেঃ এই পর্যন্ত লিখে আর-কিছু লিখতে পারেনি। এই চিঠি, আর মায়ার বাড়ির চাবিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে চাষাদের একটা ছোট ছেলের হাত দিয়ে।

লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল, বৃদ্ধ দয়ালের দুচোখ বেয়ে দর্ দর্ করে জল গড়াচ্ছে।

বছরখানেক পরে দেখা গেল, অমরনাথ আর মায়া বহু দূরের একটি গ্রামে বাস

করছে। পুরোহিত ডেকে মন্ত্র পড়ে বিবাহ তাদের হয়েছে কি-না, জানি না, কিন্তু তারা বাস করছে ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মত।

কেমন করে' তারা এ-গ্রামে এলো সে-সব অনেক কথা। সংক্ষেপে বলতে হলে শুধু এইটুকু বলতে হয়—কোথায় কোন্ রেল-ষ্টেশন থেকে এই গ্রামের হরিমোহনবাবু এখানে তাদের নিয়ে আসেন। নিয়ে অবশ্য আসেন নিজের স্বার্থের খাতিরে। হরিমোহনবাবুর অবস্থা যেমন ভাল সংসারও তেমনি বিরাট। সংসারে অসুখ-বিসুখ তাঁর লেগেই থাকে, অথচ গ্রামে ডাক্তার নেই। শহর থেকে অনেক টাকা খরচ করে প্রায়ই তাঁকে ডাক্তার আনতে হয়। তাই তাঁর অনেকদিনের সাধ, ভাল একজন ডাক্তার পেলে নিজের খরচে গ্রামে তাঁর ঘর-বাড়ি করে' দেবেন।

মানুষ ভাবে যা, অনেক সময় হয়ও তাই। অমরনাথকে পেয়ে হরিমোহনবাবুর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। অমরনাথের জন্যে ছোট্ট একখানি ঘর তৈরি করে দিয়েছেন, ছোট্ট একটি ডাক্তারখানা করে দিয়েছেন। অমরনাথ মনের আনন্দে ডাক্তারি করছে।

অমরনাথ আর মায়াকে দেখলে এমন মনে হয় না যে, জীবনে এদের কোন দুঃখ আছে।

গ্রামের লোকের কারও কোন অসুখ হলে অমরনাথকে ডাকতে হয় না, নিজে গিয়ে সে তার চিকিৎসা করে আসে। যতক্ষণ সে সেরে না ওঠে ততক্ষণ তার আর স্বস্তি থাকে না। সেরে না উঠলে মনে হয়, অপরাধ যেন তারই।

মায়া সেই ছোট ঘরখানির ভেতর সযত্নে তার সংসার পাতিয়েছে। নিজের হাতে রান্না করে, ঘরকন্নার কাজকর্মের এতটুকু কোথাও ত্রুটি হয় না, মুখে যেন হাসি তার লেগেই আছে! হেসে গেয়ে আনন্দে দিন কাটায়। জীবনে একমাত্র ব্রত যেন তার দুঃখকে সে তাদের পাশ ঘেঁসতে দেবে না, আর স্বামীকে আনন্দে রাখবে।

মুখে তার সদাসর্বদা হাসি আর গান দেখে অমরনাথ এক একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে ঃ জীবেন কি তোমার কোন দুঃখু নেই মায়া?

মায়া হাসতে হাসতে বলে ঃ কেন, দুঃখু না হলে কি তোমার ভাল লাগছে না?

এ-কথার জবাবে অমরনাথ কি আর বলবে, বাধ্য হয়ে তাকে চুপ করে থাকতে হয়।

মায়া বলে ঃ দুঃখ কষ্টের অভাব এ পৃথিবীতে নেই। চাও ত অনেক দুঃখু তোমায় আমি এনে দিতে পারি। চাও নাকি?

অমরনাথ শুধু অবাক হয়ে তার সুন্দর মুখখানির দিকে তাকায় আর হাসে!

মায়ার কেমন যেন লজ্জা করতে থাকে। লজ্জাটা ঢাকবার জন্যে আর একটুখানি কাছে এগিয়ে এসে বলে ঃ হাসছো যে অমন করে? জবাব দাও!

অমরনাথ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যে জবাব দিলে কে জানে, মায়া বললে ঃ এই জবাব?

বলেই সে হেসে একটুখানি সরে দাঁড়ালো।

অমরনাথ বললেঃ তোমাকে পেয়ে সত্যি আমি সব দুঃখু ভুলে গেছি মায়া।

মায়া বললেঃ ঠিক তার উলটো তোমাকে পেয়ে আমি আমার দুঃখু ভুলেছি।

এমনি করেই তাদের দিন কাটে।

এমনি করে আরও একটি বছর কেটে গেল।

এক বছর পরে দেখা গেল, আনন্দ তাদের যেন আরও বেড়েছে। মায়া তখন সন্তান-সম্ভবা।

মায়া বলেঃ বল ত ছেলে হবে না মেয়ে হবে?

অমরনাথ বলেঃ আমি ত জ্যোতিষী নই। আমি ডাক্তার।

তারপর থেকে কি যেন একটা কথা বলবার জন্যে মায়া শুধু সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু যতবার সে বলবার চেষ্টা করে ততবারই যেন কথাটা তার গলায় আটকে যায়। বলতে আর কিছুতেই পারে না!

একবার বললেঃ তোমাকে একটা কথা বলব।

অমরনাথ বললেঃ বল।

মায়া হাসতে হাসতে কাজে চলে গেল। বলল ঃ পরে বলব, এখন না।

তার পর থেকে অমরনাথ অনেকবার জিজ্ঞাসা করলেঃ তোমার কী এমন কথা গো—বলব বলব করেও বলছ না?

মায়া শুধু ম্লান একটুখানি হেসে বললেঃ রাত্রে বলব।

রাত্রি হলো।

দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্রি। উঠানে ফুলের গাছে বিস্তর ফুল ফুটেছে। তারই একপাশে বেদীর মত সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো একটি গোল চত্বর অমরনাথ নিজের হাতে তৈরি করেছিল। পল্লীগ্রামে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় প্রত্যহ তারা দুজনে এইখানে শুয়ে শুয়ে গল্প করে।

সেদিনও অমনরাথ সেইখানে শুয়েছিল। মায়া চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

অমরনাথ বললেঃ এবার বল তোমার গোপনীয় কথা! আর আমি না শুনে থাকতে পারছি না।

মায়া বসলো। বললেঃ গোপনীয় নয়।

তবে বলতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

মায়া বললেঃ তোমার মনে কষ্ট হবে বলে।

অমরনাথ বললেঃ তা হোক, তুমি বল।

মায়া তখন বললেঃ আমার যদি একটি ছেলে হয়, সে ছেলেকে তোমার বাবা বংশধর বলে স্বীকার করবেন?

অমরনাথ হেসে বললেঃ এই কথা?

মায়া বললেঃ এটা কি হাসির কথা হলো?

অমরনাথ বললেঃ বাবা স্বীকার না করলেও ভগবান ত স্বীকার করবেন।

মায়া চুপ করে রইলো।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেঃ কি ভাবছো?

মায়া বললেঃ ভাবছি তুমি নিজে ত বাবার কাছে মুখ দেখাবে না। বলছ, ছেলে একটু বড় হলে আমি তাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

অমরনাথ বললেঃ বাবাকে তুমি চেনো না মায়া, বাবা সেদিক দিয়ে বড় নিষ্ঠুর, বড় শক্ত। ছেলেকে হয়ত তৎক্ষণাৎ অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।

মায়া বললেঃ পারবেন? বোধ হয় পারবেন না। মানুষ ত!' অমরনাথ এইবার চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

মায়া কিছুক্ষণ তার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে বললেঃ হয়েছে ত? এই জন্যেই কথাটা তোমাকে বলতে চাইনি।

অমরনাথ হেসে বললেঃ কি হয়েছে?

মায়া বললেঃ কি যে হয়েছে তা আমি জানি। আমাকে পেয়েছ বটে, কিন্তু তার জন্যে যে দাম তোমাকে দিতে হয়েছে, অত দাম আমার নয়। এইজন্যেই তোমাকে আমি বারম্বার—

অমরনাথ হাত বাড়িয়ে মুখখানা তার চেপে ধরলে। বললেঃ এখনও সেই কথা?

এমনি করে' অনেক কষ্টে অবান্তর অনেক কথার অবতারণা করে ব্যাপারটাকে তারা চাপা দিলে। কিন্তু যে-প্রেম মানুষের জীবনকে এমন ঐশ্বর্যশালী করে তোলে, সেই দুর্লভ প্রেমকে আমাদের সমাজ এমন করে অস্বীকার কেন করলে—এ প্রশ্নের মীমাংসা তারা কিছুতেই করতে পারলে না।

প্রসবের দিন যতই আসন্ন হয়ে আসে, অমরনাথ ততই মায়াকে ঘন-ঘন জিজ্ঞাসা করেঃ ভয় পাচ্ছ ত'?

প্রথম সন্তান, মায়ার ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে ভয় পেলেও মুখে সে তা প্রকাশ করে না। বলেঃ ভয় কেন পাব? আমি ডাক্তারের স্ত্রী, আমার আবার ভয় কিসের।

এই বলে সে হাসতে থাকে।

কিন্তু হাসি তার সত্যিই একদিন বন্ধ হয়ে গেল। সকাল থেকে প্রসব বেদনায় অস্থির হয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো।

অমরনাথ কোথাও গেল না। বাড়িতেই বসে রইলো।

বিকেল বেলা দুজন রুগী বিদেয় করে যেই সে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো শ্রীনাথ দাস।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেঃ কি রে শ্রীনাথ, কাঁদছিস কেন?

শ্রীনাথ বললেঃ বড় বিপদে পড়েছি দাদাঠাকুর।

এই বলে' সে হাউমাউ করে' কাঁদতে লাগলো।

অমরনাথ বললেঃ কি বিপদ বল্! কাঁদলে আমি বুঝব কেমন করে?

শ্রীনাথ তখন কান্না থামিয়ে বললেঃ আমার বৌ মরে যাচ্ছে বাবু, আপনি একবার আসুন!

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেঃ কেন রে, কি হয়েছে?

শ্রীনাথ চোখের জল মুছে বললেঃ কাল থেকে কাটা ছাগলের মত ছটফট করছে বাবু, ছেলে হবে।

অমরনাথ ম্লান একটু হাসলে। বললেঃ ছেলে হবে?

হ্যাঁ দাদাবাবু। ছেলে চাই না দাদাবাবু, বৌটাকে বাঁচিয়ে দিন। কষ্ট আর চোখে দেখতে পারছি না।

অমরনাথ ঘরের ভেতরের দিকে একবার তাকালে। মায়ার অবস্থাও প্রায় তেমনি। বললেঃ এদিকে আমার বাড়িতেও যে—

কথাটা তার শেষ হলো না। ভেতর থেকে মায়ার গলার আওয়াজ শোনা গেল। বললেঃ যাও।

অমরনাথ বললেঃ যাব?

মায়া বললেঃ নিশ্চয় যাবে। বেচারা গরীব, এত করে ডাকছে, যাওয়া তোমার উচিত!

—তোমার কি হবে?

—আমার জন্যে ভেবো না, আমার কিছু হবে না। দাই রয়েছে!

কথাগুলো সে কেটে কেটে অতি কষ্টে উচ্চারণ করলে।

অমরনাথ তবু ইতস্তত করছিল।

মায়া আবার বললেঃ বসে থেকো না, তুমি যাও।

অমরনাথ বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে তার ডাক্তারখানায় গিয়ে ঢুকলো। ব্যাগের মধ্যে ডাক্তারি সরঞ্জাম ঠিক করাই ছিল।

শ্রীনাথ বললেঃ ব্যাগটা আমি নিয়ে যাই দাদাবাবু।

ব্যাগটা শ্রীনাথের হাতে তুলে দিয়ে তার পিছু পিছু অমরনাথ ঘর থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে গেল।

মায়ার কথা ভাবতে ভাবতেই অমরনাথ এসেছিল শ্রীনাথ দাসের বাড়ি। কিন্তু শ্রীনাথের বৌয়ের অবস্থা যখন সে দেখলে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন, তখন আর তার কারও কথা মনে রইলো না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গিয়ে ডাক্তার পড়লো রুগী নিয়ে!

তিন ঘণ্টা প্রাণপণ পরিশ্রমের পর অমরনাথ কৃতকার্য হলো।

শ্রীনাথ দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। অমরনাথ বললে ঃ ছেলে হয়েছে।

কিন্তু ছেলেটা বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

বেঁচে রয়েছে কিন্তু কাঁদছে না।

শ্রীনাথ এতক্ষণ বলছিল—ছেলে মরুক্‌, কিন্তু আমার বৌটাকে এখন বাঁচিয়ে দিন দাদাবাবু।

এখন বলতে লাগলো ঃ বৌটা বেঁচেছে এইভার ছেলেটাকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে দিন।

অমরনাথ বললে ঃ আরও খানিকটা জল গরম করে নিয়ে আয়।

গরম জলের গামলা এলো। অমরনাথ চেষ্টা করতে লাগলো ছেলেটাকে কাঁদাবার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর ছেলেটা কাঁদলো।

যাক, আর কোন ভয় নেই।

অমরনাথের মুখে হাসি ফুটলো।

শ্রীনাথ আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়ে কি বলে যে অমরনাথকে ধন্যবাদ জানাবে ঠিক করতে পারলে না।

ঠিক এমনি সময়ে চাষাদের একটি ছেলে এসে অমরনাথকে বলবে ঃ আপনি একবার বাড়ি যান ডাক্তারবাবু।

এতক্ষণে অমরনাথের মনে পড়লো নিজের বাড়ির কথা। ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলে ঃ কেনরে? কি খবর বল দেখি?

ছেলেটা বললে ঃ জানিনা বাবু, দাইবুড়ি আমাকে বললে, ছুটে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে দে শ্রীনাথ দাসের বাড়ি থেকে।

অমরনাথ তাড়াতাড়ি তার জামাটা গায়ে দিয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললে ঃ আমি চললুম শ্রীনাথ। তোমার আর কোনও ভয় নেই।

এই বলে সে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

ছুটতে ছুটতে নিজের বাড়িতে এসে দেখে কচি একটি সদ্যজাত শিশুকে কোলে নিয়ে বুড়ি দাই দরজার কাছে চুপ করে বসে আছে।

অমরনাথ জিজ্ঞাস করলে ঃ কি হয়েছে? ছেলে না মেয়ে?

দাই বললে ঃ ছেলে।

অমরনাথ খুশি হয়ে হাসতে হাসতে ছেলের দিকে একবার তাকিয়েই ডাকলে ঃ মায়া!

দাই বললে ঃ হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে অমরনাথ কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে, মেঝের এককোণে মায়া শুয়ে আছে।

অমরনাথ আবার ডাকলে ঃ মায়া!

কে জবাব দেবে?

মেঝে থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে তার মুখের কাছে তুলে ধরতেই দেখলে চোখ দুটি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, নিসাড় নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহখানা মাত্র পড়ে রয়েছে, মায়া নেই।

অমরনাথ থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে সেইখানেই বসে পড়লো।

ওদিকে দাই তখন আপনমনেই বলে চলেছে ঃ এমন যে হবে তা আমি বুঝতে পারিনি বাবু। আপনাকে যে ডাকতে পাঠাব, তা একটা লোক পেলাম না। উনিও জানতে পারেনি মরে যাবেন, হঠাৎ এমনি হয়ে গেল।

অমরনাথ তখন মায়াকে জড়িয়ে ধরে হো হো করে কেঁদে উঠলো।

অমরনাথকে যিনি এ-গ্রামে এনেছিলেন, সেই হরিমোহনবাবু নিজে এসে অনেক বুঝিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। মায়ার মৃতদেহের সৎকার হয়ে গেল।

এবার এই ছেলেটাকে নিয়ে কি করবে সে?

হরিমোহনবাবুর মেজ-বৌ-এর সন্তানাদি হয়নি। তিনি বললেন ঃ তুমি ভেবো না অমরনাথ, ছেলেটিকে আমার মেজ বৌমা মানুষ করবে।

অমরনাথ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলো।

অমরনাথের দু'দিনের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সেই বাড়ি, সেই ডাক্তারখানা, সেই আসবাবপত্র, মায়ার প্রত্যেকটি কাপড়জামা, সংসারের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বস্তু মায়া ঠিক যেমন করে নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছিল সবই ঠিক তেমনি রয়েছে নেই শুধু মায়া?

অমরনাথের পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছুই আর তার ভাল লাগছে না। বললে ঃ ছেলেটা রইলো হরিমোহনবাবু, আমি চললাম এখান থেকে কিছুদিনের জন্য।

কোথায় যাবে?

তা কেমন করে বলব!

এই বলে' সে সত্যি-সত্যিই গ্রাম ছেড়ে একদিন চলে গেল। কোথায় গেল কাউকে কিছুই বলে গেল না।

অমরনাথ সেই যে গেল, গ্রামে আর ফিরলো না। কোথায় কেমন করে যে দিন কাটছে কোন খবরই কেউ জানে না।

তিনটি বৎসর পার হয়ে গেছে।

ওদিকে অমরনাথের আশা শিবনাথবাবু একরকম ছেড়েই দিয়েছেন।

দয়াল অনেক করে তাঁকে বুঝিয়েছে, কিন্তু তাঁর মন কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করেনি।

শিবনাথবাবু তাঁর অন্তরের দুর্বলতা প্রকাশ করতে চান না। বলেন ঃ না আসুক

হতভাগা! জানবো—আমাদের বংশে এইখানেই লোপ পেয়ে গেল। ভগবানের যদি সেই ইচ্ছেই হয়ে থাকে ত' তাই হোক।

কিন্তু বাইরে প্রকাশ না করলেও, একমাত্র পুত্রের অভাবে বুকের ভেতর তাঁর খাক হয়ে গেল। দিবারাত্রি ভাবেন—কেন এমন হলো! কার অভিশাপে?

এক-একবার ভাবেন, হয়ত-বা সুরেনের মেয়েটিকে এমন করে না তাড়িয়ে তার সঙ্গেই অমরনাথের বিয়ে দিলে ভাল হতো। কিন্তু তাঁর মনের সংস্কার থেকে মুক্ত তিনি কিছুতেই হতে পারেন না।

মনে শান্তি নেই, গৃহে শৃঙ্খলা নেই, বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, তাঁর একমাত্র সঙ্গী যে হোমিওপ্যাথী তাকেও তিনি আজকাল পরিত্যাগ করেছেন।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন তাঁর কি খেয়াল হলো, বললেন ঃ দয়াল, আমি আর এখানে থাকবো না।

দয়াল জিজ্ঞাসা করলে ঃ কোথায় যাবেন?

শিবনাথবাবু বললেন ঃ কাশী। সেইখানেই বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেবো।

কিন্তু তার পরের দিনই আবার বললেন ঃ না দয়াল, কাশী নয়, কলকাতায় যাই চল।

মনেরও কোনও স্থিরতা নেই।

তবে এ-গ্রাম ছেড়ে কোথাও যে তিনি যাবেনই, সে কথা সত্যি।

দয়াল বললে ঃ আমাকে দিন-কয়েকের ছুটি দিন বাবু, আমি একবার মামার বাড়ি থেকে ফিরে আসি।

কেন?

দয়াল বললে ঃ মামার বাড়িতে কিছু জমি-জমা পেয়েছিলাম, বেচে দিয়ে জ্বালা-জঞ্জাল চুকিয়ে দিয়ে আসি।

তাই যা।

শিবনাথবাবু তাকে ছুটি দিলেন।

দয়াল গেল জ্বালা-জঞ্জাল চুকোতে। আর এই জঞ্জাল চোকাতে গিয়েই সে আর এক জঞ্জাল সঙ্গে নিয়ে এলো।

সে এক ভারি মজার ঘটনা।

এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা সে কল্পনাও করেনি।

ট্রেনে চড়ে দয়াল তার মামার বাড়ি যাচ্ছিল। তারকেশ্বর হয়ে যেতে হয়। চৈত্র মাস। গাজনের সময়। দয়াল ভাবলে—বাবার মন্দিরটা একবার ঘুরেই যাওয়া যাক্। চারিদিকে মেলা বয়েছে। লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দয়াল লোকজনের ভিড় ঠেলে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল! সুমুখে একটা লোক একজন যাত্রীর পকেট কেটেছে। হৈ হৈ করে' গোলমাল উঠলো। চারিদিক থেকে লোকজন সেইদিকে ছুটতে আরম্ভ করলে। দয়াল বেচারা একে মোটা মানুষ তার ওপর বয়েস

হয়েছে, লোকজনের চাপে নিশ্বাস যখন তার বন্ধ হয়ে যাবার জো হয়েছে, এমন সময় একটা মাতাল কোত্থেকে টলতে টলতে এসে—দিলে তার পা মাড়িয়ে!

দয়াল তাকে এক চড় মারবার জন্যে হাত তুলে বলে উঠলো ঃ মাতাল কোথাকার! দেখতে পাওনা?

মাতালটা একটু সরে গিয়ে চড়টা বাঁচিয়ে বললে ঃ মদ খেয়েছি বটে, কিন্তু মাতাল এখনও হইনি দাদা, কিছু মনে কোরো না।

দয়ালের হাত তেমনি তোলাই রইলো। লোকটা আলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, মুখখানা চেনা যায় না, কিন্তু গলার আওয়াজটা কেমন যেন—

কিন্তু এমন কত হয়! দয়াল আবার চলতে আরম্ভ করে হঠাৎ কি ভেবে একবার ফিরে তাকালে। মাতালের মুখে তখন আলো পড়েছে। মুখে একমুখ দাড়ি গোঁফ! দয়াল থমকে দাঁড়ালো। লোকজনের ভিড়ে এমন করে দাঁড়ানো চলে না। পিছনের লোক ঠেলা দিচ্ছে। দয়াল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সেই লোকটার একখানা হাত চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো ঃ কে? তুমি কে?

মাতাল চোখ মিট্ মিট্ করে দয়ালকে একবার ভাল করে দেখেই হো হো করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে দয়ালকে টানতে টানতে ভিড় থেকে বের করে বললে ঃ দয়ালদা, তুমি!

দয়ালের গলা দিয়ে আর কথা বেরোয় না। মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে ঃ অমরনাথ।

তারপর হাত দুটি জোড় করে বারম্বার কপালে ঠেকিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলো ঃ জয় বাবা তারকেশ্বর। জয় বাবা তারকেশ্বর।

বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার দর দর করে জল গড়িয়ে এলো।

অমরনাথ বললে ঃ কাঁদবি পরে। আগে বল—তুই এখানে কেন? বাবা কেমন আছেন?

দয়াল বললে ঃ থাম, থাম, তুই আর কথা বলিস না খোকা। খুব ছেলে বাবা তুই। মায়াকে কোথায় রেখেছিস?

এইবার অমরনাথের চোখেও জল এলো।

বললে ঃ রাখতে পারলাম না দয়ালদা, মরে গেল।

দয়াল বললে ঃ চল, বাড়ি চল। আমার আর মামার বাড়ি যাওয়া হলো না। চল এইখান থেকেই ফিরি। বাবুর মাথা-টাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। তখনই বলছে কলকাতা যাব, তখনই বলছে কাশী যাব।

অমরনাথকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে দয়াল অনুনয়-বিনয়ের বাকি কিছু রাখলে না।

কিন্তু অমরনাথের সেই এক কথা!—আমি আর বাবার কাছে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারব না দয়ালদা। বাবার মাথা হেঁট হয়ে যাবে, আমি যাব না।

মুখে তার মদের গন্ধ পেয়ে দয়াল বলে উঠলো ঃ তুই একেবারে—ছি ছি মদ খেতে ধরেছিস খোকা?

অমরনাথ বললে ঃ সবাইকে ছেড়ে ওকেই ধরেছি দয়ালদা। আমার কথা ছেড়ে দে!

ছেড়ে আমি দেবো না খোকা, তোকে নিয়ে আমি যাবই। হয় তোকে নিয়ে যাব, নয় ত, আমিও আর ফিরব না, বাবার কাছে হত্যে দেবো।

অমরনাথ বললে ঃ তাহলে এক কাজ কর দয়ালদা, নিয়ে যদি যেতেই হয়, আমার একটা ছেলে আছে, তাকেই নিয়ে যাও।

দয়াল বললে ঃ ছেলে? তোর ছেলে হয়েছে?

হ্যাঁ, বছর-তিনেক আগে হয়েছিল একটা! ছেলে হবার পরেই মায়া মারা গেছে। ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে কি-না জানি না।

দয়াল অবাক হয়ে গেল।—সে কি রে? কোথায় রেখেছিস তাকে?

এসো আমার সঙ্গে।

এই বলে দয়ালকে সঙ্গে নিয়ে আজ তিন বছর পরে অমরনাথ ফিরে এলো সুলতানপুর গ্রামে। তার সেই বাড়ি তখনও তেমনি পড়ে আছে। বাড়ির জিনিষপত্রগুলো মাত্র হরিমোহনবাবু তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন। বাড়ির উঠোন হয়েছে আগাছার জঙ্গল!

গ্রামের লোক অমরনাথকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। সবাই বলতে লাগলো ঃ আর তোমাকে আমরা ছাড়বো না ডাক্তারবাবু।

অমরনাথ হেসে বললে ঃ আমাকে যে সবাই ছেড়েছে ভাই।

কিন্তু অমরনাথ থাকবার জন্যে আসেনি। এসেছিল শুধু দেখতে মায়ার সেই সন্তানটি বেঁচে আছে কি-না! যদি থাকে ত দয়ালে সঙ্গে বাবার কাছে তাকে সে পাঠিয়ে দেবে। মায়া একদিন এই কথাই বলেছিলে।

ছেলেটি দিব্যি বড় হয়েছে। সাদা ধপধপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছেলে, চমৎকার হাতে চমৎকার কথা বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অমরনাথকে সে চেনে না।

ছেলেটিকে নিয়ে যাবার জন্যে সে এসেছে শুনে হরিমোহনবাবুর বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মেজ-বৌ খোকাকে মানুষ করেছে তার দুঃখই সবচেয়ে বেশি। বললে ঃ আমি তখনই বলেছিলাম পরের ছেলে—জানি কোন দিন কেড়ে নিয়ে চলে যাবে।

কাঁদতে কাঁদতে খোকাকে জিজ্ঞাসা করলে ঃ হাঁরে, যাবি?

খোকা যাওয়া না-যাওয়ার মানে কিছু বোঝে না। হাসতে হাসতে বললে ঃ যাব।

দেখেছ কেমন নিমক-হারাম! মা-মরা ছেলেগুলো বড় নিষ্ঠুর হয়।—হাঁরে, পারবি আমাকে ছেড়ে থাকতে?

খোকা কিন্তু সে-কথারও মানে বুঝতে পারলে না। হাঁ করে মেজ-বৌ-এর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

নিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেলই। ভাল জামা-কাপড় পরিয়ে মেজ-বৌ তাকে সাজিয়ে দিলে। খোকা ভারি খুশি! দয়ালের কোলে চড়ে যখন সে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো, মেজ-বৌ-এর বুকের ভেতরটা কেমন যেন তোলপাড় করে উঠলো। এদৃশ্য সে দেখবে কেমন করে?

ছুটে সে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। সজলচোখে আবার তাকে জানলার কাছে এসে দাঁড়াতে হলো ছেলেটাকে একটিবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে।

খোকাকে আর দয়ালকে ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চড়িয়ে দেবার জন্যে অমরনাথ তাদের সঙ্গে গেল।

খোকা এতক্ষণ পরে ঝোঁক ধরলেঃ মা কই? মা আসবে না?

দয়াল বললেঃ আসবে। চল তোমাকে কত জিনিস দেবো, তুমি যা চাইবে তাই দেবো। তোমার ভাবনা কি বাবা, তুমি রাজার ছেলে।

এমনি করে' দয়াল তাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অমরনাথের হঠাৎ কি যেন মনে হলো। বললেঃ কিন্তু একটা কথা আছে দয়ালদা, খোকা যে আমার ছেলে এ-পরিচয় তুই বাবার কাছে দিতে পাবি না।

দয়াল থমকে দাঁড়িয়ে বললেঃ কেন?

অমরনাথ বললেঃ না, কিছুতেই না। সমাজের কাছে বাবার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

দয়াল জিজ্ঞাসা করলেঃ কি বলব তাহলে?

বলবি—গরীব বামুনের ছেলে, বাপ-মা নেই, তোর মামার বাড়ি থেকে নিয়ে এলি মানুষ করবার জন্যে।

দয়াল হেসে বললেঃ আরে দূর দূর, তাই কখনও হয়! তা আমি পারব না।

অমরনাথ বললেঃ তাহলে দে ওকে। আমি পাঠাব না।

সর্বনাশ! দয়াল বললেঃ আচ্ছা তাই বলবো। বেশ মজা হবে।

অমরনাথ বললেঃ বলবো নয় ; আমার গায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর—কখনও ওর পরিচয় জানাবি না।

কখনও না।

না। আমি যতদিন না বলি।

বাধ্য হয়ে দয়ালকে প্রতিজ্ঞা করতে হলো।

অমরনাথ বারম্বার তাকে এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে বললেঃ এবার যা।

খোকাকে বুকে চেপে ধরে ট্রেনের জানলার ধারে বসে দয়াল জিজ্ঞাসা করলেঃ তুই কখন আসবি?

ট্রেনের বাঁশী বাজলো, ট্রেন দিলে ছেড়ে।

দয়ালের চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে। চিৎকার করে বললেঃ বল—খোকা—বল। বল কখন আসবি?

অমরনাথ বললেঃ দেখা হবে।

ছেলেটা ট্রেনে কখনও চড়েনি। ট্রেন চলেছে দেখে সে খিল খিল করে হেসে উঠলো। অমরনাথ হাত তুলে তাদের বিদায় দিলে। অমরনাথের দেখাদেখি খোকাও তার ছোট্ট কচি হাতখানি তুলে একবার হাসলে।

তার সেই হাসি হাসি সুন্দর মুখখানির মধ্যে অমরনাথ অকস্মাৎ যেন মায়াকে দেখতে পেল। তারপর চোখের জলে সব-কিছু ঝাপ্‌সা হয়ে গেল।

ওদিকে প্ল্যাটফর্মে কলকাতা যাবার একখানা ট্রেন এসে দাঁড়ালো। অমরনাথ অন্যমনস্কের মত তাইতেই চড়ে বসলো কোথায় যে গেল—হয়ত-বা সে নিজেই জানে না!

আবার সেই গ্রাম!

আবার সেই শিবনাথ চৌধুরীর প্রকাণ্ড বাড়ি!

খোকাকে নিয়ে দয়াল ফিরলো রাত্রে। খোকা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ফিরেই দেখলে, শিবনাথবাবু কলকাতা যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। এর মধ্যে একখানা বাড়িও নাকি সেখানে কেনা হয়ে গেছে।

ঘুমন্ত খোকাকে কোলের কাছে শুইয়ে সারাটা রাত দয়াল একরকম জেগেই কাটালে। কেমন করে' বাবুর কাছে ছেলেটার পরিচয় সে দেবে? অমরনাথের কাছে বাবা তারকেশ্বরের নামে সে শপথ করেছে সত্য কথা গোপন রাখবার জন্যে। সুতরাং মিথ্যা কথা তাকে বলতেই হবে।

অপরাধ নিও না বাবা তারকেশ্বর!—দয়াল মাথা ঠুকে ঠুকে তার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ স্খালন করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে' গাই দুয়ে টাটকা দুধ এনে খোকাকে খাওয়ালে। তারপর কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে তাকে দোতালায় উঠে যেতে হলো।

ঘরের মধ্যে জিনিষপত্র বাঁধা ছাঁদা অবস্থায় পড়ে আছে। একটা বিছানার বাণ্ডিলের ওপর লেবেল মারা রয়েছে—Samta to Howrah। একটা টুলের ওপর চড়ে দয়াল দেয়াল থেকে অমরনাথের একটা ফটো খুলতে লাগলো।

খোকা যে কখন তার পিছু পিছু ওপরে উঠে এসেছে জানতে পারেনি। খোকা জিজ্ঞাসা করলেঃ ওটা কে? ওটা খুলছো কেন?

শিবনাথবাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেলঃ দয়াল।

দয়াল ছেলেটাকে হাতের ইসারায় বললেঃ যা এখানে থেকে। যা—তুই ওই ঘরে যা।

শিবনাথবাবু ঘরে ঢুকলেন। অমরনাথের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আর, তোকে বলেছি না—ওই ছবিটা আমার চোখের সামনে রাখিসনি।—হতভাগা কোনও খবরই দিলে না, না?

দয়াল ঘাড় নেড়ে বললে ঃ না।

এমন সময় ছোট ছেলেটি পিছন থেকে শিবনাথবাবুর গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ঃ ওটা কে?

শিবনাথবাবু চমকে উঠলেন। পিছন ফিরতেই দেখেন—ছোট একটা ছেলে। দয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এ আবার কে দয়াল? এটা কোত্থেকে এলো?

দয়াল বললে ঃ ওকে আমিই এনেছি বাবু, ওর কেউ কোত্থাও নেই। ওকে মানুষ করব।

এই বলে' সে ছবিটা হাতে নিয়ে টুল থেকে নেমে এলো।

শিবনাথবাবু ছেলেটার দিকে তাকালেন। বললেন ঃ কেউ কোথাও নেই? তা—যার কেউ কোত্থাও নেই তাকে মানুষ করবার ভার বুঝি তোমার ওপর? দূর দূর দূর! ওরে দূর করে' দে, ওকে দূর করে' দে! অনাথ-আশ্রমে দিয়ে দে, রাস্তায় ফেলে দে, ছি ছি ছি ছি, এ আবার কোত্থেকে কি জঞ্জাল জোটালি বল ত!

শিবনাথবাবু চলে যাচ্ছিলেন, আবার ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ ছেলে মানুষ করবার সখ তোর এখনও মেটেনি? একটাকে ত মানুষ করেছিলি, কোথায় গেল সে? না, না, আমার বাড়িতে ও সব চলবে না, দূর করে' দে!

বলতে বলতে তিনি চলে যাচ্ছিলেন, দয়াল পিছু পিছু গিয়ে বললে ঃ আপনার দয়া হচ্ছে না বাবু? ছোট একটা ছেলে, মানুষের বাচ্চা—রাস্তায় পড়ে মরবে?

শিবনাথবাবু বললেন ঃ দয়া! না, না, দয়াল, আমার দয়া মায়া নেই, আমি সব চুকিয়ে দিয়েছি।—আচ্ছা, নিয়ে চল কলকাতায়, আমি অনাথ-আশ্রমে দেবার ব্যবস্থা করে দেবো।

কলকাতার বাইরে টালিগঞ্জে শিবনাথবাবু বাড়িখানি কিনেছেন চমৎকার।

চারিদিন হলো তিনি এসেছেন কলকাতায়।

সেদিন সকালে শিবনাথবাবু এই বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন ঃ কাজ আর তুই করবি কখন দয়াল! কোত্থেকে একটা জঞ্জাল কুড়িয়ে আনলি, তার হেফাজতেই তোর দিন কাটছে। কাল একটা অনাথ-আশ্রম দেখে ওকে রেখে আয়, আর এই নিয়েই যদি থাকবি তো বল আমিই যাই কোনও আশ্রমে, তোরাই থাক বাড়িতে।

দয়াল বললে ঃ আজ্ঞে না, আমি যাইনি কোথাও, গয়লাটার সঙ্গে ঝগড়া করছিলাম, ব্যাটা দুধে বড় জল দিচ্ছে!

শিবনাথবাবু বললেন ঃ দুধে জল দিচ্ছে? আর ওই জল-দেওয়া দুধ তোমার ওই

বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছ ত' বেশ করে'। খাওয়াও, খাইয়ে অসুখ করুক, তারপর মরুক বাস, তাহলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। পাপ রাখবার আর জায়গা থাকবে না দয়াল।

তাহলে—

শিবনাথবাবু বললেন ঃ তাহলে আবার কি? ও পাপ বিদেয় করে দাও, আর নইলে একটা গাই কিনে নিয়ে এসো। আমার এই এত বড় বাড়িতে তোমার ওই জঞ্জাল রাখবার জায়গা যখন হয়েছে, একটা গাই রাখবার জায়গা নিশ্চয় হবে। যাও!

দয়াল চলে যেতেই শিবনাথবাবুর নজর পড়লো—সুমুখে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো অমরনাথের ছবিটার দিকে। শিবনাথবাবু সেইখানে উঠে গেলেন। ছবিটা খুলতে খুলতে বললেন ঃ বুড়ো বাপের তিরস্কার যে সহ্য করতে পারলে না, যে পালিয়ে গেল, তাকে আবার এ রকম করে ধরে রাখা কেন?

এই বলে' ছবিটা খুলতে গিয়ে হাতটা তাঁর কেঁপে উঠলো। ছবিটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে ঝন ঝন করে ভেঙ্গে গেল।

ওদিকে পাশের ঘরে মনে হলো ঠিক সেই সময় কে যেন কি ফেললে।

তুই আবার কি নষ্ট করলি দয়াল?

শিবনাথ পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই, শুধু তাঁর বইগুলো টেবিলের ওপর থেকে ঘরের মেজের ছড়িয়ে পড়েছে। বইগুলো কুড়োতে কুড়োতে শিবনাথবাবু ডাকলেন ঃ ওরে কে আছিস? দয়াল! দয়াল!

ছোট ছেলেটি গুট গুট করে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। শিবনাথ বললেন ঃ এগুলো কে ফেললে?

ছেলেটি বললে ঃ আমি।

শিবনাথ বললে ঃ হুঁ শয়তান! সত্যি কথা বলবার সাহস আছে দেখছি। তারপর ছেলেটার মুখের পানে তাকিয়ে কি যে তাঁর মনে হলো, এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকে কাছে ডাকলেন হাতের ইসারায়, জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নাম কি?

ছেলেটা বললে ঃ খোকা।

শিবনাথ বললেন ঃ আঃ! খোকা আবার কেন? অমরনাথকেও ত ছেলেবেলা খোকা বলে ডাকতাম! হতভাগা দয়ালটা আমাকে দেখছি পাগল করে দেবে।

খোকা ইতিমধ্যে শিবনাথবাবুর হাঁটুর ওপর চড়ে বসেছে। শিবনাথবাবু কি যে তাকে বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। শেষে বললেন ঃ এখানে বসতে নেই, এখানে নয়, তুমি—

এই বলে' তিনি তাকে কোল থেকে নীচে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কয়েকখানা বই তখনও পড়েছিল। বললেন ঃ কি নেবে তুমি? কি চাই তোমার?

খোকা বললে ঃ ঘোলা।

ঘোড়া? বেশ, বেশ। রাজপুত্তুর! ঘোড়ার চড়ে দিগ্বিজয় করতে বেরুবে? আচ্ছা।

বলে' তিনি যেই হেঁট হয়ে বইগুলো কুড়োতে যাবেন, খোকা সোফা থেকে লাফিয়ে একেবারে তাঁর পিঠে চড়ে' বসলো। বসেই বলতে লাগলো ঃ হেট্! হেট্! ঘোলা!

শিবনাথবাবু অবাক। খুব যে তাঁর খারাপ লাগলো তা নয়। একটুখানি হাসলেন। এই বোধহয় তাঁর মুখে প্রথম হাসি আমরা দেখলাম। তারপর আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ঘোড়া সেজে হাঁটু গেড়ে তিনি কার্পেট-বিছানো মেঝের ওপর, চলতে আরম্ভ করলেন। খোকা তাঁর পিঠে চড়ে' হেট্ হেট্ করে হাসতে হাসতে ঘোড়া চালাতে লাগলো।

বাইরে থেকে দয়ালের গলার আওয়াজ পাবামাত্র শিবনাথবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। ছেলেটা দুম্ করে' মেঝেতে পড়ে গেল। পড়েই সে কেঁদে উঠলো।

দয়াল ঘরে ঢুকে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলে।

দয়ালের চোখে জল! কারও মুখে কোনও কথা নেই।

শিবনাথবাবু লজ্জিত হয়ে নীরবে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ছোট একটি প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় নিয়ে দয়াল খোকাকে পড়াচ্ছে।

—বল অ।

খোকা বলছে ঃ অ।

—বল আ।

খোকা বলছে ঃ আ।

হ্রস্ব ই।

খোকা চুপ করে আছে ; বলতে পারছে না।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ কি হবে ওকে পড়িয়ে দয়াল? পণ্ডিত হবে? উকিল হবে, না ব্যারিষ্টার হবে, হাঁরে?

দয়াল চুপ করে' রইলো।

চুপ করে রইলি যে? ওর ভাল নাম কি রাখলি?

দয়াল বললে ঃ আপনিই ত বলেছেন সেদিন—সোমনাথ!

শিবনাথবাবু বললেন ঃ সোমনাথ? আমি বলেছি? তা হবে।—কিন্তু কি করবি ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে, কই তা ত বললিনি দয়াল?

দয়াল বললে ঃ ডাক্তার অভাবে ওর মা মরে গিয়েছিল বাবু, আমার ইচ্ছে—ও ডাক্তার হয়ে আসুক, খুব বড় ডাক্তার, বিলেত থেকে পাশ করা ডাক্তার।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ ডাক্তার? তা বেশ। কিন্তু আবার কেন দয়াল? আর-একজনকেও ত' ডাক্তার করতে চেয়েছিলি, কি হলো? যাক সে-সব পুরনো কথা। তোরা যা খুশি তাই কর দয়াল। আমার টাকা আছে, তবু জানবো কোথাকার কে গরীবের একটা ছেলেকে মানুষ করলাম।

মানুষ তিনি সত্যিই করলেন।

সোমনাথ বড় হলো। শিবনাথবাবু সোমনাথের জন্যেই বোধহয় আর দেশে ফিরে গেলেন না। কলকাতাতেই বাস করতে লাগলেন।

ডাক্তারি পাশ করবার জন্যে সোমনাথকে তিনি বিলেত পাঠালেন।

বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে সে ফিরে এলো সাত বছর পরে।

হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে! প্ল্যাটফর্মে শিবনাথবাবু তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আর দয়াল দাঁড়িয়ে।

সাহেবি পোষাক-পরা সোমনাথ নামলো ট্রেন থেকে।

বাবা! বলে' শিবনাথবাবুকে সে প্রণাম করলে। দয়ালের চোখ দুটো জলে ভরে এলো। সে তখন ভাবছে অমরনাথের কথা। ভাবছে, আজ সোমনাথকে দেখলে সে-ই বোধ হয় সব চেয়ে বেশি আনন্দিত হতো। আর কতদিনই-বা সে বাঁচবে, আর কতদিনই-বা শিবনাথবাবুর কাছে সোমনাথের পরিচয় গোপন করে রাখবে?

কলকাতা শহরের জনবহুল একটি পাড়ার মধ্যে ছোট একখানি দোতলা বাড়ি! মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি বলেই মনে হয়। দোতলার একখানি ঘরে বাড়ির মালিক অক্ষয়বাবু দাবা খেলছেন আমাদের অমরনাথের সঙ্গে। অমরনাথের বয়স হয়েছে, মাথায় টাক দেখা গেছে, মুখে বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে।

অক্ষয়বাবু আর অমরনাথ দাবা খেলছে। ওদিকে পাশের ঘরে অক্ষয়বাবুর মেয়ে গান গাইছে। অমরনাথ দাবা খেলতে খেলতে বলে উঠলোঃ ও হচ্ছে না, শিবানী ওইখানটা এমনি করে গাও।

এই বলে' সে একটুখানি গেয়ে শুনিয়ে দিলে।

অক্ষয়বাবু ভারি মজার মানুষ। চেঁচিয়ে উঠলেন।—আঃ, থামো অমরনাথ থামো। গান পরে হবে। এদিকে তোমার নৌকা ডুবলো।

অমরনাথ গান থামিয়ে আবার দাবায় মন দিলে। বললেঃ আমার নৌকা অনেক আগেই ডুবেছে অক্ষয়বাবু। মাঝ দরিয়ায় ডুবে গেছে। এই নিন তাহলে, কিস্তি মাৎ!

অক্ষয়বাবু অমরনাথের মুখের পানে তাকালেন। বললেনঃ হারিয়ে দিলে?—আমাকে আবার হারিয়ে দিলে?

অমরনাথ বললেঃ দিলুম।

হেরে গেলে অক্ষয়বাবুর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেনঃ তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে অমরনাথ।

অমরনাথ বললেঃ জানি। আমাকে আপনার বাড়ি থেকে এইবার চলে যেতে হবে—এই কথা ত।

অক্ষয়বাবু বললেনঃ হাঁ, এই কথা।

অমরনাথ বললে ঃ ও-কথা আমি রোজ শুনি। আপনি দাবা খেলায় হেরে গেলেই ওই কথা বলেন। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ তোমার কথাও আমি বিশ্বাস করি না। কলকাতায় টোঁ টোঁ করে' ঘুরে বেড়াতে, দাবা খেলার জন্যে তোমাকে আমি বাড়িতে আশ্রয় দিলাম, মেয়েটাকে গান শেখালে, তখন বললে কি-না, আমি বড়লোকের ছেলে, আমার বাবা আছে, আমার স্ত্রী মরে গেছে কিন্তু আমার ছেলে আছে, তাদের কোথাও আমি খুঁজে পাচ্ছি না,—সব বাজে কথা, সব মিছে কথা।

অমরনাথ বললে ঃ ও-সব কথা বলে আমার মন খারাপ করে দেবেন না অক্ষয়বাবু, আপনি থামুন।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ মন তোমার কখন ভাল থাকে? সব সময়েই ত দেখি এমনি।—শুধু সন্ধ্যেবেলা দেখি মুখে তোমার হাসি ফোটে, তখন আনন্দ যেন আর ধরে না—হ্যাঁ, তুমি মদ খাও। মদ খাওয়া তোমাকে ছাড়তে হবে।

অমরনাথ বললে ঃ পারব না। অনেক ছেড়ে আমি ওইটি ধরেছি—ওকে ছাড়লে আমার আর রইলো কি?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ হুঁ, তা ছাড়বে কেন?

পাশের ঘর থেকে শিবানীর গান শোনা যাচ্ছিল, অক্ষয়বাবু মাঝের দরজার কাছে এগিয়ে দরজা খুলে চিৎকার করে উঠলেন ঃ সময় নেই অসময় নেই শুধু গান আর গান! গান থামাও।

কেন বাবা? বলে শিবানী উঠে দাঁড়ালো।

আমাদের একটা জরুরী পরামর্শ হচ্ছে, এ-সময়ে গান ভাল লাগে না। বলতে বলতে অক্ষয়বাবু এ-ঘরে এলেন।

শিবানী হাসতে হাসতে দরজার কাছ থেকে বললে ঃ কাকাবাবু খেলায় তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে বুঝি?—ওকি! জামা পরছ কেন কাকাবাবু?

অমরনাথ বললে ঃ আমি চললুম মা। অনেকদিন হয়ে গেল। সত্যিই ত!

শিবানী তার বাবার মুখের পানে তাকিয়ে বললে ঃ বাবা!

অক্ষয়বাবু কি যে জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না। দেখে মনে হলো—তাঁর এই মেয়েটিকে তিনি একটু ভয় করেন।

অমরনাথ চলে যাচ্ছিল, শিবানী ডাকলে ঃ কাকাবাবু!

উঁ ; বলে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখা গেল, অমরনাথের চোখে জল। মুখে সে কিছুই বলতে পারলে না। আবার সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শিবানী আবার ডাকলে ঃ কাকাবাবু!

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ যেতে কি ওকে আমি বলছি নাকি? বসুক না আর-এক হাত, দেখি কেমন করে আমাকে হারায়!

কাকাবাবু! কাকাবাবু! বলতে বলতে শিবানী সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল!

অমরনাথ ফিরলো না।

অক্ষয়বাবু দাবা নিয়ে একাই বসে আছেন।

শিবানী পেরিয়ে যাচ্ছিল, অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোথায় সে?

শিবানী রাগ করে বললে ঃ জানি না।

অমরনাথ রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্কের মত হেঁটে চলেছে। ডাক্তারখানা দেখছে আর ঢুকছে।—ডাক্তার, চাই? কম্পাউণ্ডার চাই?

সবাই বলছে ঃ না।

কিন্তু চাকরি তাকে করতেই হবে। তা সে যে-চাকরিই হোক! ডাক্তারি না পায়, কম্পাউণ্ডারীও করবে।

সবে সেদিন একটা রাস্তার ধারে নতুন একটি ডাক্তারখানা খোলা হলো। দরজায় কলাগাছ, আমের শাখা, মঙ্গল কলস দেওয়া হয়েছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ শিবনাথবাবু আর দয়াল। পিছু-পিছু দরজা পর্যন্ত এলো ডাক্তার সোমনাথ।

অমরনাথ এইদিকেই আসছে। দেখা হলো বলে! ঠিক এমনি সময়ে রাস্তার একজন লোক একখানা চিঠি তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, নম্বরটা কোথায় হবে বাবু? অমরনাথ বাড়ির নম্বর দেখবার জন্যে যেই তাকিয়েছে, শিবনাথবাবু আর দয়াল গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়ি ছেড়ে দিলে। মুখোমুখি দেখা হতে হতেও হলো না।

অমরনাথ সোমনাথের ডাক্তারখানার দরজায় একবার থমকে দাঁড়ালো। নতুন ডাক্তারখানা। হয়ত-বা ডাক্তারের প্রয়োজন হতেও পারে। কিন্তু দরজায় সোমনাথের নামের প্লেটটা দেখেই সে চমকে উঠলো। এস, রায় চৌধুরী এম, আর, সি, পি (লণ্ডন)। সর্বনাশ! এত বড় ডাক্তারের কাছে কিছু হবে না। কিন্তু সেখান থেকে যেই সে চলে গেল, ডাক্তারখানা থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে দরজায় একটা বোর্ড টাঙ্গিয়ে দিলে ঃ 'কম্পাউণ্ডার চাই।

অমরনাথ তা দেখতে পেলে না।

ওদিকে দেখা গেল অক্ষয়বাবু পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, একজায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। শিবানীকে বললেন ঃ তুই সেই গানটা গেয়ে আমাকে শোনা মা, তাহলেই আমার অসুখ সেরে যাবে। অক্ষয়বাবুর এই এক রোগ!

শিবানী টেবিল-হারমোনিয়ামটা বাজাচ্ছিল। বললে ঃ না বাবা, গান শোনালে অসুখ সারে না, ডাক্তার ডাকতে হয়।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ ডাক্তার ত' একজন রেখেছিলুম বাড়িতে। হতভাগা আবার পালিয়ে গেল যে?

কাকাবাবুকে ত' ডাক্তারি করতে রাখনি বাবা, তাঁকে রেখেছিলে—দাবা খেলতে, আর গান শুনতে।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ হুঁ অমরনাথ আবার ডাক্তার! ডাক্তারির ও জানে কি, যে ডাক্তারি করবে! ও জানে শুধু গান গাইতে আর দাবা খেলতে।

এমন সময় অমরনাথ ঘরে ঢুকলো।

অক্ষয়বাবু তাকে দেখেই বলে উঠলেন ঃ এই যে, এসো ভাই, এসো। এসো অমরনাথ, তোমার ডাক্তারির প্রশংসাই করছিলাম এতক্ষণ! মরে গেলাম ভাই, আমার সেই পেটের বেদনাটা আবার বেড়েছে। দাও, একদাগ ওষুধ দাও!

অমরনাথ বললে ঃ না, আমি ডাক্তারি জানি না।

এই বলে সে শিবানীর কাছে গিয়ে বললে ঃ আমার জামা-কাপড়গুলো দে মা, আমি চলে যাব। সেই জন্যেই এলাম।

শিবানী বললে ঃ তা নইলে আসতে না?

অমরনাথ বললে ঃ না।

শিবানী বললে ঃ আমাদের ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে কাকাবাবু?

অমরনাথ ম্লান একটু হাসলে। বললে ঃ ছেড়ে থাকতে? নাঃ, দে মা দে, তাড়াতাড়ি দে, আমি চলে যাই।

শিবানী বললে ঃ জামা-কাপড়গুলো খুঁজে বের করতে হবে কাকাবাবু। তার আগে তুমি বাবার একটা-কিছু ব্যবস্থা কর।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ ব্যবস্থা আমি করেছি মা।

শিবানী বললে ঃ কি ব্যবস্থা করেছ বাবা?

দেখা গেল, তিনি দাবার ছক পেতে বসেছেন। বললেন ঃ এসো অমরনাথ, দেখি এবার কে কাকে হারাতে পারে।

শিবানী হেসে বললে ঃ অসুখ তোমার ভাল হয়ে গেল বাবা?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ হ্যাঁ মা, তুই আমাদের কিছু খাবার ব্যবস্থা কর।

শিবানী বললে ঃ তোমার পেটের অসুখ সেরে গেল?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ ব্যথা যা একটু আছে, খেলেই চাপা পড়বে।—না কি বল অমরনাথ?

অমরনাথ দাবার কাছে এসে বসলো। বললে ঃ ওরকম করে খাবেন না অসুখের ওপর।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ খাওয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কি আছে অমরনাথ? সারা ভারতবর্ষে দ্যাখো—দুবেলা পেট ভরে' ভাল করে দুটো খাবার জন্যে মরছে, আর খাওয়ার অভাব যাদের নেই—পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—তারা করছে খাওয়া-খাওয়ি!—কেমন? ভাল কথা বলেছি, না? আর জন্মে আমি কবি ছিলাম অমরনাথ।

কবি না হলে—হ্যাঁ কি রকম গান রচনা করি দেখেছ ত?—বল না শিবানীকে, তোমার সুর-দেওয়া আমার একটা গান গাইতে। আমি বললে এখুনি চটে যাবে।

অমরনাথ বললে ঃ না এখন গান থাক্। আপনার এই অসুখের জন্যে ভাল করে ওষুধ খান, চিকিৎসা করান।

দাবার বড়ে' চালতে চালতে অক্ষয়বাবু বললেন ঃ কার ওষুধ খাব? তোমার? তোমার ওষুধ আমি তিনবার—ধর, তিন-চারে বারো দাগ খেয়েছি। কিছু হয়নি।—নাও, সামলাও, তোমার মন্ত্রী সামলাও।

অমরনাথ মন্ত্রী সামলাবার জন্যে খেলায় মন দিলে। একটা চাল চেলে বললে ঃ আমার ওষুধ নয়, ভাল ডাক্তার দেখান।

অক্ষয়বাবু চিৎকার করে উঠলেন ঃ কিস্তি মাৎ! তুমি হেরে গেলে অমরনাথ।

দাবাখেলার সঙ্গীকে হারিয়ে দিতে পারলে অক্ষয়বাবুর ভারি আনন্দ! অমরনাথকে জড়িয়ে ধরে' বললেন ঃ ভাই! গেল-জন্মে তুই আমার ভাই ছিলি অমরনাথ। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।—শিবু শিবু। তোর কাকাবাবু হেরে গেছে।

শিবানী হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ দে মা তোর কাকাবাবুকে আচ্ছা করে খাইয়ে দে! আমাকেও দে!

অমরনাথ বললে ঃ না, আপনি খেতে পারেন না। আপনাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। আমি দেখে এলাম—রাস্তার ধারে বিলেত ফেরৎ এক মস্ত ডাক্তার প্রকাণ্ড ডিসপেনসারি খুলেছে। ডোরপ্লেটে বড় বড় টাইটেল দেখে ভয়ে আমি ঢুকতে পারলাম না।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ তাই হবে অমরনাথ, তাই হবে। নিয়ে এসো তোমার ডাক্তার। দেখাব—ডাক্তারই দেখাব। ওষুধও খাব।—খাবারও খাবো। নিয়ে এসো—নিয়ে এসো ডাক্তার!

সোমনাথের ডাক্তারখানার দরজায় অমরনাথ ডোরপ্লেটটা পড়তে গিয়ে দেখে পাশেই প্ল্যাকার্ড ঝুলছে—কম্পাউণ্ডার চাই।

চমৎকার! চমৎকার! ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই। অমরনাথ ডাক্তারখানার ভেতরে ঢুকলো।

সোমনাথের ঘরে ঢুকে অমরনাথ একটি নমস্কার করলে।

সোমনাথ বললে ঃ বসুন! কি চাই?

অমরনাথ চেয়ারের ওপর বসলো। বললে ঃ আপনাকে একটা কলে যেতে হবে স্যার।

সোমনাথের এই প্রথম কল। সোমনাথ বললে ঃ নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে যান। কলের খাতাটা কোথায় অবিনাশবাবু?

বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক একটি ছাপা খাতা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অমরনাথ লিখলে— অক্ষয়কুমার ব্যানার্জি, ১৭ শ্যামপুকুর লেন, কলিকাতা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ঈষৎ হেসে বললেন ঃ এই আপনার প্রথম কল!

সোমনাথ একটুখানি কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে অমরনাথের মুখের পানে তাকাতেই অমরনাথের কথা বলবার সাহস হলো। বললে ঃ আমার হাত দিয়েই আপনার প্রথম কল যখন এলো, তখন আমার একটি প্রার্থনা আপনাকে শুনতে হবে।

সোমনাথ বললে ঃ বলুন।

অমরনাথ বললে ঃ বাইরে দেখলাম আপনার—এখানে একজন কম্পাউণ্ডার চাই। তা আমাকে যদি রাখেন—

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করলে ঃ কম্পাউণ্ডারী আপনি পাশ করেছেন?

অমরনাথ বললে ঃ আজ্ঞে না। আমি ডাক্তার। গ্রামে ডাক্তারি করতাম। অনেকদিন কিছু করি না। এখন আবার কিছু করবার ইচ্ছে হয়েছে!

সোমনাথ বললে ঃ বিলেত থেকে আমি যৎসামান্য ডাক্তারি শিখে এসেছি। আপনি হয়ত অবাক হয়ে যাচ্ছেন—আমি বিলেত থেকে পাশ করে এসে ওষুধের দোকান করেছি দেখে। না?

অমরনাথ বললে ঃ আজ্ঞে না। শুধু রুগী দেখলেই ত চলবে না, ওষুধই ত সব।

কথাটা সোমনাথের খুব ভাল লাগলো। আর তাছাড়া এই লোকটিকে দেখে অবধি কি-জানি কেন তাকে তার ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। বললে ঃ মাইনে অবশ্য বেশি দিতে পারব না। আপনি আমার প্রেশক্রিপশানগুলো দেখে বেশ ভাল করে ওষুধ দেবেন।

অমরনাথ বললে ঃ সেকথা আপনাকে বলতে হবে না।

সোমনাথ বললে ঃ ভালই হলো, তাহলে এক্ষুনি লেগে পড়ুন। ওষুধগুলো ভাল করে সাজিয়ে নিন দুজনে মিলে। আমি আসছি।

এই বলে সে তার মোটর চড়ে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল সোজা অক্ষয়বাবুর বাড়ি।

অক্ষয়বাবুর বাড়িতে সোমনাথ ডাক্তার এলো কলে।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলে ঃ কে?

সোমনাথ বললে ঃ আমি ডাক্তার। আমাকে কল দিয়েছেন—আহা তাঁর নামটি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

শিবানী বললে ঃ বুঝেছি। আমার কাকাবাবু। আপনি বসুন।

সোমনাথ অস্বস্তিবোধ করছিল। শিবনাথবাবুর কাছে সে মানুষ হয়েছে। নারীর প্রতি তার বিতৃষ্ণা কিছু নেই, তবে সংস্কারগত সঙ্কোচ একটা আছে। তার ওপর শিবানী যুবতী এবং সুন্দরী।

সোমনাথ বললে ঃ রুগী কোথায়? কাকে দেখতে হবে?

শিবানী বড়ই বিপদে পড়লো। রুগী তার বাবা—অক্ষয়বাবু। অথচ এই কিছুক্ষণ আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। শিবানী কি যে করবে, কেমন করে ডাক্তারকে আটকে রাখবে বুঝতে পারলে না। বললে ঃ তিনি আসছেন। আপনি একটু বসুন। আপনার ফিজ কত? কিছু মনে করবেন না। কাকাবাবু আমাকে কিছু বলে যাননি।

সোমনাথ বললে ঃ ষোলো টাকা।

আমি আসছি। বলে' শিবানী পাশের ঘরে চলে গেল।

সোমনাথ একা। বড় মুস্কিলে পড়েছে বেচারা। কি করবে? চলে যাবে? সোমনাথ অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলির দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে—অধিকাংশই শিবানীর ছবি!

শিবানী ঘরে ঢুকলো। বললে ঃ ওদিকে কি দেখছেন? এই ত আমি সামনেই রয়েছি।

সোমনাথ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে ঃ রুগী কি—

শিবানী বললে ঃ রুগী আমার বাবা। আসছেন। এলেন বলে! আপনি চা খান। সিগারেট?

সোমনাথ বললে ঃ আজ্ঞে না। কিছু দরকার হবে না।

শিবানী সোমনাথের হাতে ষোলটি টাকা দিয়ে বললে ঃ ফিজটা নিন।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করলে ঃ কোথায় আপনার বাবা?

শিবানী বললে ঃ বেরিয়ে গেছেন। এক্ষুনি ফিরবেন।

বলতে বলতে জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে নীচের দিকে তাকালে।

মুখ ফিরিয়ে বললে ঃ ওই নতুন গাড়িটা কি—একি! শিবানী দেখলে, ডাক্তার নেই।—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! বলতে বলতে সে দরজার কাছে ছুটে গেল।

সোমনাথ নিজে গাড়িতে চড়ে ষ্টার্ট দিলে। গাড়ি চলতে লাগল। দেখা গেল, সন্দেশের একটি বাক্স হাতে নিয়ে সেই গাড়িরই পাশ দিয়ে অক্ষয়বাবু বাড়ি ঢুকলেন।

অক্ষয়বাবু ঘড়ে ঢুকেই ডাকলেন ঃ শিবানী, দ্যাখ মা, কেমন চমৎকার সন্দেশ কিনে আনলুম দ্যাখ।

শিবানী বললে ঃ বেশ মানুষ যাহোক! কাকাবাবু একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তোমার জন্যে। আর কতক্ষণ মানুষকে বসিয়ে রাখব? চলে গেলেন।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ তাহলে ত ভাল কাজ হলো না মা। অমরনাথ রাগ করবে। ডাক্তারের ভিজিট? টাকা দিয়েছ ত?

শিবানী বললে ঃ হ্যাঁ দিয়েছি। কিন্তু টাকাটা শুধু শুধু গেল—তোমার জন্যে।

সোমনাথ যেখানে বসে ছিল, অক্ষয়বাবু সেইখানে বসলেন। বসেই ছোট টেবিলটির দিকে তাকাতেই দেখেন, কয়েকটি টাকা পড়ে রয়েছে। বললেন ঃ এ টাকাগুলো ফেলে রেখেছিস কেম মা, তুলে রাখ!

টাকা! বলে শিবানী এসে দেখলে, যে-ষোলোটি টাকা সে ডাক্তারকে দিয়েছিল, সেই টাকা সে রেখে দিয়ে গেছে। শিবানী টাকাগুলি হাতে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো।

সোমনাথ ডাক্তারখানায় গিয়ে অমরনাথকে তিরস্কার করতে লাগলো ঃ চমৎকার রুগী আপনার! গিয়ে দেখি—রুগী বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। রুগীর সঙ্গে দেখা হলো না।

অমরনাথ বললে ঃ দেখা হলো না? আপনি ফিরে এলেন? তাঁর মেয়ে ছিল?

সোমনাথ বললে ঃ হ্যাঁ, মেয়েটি ছিলেন, কিন্তু তাঁকে ত আর আমি দেখতে যায়নি, তিনি ত রুগী নন।

অমরনাথ বললে ঃ না। কিন্তু আপনি একটুখানি—। রুগী—মানে একেবারে শয্যাশায়ী রুগী ত নয়। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার ফিজ?

সোমনাথ বললে ঃ হুঁ, তা দিয়েছে।

অমরনাথ খুশি হলো। বললে ঃ তা ত' দেবেই। শিবানী বড় ভাল মেয়ে।

সোমনাথ বললে ঃ তা ভাল হোক মন্দ হোক—এরকম কল আপনি যেন আর কখনও আনবেন না।

অমরনাথ বললে ঃ কিন্তু আপনাকে আর-একবার—আমি নিজে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সোমনাথ বললে ঃ না, আমি আর জীবনে কখনও ও-বাড়িতে যাব না।

দেখা গেল, অক্ষয়বাবু একা একা দাবা নিয়ে বসেছেন। চুপ করে বসে নেই, কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বী অমরনাথের সঙ্গে দাবা খেলা চলছে। আপন মনেই বলে চলেছেন ঃ সামলাও অমরনাথ। এবার আমি তোমাকে হারাবই।

শিবানী দরজা ঠেলে মুখ বাড়িয়ে বললে, কাকাবাবু নেই, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ বাবা?

অক্ষয়বাবু একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে পড়বেন।

শিবানী চলে গেল।

এদিকের দরজা ঠেলে ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলো সোমনাথ।—বললে ঃ নমস্কার! আপনি অক্ষয়বাবু?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ হ্যাঁ আমি।—আপনি কে?

আমি ডাক্তার। অমরনাথবাবু পাঠিয়ে দিলেন।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ আসুন আসুন! বসুন। আপনি দাবা খেলতে জানেন?

সোমনাথ বললে ঃ না।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ তা—বলেই তিনি তার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন ঃ

নিতান্ত ছেলে মানুষ ; জানবেই বা কেমন করে! তুমি বললাম, কিছু মনে কোরো না! তোমাকে আপনি বলতে কেমন যেন বাধছে। —শিবানী! শিবু!

শিবানী এসে দাঁড়ালো। বললে ঃ কি বাবা? এই যে ডাক্তারবাবু, নমস্কার!

সোমনাথ তার হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে বললে ঃ নমস্কার!

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ ও, তুমি আর-একদিন এসেছিলে, ওকে চেনো দেখছি। যাও মা শিবু, ডাক্তারকে কিছু খাইয়ে দাও। সেই যে সন্দেশ আছে বাড়িতে। যাও বাবা খেয়ে এসো, এখন খেলছি, এখন বিরক্ত কোরো না।

সোমনাথ ইতস্তত করছিল, বললে ঃ কিন্তু আমি—

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ জানি আমি। পরে হবে।

ওদিক থেকে শিবানী ডাকলে ঃ আসুন!

ইচ্ছে না থাকলেও সোমনাথকে বাধ্য হয়ে উঠে যেতে হলো।

সোমনাথ পাশের ঘরে গিয়ে শিবানীকে বললে ঃ খেতে আমাকে দেবেন না। আমি খাবো না। আপনার বাবা কেমন আছেন?

শিবানী মিটসেফ খুলতে খুলতে বললে ঃ নিজের চোখেই ত দেখলেন।

সোমনাথ বললে ঃ দেখে ত মনে হলো কিছু হয়নি।

প্লেটের ওপর সন্দেশ রাখতে রাখতে শিবানী হেসে মুখ ফেরালে। বললে ঃ রুগীকে চোখে দেখেই আপনি বুঝতে পারেন না কি?

সোমনাথ বললে ঃ না। তা অবশ্য ঠিক বলা যায় না। এমন অনেক রোগ আছে যা বাইরে থেকে কিছু বোঝবার জো নেই!

এই যেমন ধরুন আপনার! বলতে বলতে শিবানী সন্দেশের প্লেটখানা সোমনাথের সুমুখে নামিয়ে দিয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে হাসলে।

সোমনাথ বললে ঃ আমার! আমার আবার কি রোগ দেখলেন?

কেউ খেতে দিলে, না খেয়ে তার মনে কষ্ট দেওয়া। বলেই শিবানী হাসতে হাসতে চলে গেল।

সোমনাথ বললে ঃ কারও যদি খিদে না পায়, তবুও?

জল গড়াতে গড়াতে শিবানী বললে ঃ মনের কথা বেশ ত' গোপন করতে পারেন দেখছি।

জল নিয়ে শিবানী সোমনাথের পাশে এসে দাঁড়ালো। বললে ঃ অথচ আমি আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি—আপনার বেশ খিদে পেয়েছে।

সোমনাথ বললে ঃ আপনি মুখ দেখে সেকথা বুঝতে পারেন?

পুরুষ মানুষের এই রোগটা সব মেয়েরাই একটু-আধটু বুঝতে পারে।—নিন খান, আপনাকে খেতে হবে।

এ যেন অনুরোধ নয়, এ যেন আদেশ!

সোমনাথ ঈষৎ হেসে খেতে আরম্ভ করলে। বললেঃ আপনি বেশ কথা বলতে পারেন।

শিবানী বললেঃ আপনি ত' শুনেছি বিলেত গিয়েছিলেন, এর চেয়েও ভাল ভাল কথা আপনি শোনেননি সেখানে? ওদেশের মেয়েরা তা শুনেছি কথা বলতে ওস্তাদ!

সোমনাথ বললেঃ ওদেশে,—আর শুধু ওদেশে কেন, মেয়েদের সঙ্গে আমি—আমার সারা জীবনেও—

কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়েই শিবানী বললেঃ তা আমি বুঝতে পেরেছি।

সোমনাথ বললেঃ কেমন করে বুঝলেন?

শিবানী হেসে বললেঃ আমার সঙ্গে আপনার কথা বলবার ধরন দেখে। একবারও সোজাসুজি মুখের পানে তাকিয়ে কথা বলতে পারছেন না।

সোমনাথ বললেঃ কেন পারব না। এই ত তাকিয়েছি।

বলেই এক সেকেণ্ড তার মুখের পানে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেঃ নাঃ ছি! রুগী দেখতে এসে—ভয়ানক মেয়ে আপনি! আমি চললাম।

শিবানী বললেঃ বা-রে! না খেয়েই? ও দুটো খেতে হবে। খান।

না আমি আর খাব না। আমি চললাম।

এই বলে' গ্লাসের জলটা তুলে নিলে।

দাঁড়ান। আপনি আমাকে ভয়ানক মেয়ে বলেছেন, আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে। শিবানী পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে অক্ষয়বাবু যে-ঘরে বসেছিলেন, সেই ঘরে ঢুকলো অমরনাথ।

মুখ না তুলেই অক্ষয়বাবু বললেনঃ আয় মা আয়। এই যে, আমার হয়ে গেছে। বাস, কিস্তি মাৎ!

মুখ তুলে তাকাতেই দেখেন, অমরনাথ দাঁড়িয়ে। বললেনঃ আরে অমরনাথ! তোমাকে দুবাজি হারিয়ে দিলাম। বলেই তিনি একবার পাশের ঘরের দিকে তাকালেন, তারপর হঠাৎ অমরনাথকে প্রশ্ন করে বসলেনঃ আচ্ছা অমরনাথ, শিবানীর এখন বয়েস হয়েছে। কি বল?

অমরনাথ বললেঃ হ্যাঁ তা হয়েছে।

অক্ষয়বাবু বললেনঃ এ সময় স্বাধীনভাবে কারও সঙ্গে মিশতে দেওয়া ভাল নয়।—শিবানী!

শিবানী যে-ঘরে ঢুকেছিল সেই ঘর থেকে জবাব দিলেঃ যাই বাবা। বলে সে সোমনাথের কাছে এলো। এসেই বললেঃ নিন আপনার ভিজিটের টাকা নিন। সেদিনের যোলো টাকা ফেরত দিয়ে গিয়েছিলেন, আর আজকের যোলো টাকা। ধরুন!

কিন্তু—

কিন্তু নয়। বলে টাকা তার পকেটে ফেলে দিয়ে শিবানী বললেঃ যান এইবার।

সোমনাথ দরজা খুলে বাইরে বেরোতে গিয়েই দেখে, অমরনাথ! তৎক্ষণাৎ দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে এলো। পিছনেই ছিল শিবানী দাঁড়িয়ে। তার গায়ে ধাক্কা লাগতেই শিবানী বললেঃ কি হলো?

সোমনাথ বললেঃ আপনার কাকাবাবু—

শিবানী বললেঃ তা বেশ ত, উনি ত আপনার কম্পাউণ্ডার। ডাক্তার কম্পাউণ্ডারে মিলে রুগী দেখুন গিয়ে!

সোমনাথ বললেঃ কিন্তু—

কিন্তু কী?

সোমনাথ বললেঃ আপনার বাবাকে বলেছি অমরনাথবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন, অথচ আজ আমি নিজে এসেছি—উনি পাঠাননি।

শিবানী বললেঃ উঁ! তাহলে ত আপনি অত্যন্ত দয়ালু।

সোমনাথ বললেঃ না না উপহাস নয়, ওঁকে আমি বলেছিলাম—জীবনে আর কখ্খনো আপনাদের বাড়ি আসব না।

শিবানী হাসতে লাগলো। হেসে হেসে বললেঃ অথচ এখানে এসেই একটা ভয়ানক মেয়ের পাল্লায় পড়ে গিয়ে আবার আপনাকে সেই প্রতিজ্ঞা করতে হলো!

সোমনাথ অপ্রস্তুতের একশেষ হয়ে গেল। চাপা গলায় বললেঃ হাসবেন না, হাসবেন না, আঃ, আপনাকে ভয়ানক মেয়ে বলে আমি কোনও অন্যায় করিনি। আমি আর কখ্খনো এখানে আসব না!

অক্ষয়বাবু আবার ডাকলেনঃ শিবানী!

হাসতে হাসতে শিবানী বললেঃ যাই বাবা। আসুন ডাক্তারবাবু!

সোমনাথের মুখখানি শুকিয়ে গেল। আচ্ছা মেয়ে ত'! এখানে আজ সে নিজেই এসেছে, অথচ অমরনাথ জানে, সে আর আসবে না। এই দুর্বলতা অমরনাথের সুমুখে ধরা পড়ে তা সে চায়নি। তবু তাকে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসতে হলো।

তারপর থেকে সোমনাথ আর শিবানীদের বাড়ি আসেনি। শিবানীকে তার সত্যিই ভাল লেগেছে। আর সেই জন্যেই অযাচিতভাবে সেদিন সে রুগী দেখবার নাম করে অমরনাথকে লুকিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়ি। কিন্তু শিবানী যে তাকে অমরনাথের কাছে এমনি ভাবে অপ্রস্তুত করে দেবে তা সে ভাবেনি। অমরনাথ হাজার হলেও তার কর্মচারী! সে তার মনিব। কি যে সে মনে করলে কে জানে!

ডাক্তারখানায় সোমনাথ যায় আর আসে, অথচ লজ্জায় অমরনাথের সঙ্গে কথা কওয়া দূরে থাক, সুমুখে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। অনেক রকমে লজ্জাটা সে ঢাকবার চেষ্টা করে। এমন-কি এক-এক সময় দেখা যায় অতিরিক্ত কড়া মেজাজের ভাণ করে' সে চলাফেরা করতে থাকে, কথা কয় খুব কম ; প্রয়োজন না থাকলেও

চাকর-বাকরদের জোর করে ধমকে দেয়। তারপর আবার একা-একা যখন তার চেম্বারে এসে বসে, কাছে যখন কেউ থাকে না, তখন তার এই ছল-করা গাম্ভীর্য তার নিজের কাছেই কেমন যেন হাস্যকর বলে মনে হয়, সুমুখে টাঙানো আরশিটায় নিজের মুখখানা দেখতে গিয়ে আপন মনেই ফিক করে হেসে ফেলে। এ কী করছে সে?

এমনি করতে করতে সেদিন সত্য-সত্যিই একটা বলবার মত ঘটনা ঘটে গেল।

নতুন একটা কঠিন রুগী দেখে খুব দামি একটা দুষ্প্রাপ্য ওষুধের প্রেস্‌কৃপ্‌সান তাকে করতে হয়েছিল।

সোমনাথ সেদিন ডাক্তারখানায় এসে দেখলে—অমরনাথ ও অবিনাশ কাজ করছে, সোমনাথ আসতে দুজনেই সসম্ভ্রমে তাকে নমস্কার জানিয়ে আবার কাজ করতে লাগলো।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করলে ঃ সেই ওষুধটা পেয়েছেন?

বৃদ্ধ অবিনাশবাবু বললেন ঃ উঁহুঁ ভয়ানক দাম চড়ে গেছে। তার চেয়ে এইটে দিয়ে দিই না! কাজ ত' একই হবে।

সোমনাথ অবিনাশবাবুকে বললে ঃ আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

এই বলে' সোমনাথ তার চেম্বারে অবিনাশবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করলে ঃ তা ওরকম চলে, না কি বলেন?

অবিনাশবাবু প্রথমে কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন ঃ কি রকম?

সোমনাথ বললে ঃ ওই যে একটা ওষুধের জায়গায় আর একটা—

অবিনাশবাবু বললেন ঃ তা স্যার একটু-আধটু না করলে ব্যবসা চলে না। আইন আছে অবশ্য জানি, কিন্তু—এই করে' করে' বুড়ো হয়ে গেলাম, এতে ক্ষতি কিছু হয় না।

সোমনাথ বললে ঃ ক্ষতি হয়। আমাদের এই হতভাগা দেশে আপনার মত অনেক বৃদ্ধ লোকও মাঝে-মাঝে এমনি ছেলেমানুষি করেন। সেই জন্যেই বাবা এই ডিসপেন্সারি খুলে দিয়েছেন, নইলে বিলেত ফেরত কোনও ডাক্তার কখনও ডিসপেন্সারি খোলে না। তা জানেন ত'? শুনুন। বুড়ো বয়েসে চাকরি গেলে আপনার কষ্ট হবে, তাই আপনাকে জবাব দিলাম না। আপনি আজ থেকে বাইরে বসে বসে পেটেণ্ট ওষুধ বিক্রি করবেন, ডিসপেন্সি-রুমে আর ঢুকবেন না। যান—হ্যাঁ, অমরনাথবাবুকে পাঠিয়ে দিন!

অবিনাশবাবু মুখ কালি করে অমরনাথকে ডেকে দিলেন।

সোমনাথ ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল, অমরনাথ ঘরে ঢুকে বললে ঃ স্যার!

জবাব পেলে না।

আবার ডাকলে ঃ স্যার!

সোমনাথ চেয়ারে বসলো।

অমরনাথ বললে ঃ আমাকে ডেকেছিলেন স্যার?

সোমনাথ বললেঃ হ্যাঁ। প্রেস্‌কৃপ্‌সান এখানকার হোক, বাইরের হোক—সব সময় ঠিক ঠিক ওষুধ দেবেন, কখ্‌খনো গোলমাল করবেন না। গোলমাল করলে চাকরি ছাড়িয়ে দেবো। অবিনাশবাবুকে আর ডিসপেন্সি-রুমে ঢুকতে দেবেন না।

অমরনাথ বললেঃ আজ্ঞে বেশ। আর-কিছু বলবেন?

সোমনাথ বললেঃ না।

কিন্তু অমরনাথ পিছন ফিরতেই বললেঃ হ্যাঁ, শুনুন!

অমরনাথ ফিরে দাঁড়ালো।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করলেঃ অক্ষয়বাবু ওযুধ খাচ্ছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খেয়ে ভাল আছেন।

সোমনাথ ঈষৎ হেসে বললেঃ ওঁর কিছু হয়নি। হজমের শক্তি একটু কমে গেছে অথচ খাবার লোভ কমেনি।

অমরনাথ বললেঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, শিবানীও তাই বলে।

সোমনাথ বললেঃ শিবানী আপনার ভাইঝি, না? এখনও বিয়ে দেননি কেন?

অমরনাথ বললেঃ ঠিক মনের মত পাত্র একটি পাওয়া যাচ্ছে না। আর তাছাড়া—অক্ষয়বাবুর—দাদার ওই একটিমাত্র মেয়ে—চব্বিশঘণ্টা সেবাযত্ন করে। শিবানী বড় ভাল মেয়ে—আপনি তো কতবার দেখলেন!

সোমনাথ বললেঃ হ্যাঁ। বিয়ে দিতে বলবেন।

অমরনাথ বললেঃ বলব।

অমরনাথ আরও কিছু শোনবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, সোমনাথ বললেঃ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? যান। অক্ষয়বাবু ওই ওষুধেই সেরে যাবেন আর ওষুধের দরকার হবে না।

যে-আজ্ঞে। বলে অমরনাথ বেরিয়ে গেল।

সোমনাথ শিবানীর কাছে যায়নি, কিন্তু শিবানীই-বা সোমনাথকে না দেখে থাকবে কেমন করে? অমরনাথকেও কিছু সে বলতে পারে না। বলবেই বা কি? আর কেমন করেই বা বলবে? অক্ষয়বাবু ভাল আছেন। ভাল না থাকলেও-বা ওই ছুতো ধরে আর একটা কল দেওয়া চলতে পারতো! শিবানী দুদিন অপেক্ষা করলে, তিন দিন অপেক্ষা করলে, চারদিন কোনোরকমে কাটালে, কিন্তু পাঁচদিনের দিন আর কিছুতেই থাকতে পারলে না।

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে সোমনাথ সেদিন গাড়িতে উঠতে যাবে, এমন সময় একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সি থেকে নামলো শিবানী।

শিবানী বললেঃ নমস্কার। আপনি চলে যাচ্ছেন?

সোমনাথ বললেঃ হ্যাঁ। আপনি এ সময়—এখানে?

শিবানী বললেঃ কেন, আমি তো অসূর্য্যম্পশ্যা নই!

সোমনাথ বললেঃ তা জানি। সেকথা জিজ্ঞাসা করিনি। কি প্রয়োজনে এসেছেন সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবানী বললেঃ প্রয়োজন অবশ্য আপনার সঙ্গেই। আপনাকে বলতে এসেছি যে, আপনার ওষুধ খেয়ে বাবার অসুখ সাংঘাতিকরকম বেড়ে গেছে।

সোমনাথ অবাক হয়ে তার মুখের পানে তাকালে। বললেঃ সে কি?

শিবানী বললেঃ হ্যাঁ, আমি আপনার মত মিথ্যা কথা বলি না।

সোমনাথ হেসে বললেঃ তাহলে তো একবার দেখে আসা উচিত।

শিবানী বললেঃ উচিতই তো!

আসুন তাহলে। বলে সোমনাথ তার গাড়ির পেছনে দরজাটা খুলে দিলে।

শিবানী হাত দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেঃ না, আমি সামনে বসবো।

এই বলে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে সোমনাথের গাড়িতেই সে উঠে বসলো।

সামনে বসলেন? বলে সোমনাথ কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করছিল। কারণ গাড়ি তাকেই চালাতে হবে।

শিবানী বললেঃ আপনি এত দুর্বল কেন ডাক্তারবাবু? পুরুষ মানুষ, এত দুর্বল হওয়া তো ভাল নয়। বসুন।

সোমনাথকে বাধ্য হয়ে তার পাশেই বসতে হলো। বসেই গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

শিবানী হেসে বললেঃ এতে আমার যদি জাত না যায়, আপনার যাবে না।

গাড়ি চলতে লাগলো।

সোমনাথ বললেঃ আপনি এত শক্ত হলেন কেমন করে?

শিবানী বললেঃ আপনাদের জ্বালায়। চৌদ্দ বছরে মা মারা গেছে, সেই থেকে আমার ওই পাগল বাবাটিকে নিয়ে একা থাকি, নিজেকেই দেখেশুনে সব করতে হয়, শক্ত না হলে আপনারা এতদিনে আমাকে পাগল করে দিতেন।

সোমনাথ বললেঃ আমরা! মানে?

শিবানী বললেঃ হ্যাঁ, আপনারা। মানে—মেয়ে দেখলেই যাঁরা মুষড়ে পড়েন, গোপনে দুর্বলতা জাগে ভালবাসবার, কল না পেয়েও যাঁরা রুগীর বাড়ি এসে হাজির হন ছল করে।

সোমনাথ বললেঃ তাহলে কি ভাবছেন আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি?

শিবানী বললেঃ ভাবতে পারলে তো বেঁচে যেতাম! আমাকে আর কষ্ট করে এতদূর আসতে হতো না। আপনিই যেতেন।

সোমনাথ আশ্বস্ত হলো। বললেঃ তাও ভাল। আমার বয়ে গেছে আপনাকে ভালবাসতে! কোনও মেয়েকে জীবনে আমি ভালবাসিনি।

শিবানী বললেঃ ঠিক উলটো। জীবনে কোন মেয়ের ভালবাসা আপনি পাননি।

দুর্বল পুরুষকে মেয়েরা ভালবাসে না।—সর্বনাশ! মানুষটাকে চাপা দিয়েছিলেন যে এক্ষুনি!

সাবধানে গাড়িটা একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়ে সোমনাথ বললে ঃ ও-সব বাজে কথা থাক। আপনি যে-জন্যে এসেছেন সেই কথা বলুন। আপনি ত এসেছেন—

শিবানী বললে ঃ হ্যাঁ এসেছি—আপনি—আপনি পাঁচদিন যাননি বলে।

তবে যে বললেন—আপনার বাবার অসুখ বেড়েছে!

সেকথাও সত্যি। বাবার রোগ ত ছিল যত-খুশি খাওয়া, আপনার ওষুধ খেয়ে খাওয়া-রোগটা তাঁর আরও বেড়েছে, চব্বিশঘণ্টা খাই খাই করছেন।

সোমনাথ হেসে উঠলো। বললে ঃ তাহলে ভাল আছেন বলুন!

শিবানী বললে ঃ তাহলে তাই।

সোমনাথ হো হো করে হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে বললে ঃ আপনি তো দেখছি—

শিবানীও হেসে বললে ঃ বলুন ভয়ানক মেয়ে! আমি আপনার মনের কথা বুঝতে পারি। এই বলে সেও হাসতে লাগলো।

ভালবাসা যখন জমে, তখন এমনি করে জমে। সেদিন তাদের দুজনের মধ্যে কারও কোথাও যাবার ছিল না। দুজনের কথা বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে চলেছে তো চলেইছে।

কথারও শেষ হয় না, গাড়ি চলারও শেষ হয় না!

সোমনাথ যেদিকে ফাঁকা পাচ্ছে, সেইদিকেই গাড়ি চালাচ্ছে। এমনি চালাতে চালাতে দু'দুবার অন্যমনস্ক হয়ে মানুষ চাপা দিতে দিতে যখন সামলে নিলে শিবানী বললে ঃ থাক আর আমাদের গাড়ি চড়ে হাওয়া খাবার দরকার নেই। গাড়ি আপনি চালাতে জানেন না তবু চালান কেন?

গড়ের মাঠের ধারে একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সোমনাথ বললে ঃ তাহলে এই রইলো। এইবার বলুন কি করতে হবে!

শিবানী বললে ঃ বাবাঃ! বাঁচলাম। আনাড়ি ড্রাইভারের হাতে পড়ে প্রাণটা গিয়েছিল এক্ষুণি।

সোমনাথ বললে ঃ আনাড়ি ড্রাইভার হতে পারি, কিন্তু আনাড়ি ডাক্তার নই, প্রাণটা অত সহজে যেতে দিতাম না।

কথায় কথায় কথা জমে উঠলো। গাড়িতে বসেই সন্ধ্যে হলো। তারপর রাত্রি যখন আটটা, সোমনাথ হেসে হেসে বললে ঃ আটটা বাজলো। অভিসারে বেরিয়েছেন, বাবা টের পাবেন না?

শিবানী এইবার বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সলজ্জভাবে সে এক অদ্ভুত হাসি হেসে সোমনাথের মুখের পানে শুধু সে তার সুন্দর চোখদুটি তুলে একবার তাকালে।

সোমনাথও তাকালে তার মুখের পানে।

শিবানী ধীরে ধীরে তার মাথাটি এলিয়ে দিলে সোমনাথের বুকের ওপর। বললে ঃ পাক্‌গে।

মাসখানেক পরে দেখা গেল, একটা নির্জন জায়গায় পাশাপাশি বসে আছে শিবানী আর সোমনাথ।

শিবানী গান গাইছে।

গান শেষ হলো। দুজনেই চুপ। শিবানী বললে ঃ বল!

কি বলব?

কেমন লাগলো?

সোমনাথ বললে ঃ খুব খারাপ।

শিবানী বললে ঃ উঁহু, ও উলটো প্যাঁচে আমাকে মারতে পারবে না। এ ঠিক গল্প-উপন্যাসের হিরোর মত কথা হলো।

সোমনাথ বললে ঃ আর এটাই বা কি হচ্ছে শুনি? এই যে রোজ আমি চলে আসছি ডাক্তারখানা থেকে, আর তুমি আসছ বাড়ি থেকে পালিয়ে, তুমি গান গাইছ আমি শুনছি, এ-সব বুঝি গল্প উপন্যাসের হিরো-হিরোইনের মত হচ্ছে না?

শিবানী বললে ঃ তা হোক। কিন্তু গল্পের নায়ক এমন করে কথা বলে না—এমনি মুখের পানে সোজা তাকায়।

বলতে বলতে সোমনাথের মুখখানি হাত দিয়ে সে নিজের দিকে ফিরিয়ে দিলে।

সোমনাথ বললে ঃ ও আমি পারি না। আমার লজ্জা করে।

শিবানী বললে ঃ মুখ ফিরিয়ে থাকলে আমার কিন্তু ভাল লাগে না। আমার মনে হয় তোমার এই ভীরুতার পেছনে মনে পাপ আছে।

পাপ!

হ্যাঁ, আমার মনে হয়, মেয়েদের তুমি শুধু কামনা কর, শ্রদ্ধা কর না।—আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করব?

কর।

তোমার মা কতদিন মারা গেছেন?

মাকে আমি দেখিনি।

বোন?

বোন আমার নেই।

বুঝেছি। মা-বোনের হাতে মানুষ যারা হয়নি মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা তাদের সহজে জন্মায় না। মেয়েরা যে কি, তারা তা সহজে চিনতেই পারে না।

সোমনাথ বললে ঃ কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর শিবানী, আমি তোমাকে—

তোমার দোষ তো আমি দিচ্ছিনে, তুমি আপনাকে চিনেছ তোমার মনের অতৃপ্ত

কামনা দিয়ে, ভগবান যদি দিন দেন তো পরে আরও ভাল করে চিনবে।—বা-রে, মাথা হেঁট করে রইলে যে? দুঃখ হয়ে গেল বুঝি?

শিবানী তার মুখখানি তুলতে গিয়ে বললেঃ একি? মাথার চুল এমন কেন? চুলে তেল দাও না বুঝি? বিলেত থেকে শিখে এসেছ, না?

সোমনাথ মুখ তুলে বললেঃ হ্যাঁ। মনেই থাকে না।

শিবানী বললেঃ কাল থেকে মনে যদি না থাকে, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না!

সোমনাথ ঘড়ি দেখলে। বললেঃ এদিকে আর যদি দেরি কর, তোমার বাবা তোমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

শিবানী বললেঃ তোমার বাবা কি বলবেন?

সোমনাথ বললেঃ জানেন না তাই, জানতে পারলে—সর্বনাশ! তাড়িয়ে দেবেন বাড়ি থেকে। মেয়েদের ওপর বাবার ভারি রাগ!

শিবানী বললেঃ আমাকে একদিন নিয়ে যেতে পার তোমার বাবার কাছে? রাগ আমি বের করে দেবো।

সোমনাথ বললেঃ পরে যেয়ো, আপাতত আমাকে উঠতে হলো। এসো।

সোমনাথের কি মনে হলো, সেইদিনই সে বাড়ি ফিরে গিয়ে প্রথমেই শিবনাথবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ডাকলেঃ বাবা!

শিবনাথবাবু কি যেন পড়ছিলেন, হঠাৎ ডাক শুনে বলে উঠলেনঃ উঁ! হ্যাঁ, কি বলছ সোমনাথ?

সোমনাথ বললেঃ আপনি কতবার বলেছেন, নারী পুরুষের শত্রু, এই কি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস?

শিবনাথবাবু বললেনঃ হ্যাঁ, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সোমনাথ বোধহয় চলে যাচ্ছিল, শিবনাথবাবু বললেনঃ কেন একথা আজ তুমি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে সোমনাথ?

সোমনাথ বললেঃ এমনিই।

শিবনাথবাবু বললেনঃ না এমনি নয়—এমনি নয়, মিথ্যার আশ্রয় কোনোদিন নেবে না বাবা, যা সত্য—অর্থাৎ যা তোমার অন্তরের সত্য, তাকে তুমি অকপটে স্বীকার করবে।—আর হ্যাঁ, নারী পুরুষ জাতির শত্রু—ঠিক এ-কথা তোমাকে তো আমি বলিনি, বলেছি, দুর্বল পুরুষের শত্রু। আর আমি জানি তুমি দুর্বল।—দুর্বল হতে তুমি বাধ্য, কারণ নারীর মাতৃরূপ দেখবার সৌভাগ্য তোমার হয়নি, সেদিক দিয়ে তুমি নিতান্ত হতভাগ্য। এমনি আর-এক হতভাগাকে ঠিক এমনি সাবধানই করে দিয়েছিলুম।

শিবনাথবাবু কি যেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন বোধহয় অমরনাথের কথা।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করলেঃ তার কি হলো?

শিবনাথবাবু বললেনঃ পারলে না। বড় শক্ত সোমনাথ, বড় শক্ত। কারণ তোমাদের মত হতভাগা যারা, নারীর সঙ্গে তাদের প্রথম সম্বন্ধ হবে কামনার ওপর—দুর্দমনীয় দৈহিক কামনা, অথচ ক্ষণিক—নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। সাধনা দিয়ে, সংযম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে এই কামনাকে জয় করতে হবে। তা যদি পার, তখন সন্ধান পাবে তারও ঊর্ধ্বে রয়েছে মাতৃরূপিণী কল্যাণী নারীর পরম পবিত্র একটি মন। সেইখানেই প্রথম সম্বন্ধ স্থাপনা করতে হয়, তার পর অন্য কথা। কাজেই পুরুষের চাই চরিত্র, চরিত্র দিয়ে তুমি যদি নারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করতে পার তাহলে আর মনের পবিত্র সম্বন্ধ হবে কেমন করে? তুমি নারীর বাইরের সৌন্দর্য দেখে তার পিছু পিছু ছুটে বেড়াবে না, তোমার চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে নারীই ছুটে আসবে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। যাও। বিরক্ত কোরো না।

সোমনাথ চলে গেল।

শিবনাথবাবু আবার তাকে ফিরে ডাকলেনঃ সোমনাথ। সোমনাথ।

সোমনাথ ফিরে এলো।

শিবনাথবাবু বললেনঃ রাগ করলে?

সোমনাথ বললেঃ না।

শিবনাথবাবু বললেনঃ সেকথা তোমার এখনও মনে আছে?

কোন কথা বাবা?

তোমাকে বিলেত পাঠাবার আগে যে-কথা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম! সেইখানে—বিদেশে, তোমার প্রলোভন ছিল সব চেয়ে বেশি। সেই জন্যেই বলেছিলাম, চিত্তজয় করতে যেখানে না পারবে, নারীকে আদ্যাশক্তির অংশ ভেবে শ্রদ্ধাভরে মনে মনে তাকে প্রণাম করবে। সংযমকে প্রথম প্রথম কঠোর মনে হবে সোমনাথ, কিন্তু সংযম কঠোর নয়, সৌন্দর্যকে দেখবার চোখ সে খুলে দেয়। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন—যাও!

শিবনাথবাবুর কথাগুলো দয়াল বাইরে থেকে সবই শুনেছিল।

দয়াল কি যেন একটা কাজের ছুতোর ঘরে ঢুকলো। শিবনাথবাবু বললেনঃ তুমি এখন যাও দয়াল। আমার কিছু দরকার নেই।

দয়াল বেরিয়ে গেল—সোমনাথের দিকে তাকাতে তাকাতে।

শিবনাথবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে সোমনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দয়াল তাকে ধরলে। বললেঃ শোনো সোমনাথ!

সোমনাথ দাঁড়ালো।

দয়াল বললেঃ বাবা কি বলছেন?

সোমনাথ বললেঃ কিছু না।

কিছু না নয়, শোন! বলে দয়াল তাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললেঃ কতক কতক আমি শুনেছি সোমনাথ, কিন্তু তোমার বাবার বয়েস হয়েছে, মাথাটা একটুখানি গোলমাল হয়ে গেছে।

সোমনাথ বললেঃ না দয়াল, বাবার মাথা গোলমাল হয়নি।

দয়াল রেগে গেল। বললেঃ না, মাথা খারাপ হয়নি! তুই দু'দিনের ছেলে, তুই কেমন করে জানবি বাবা! ওর কোনও কথা তুই শুনিসনি। এত বড় বাড়ি—একটা বৌ না এলে মানায় কখনও! আমি আর পারছি নে। তুইও যদি—

গলাটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ধীরে-ধীরে বললেঃ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাব। তোরা দু'জনে বাড়িতে থাকবি।

সোমনাথ হেসে বললেঃ রাগ কোরো না দয়াল। রাগ করছ কেন?

দয়াল বললেঃ না, রাগ করবে না! আর কতদিন আমি চুপ করে থাকবো? আর পারছি না, আর পারছি না—শোন সোমনাথ, যদি কোনোদিন এমন কিছু ঘটে, যা তুই তোর বাবার কাছে বলতে পারিস না, আমার কাছে বলবি, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। আর আমি মুখ বুঁজে থাকব না।

সোমনাথ হাসতে লাগলো।—পাগল! পাগল! তুমি পাগল হয়ে গেছ দয়াল!

দয়ালের চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়াতে লাগলো। বললেঃ হ্যাঁ পাগলই হয়েছি আমি।

শিবানীর গান শেখবার আগ্রহ হঠাৎ কেন যে এত বেড়ে গেছে কে জানে। অমরনাথ ডাক্তারখানা থেকে ফিরে এলেই বলেঃ নতুন একটা গানের বই কিনে আনলাম কাকাবাবু। এই গানটা স্বরলিপি দেখে কিছুতেই তুলতে পারছি না।

ওদিকে অক্ষয়বাবু বসে আছেন দাবার ছক পেতে!

বেচারা অমরনাথ কি করবে? গান শেখাবে না দাবা খেলবে?

শেষ পর্যন্ত শিবানীরই হলো জয়!

অমরনাথ হাত-মুখ ধুয়ে শিবানীকে গান শেখাতে বসলো।

অক্ষয়বাবু গেলেন চটে। আপনমনেই একা-একা দাবার চাল চালতে চালতে বলতে লাগলেনঃ ছাই হবে গান শিখে! শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ভাতের হাঁড়ি ঠেলবে, না শাশুড়িকে গান শোনাবে?

গান শেখাতে শেখাতে অমরনাথ বললেঃ যে-বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলতে হয় সেরকম বাড়িতে বিয়ে ওর দেবে কেন? বাপের তো পয়সার অভাব নেই।

অক্ষয়বাবু চিৎকার করে উঠলেনঃ তুমি ওর মাথাটি খাবে অমরনাথ! ভাল চাও তো এসো, হারমোনিয়াম ছেড়ে দাবায় বোসো।

শিবানী বললেঃ বাবার কথায় কান দিও না কাকাবাবু, তুমি আপনার কাজ কর।

গান শেষ হতেই শিবানী অন্য কথা পাড়লে। বললেঃ তোমার ডাক্তারবাবু কেমন আছেন কাকাবাবু?

অমরনাথ বললেঃ ভালই আছেন।

রোজ ডাক্তারখানায় আসেন?

হ্যাঁ মা রোজ আসেন। বড় ভাল ছেলে। একেবারে মাটির মানুষ।

তবে যে সেদিন বাবাকে বলছিলে—ভয়ানক রাশভারি লোক—কথা কইতে ভয় করে।

তা করবে না মা! হাজার হোক মনিব তো! আমি তার চাকর।

শিবানী হাসতে হাসতে বললেঃ সে-ই যে—প্রথম যখন তোমার চাকরি হলো—তোমার মনিবটি তার চাকরকে কি বলেছিল? বলেছিল—আপনার ভাইঝিটির বিয়ে দিতে বলবেন আপনার দাদাকে, না?

অমরনাথ বললেঃ হ্যাঁ, বলেছিল! কিন্তু তারপর এতদিন হলো কই আর কিছু বলেননি।

শিবানী বললেঃ আচ্ছা কাকাবাবু, তোমার মনিবটি নিজে এখনও কেন বিয়ে করেননি—বলতে পার? তুমি তক্ষুনি জবাব দিতে পারলে না?

তাই কি আর আমি বলতে পারি মা?—আর ওর বিয়ের ভাবনা কি মা! শুনেছি মস্ত বড় লোকের ছেলে—ওর বাবার প্রকাণ্ড বাড়ি টালিগঞ্জে, তাছাড়া—বিলেত-ফেরত অত বড় ডাক্তার, কার্তিকের মতন অমন সুন্দর চেহারা—বিদ্বান—বুদ্ধিমান—

শিবানী হাসতে লাগলো মুখ টিপে টিপে। থামো থামো, কাকাবাবু থামো! বাবাঃ, প্রশংসা যে তোমার শেষই হয় না।

অমরনাথ বললেঃ প্রশংসা করবার হলেই প্রশংসা করতে হয়! বিয়ের কথা বলছিস শিবু, কত বড়লোকের কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে ওর জন্যে ঠিক হয়ে আছে, প্রজাপতির নির্বন্ধ কোনদিন হুট করে শুনব হয়তো—ডাক্তারবাবুর বিয়ে।—যেতে হবে নেমন্তন্ন খেতে।

শিবানী বললেঃ তুমি একটা কথা বলবে কাকাবাবু, তোমার ডাক্তারবাবুকে? এখন তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। বোলো—ডাক্তারবাবু বিয়েতে আমাকেও যেন নেমন্তন্ন করে, আমি যাব।

কথাটাতে হাসছে কাকাবাবু? না, না, হাসি নয়। আমি সত্যি বলছি। শিবানী এই কথা বলতে বলতে তার পিছু নিলে।

ডাক্তারখানায় গিয়ে অমরনাথ সোমনাথকে বলবার মত কোনও কথা খুঁজে পায় না। অথচ এই সোমনাথ-ছেলেটিকে তার বড় ভাল লাগে। মনে হয়—দিবারাত্রি তার সঙ্গে বসে বসে কথা কয়।

সেদিন বলবার মত একটা কথা পেলে।

ডাক্তারখানায় সোমনাথের সঙ্গে দেখা হতেই অমরনাথ বললে ঃ আপনার সঙ্গে আজ আমার একটা কথা আছে স্যার।

কি কথা বলুন!

অমরনাথ বললে ঃ শুনলাম নাকি আপনার বিয়ে হবে?

কথাটা শুনে সোমনাথ হো হো করে হেসে উঠলো।

অমরনাথ বললে ঃ আপনি হাসছেন স্যার, কিন্তু আমি সত্যি বলছি।

সোমনাথ বললে ঃ কি সত্যি বলছেন? কার বিয়ে? আমার? কার কাছে শুনলেন আপনি?

অমরনাথ বললে ঃ না না, তা এখনও শুনিনি। তবে শুনত তো, একদিন! তাই শিবানী বলছিল—আপনার বিয়েতে তাকে যেন নেমন্তন্ন করা হয়—সে আসবে।

সোমনাথ বললে ঃ শিবানীকে বলে দেবেন—বিয়ে আমি করব না।

অমরনাথ বললে ঃ বিয়ে করবেন না? কেন স্যার? না না, বিয়ে আপনাকে করতে হবে। দেখুন, আমি আপনাকে একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না?

না, বলুন।

আপনি স্যার শিবানীকে বিয়ে করুন। শিবানী আমার ভাইঝি বলে বলছি না—বড় ভাল মেয়ে। দেখুন, আপনার মত আমার যদি একটি ছেলে থাকতো—তার সঙ্গে আমি শিবানীর বিয়ে দিতুম।

সোমনাথ অমরনাথের মুখে পানে একবার তাকালে। বললে ঃ শিবানী না আপনার ভাইঝি?

অমরনাথ বললে ঃ আজ্ঞে না, অক্ষয়বাবু আমার বন্ধু।

সোমনাথ বললে ঃ কিন্তু আপনি চেনেন না আমার বাবাকে। আমার বাবা বড় শক্ত মানুষ। বিয়ে উনি আমার দেবেন না।

অমরনাথ বললে ঃ আমি যাব আপনার বাবার কাছে। আমি বলব। আমি হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করব।—আপনি বলুন, আমাকে কথা দিন, কবে যাব বলুন।

সোমনাথ বললে ঃ সন্ধ্যেবেলা প্রতিদিন আমি লক্ষ্য করেছি—আপনার অবস্থা একটু অন্যরকম হয়ে যায়—আপনি এখন যান। পরে কথা হবে। যান আপনি।

তার মদ্যপানের ব্যাপারটা সোমনাথ বুঝতে পেরেছে নাকি?

অমরনাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সোমনাথের সেদিন কি যে হলো কে জানি, বাড়ি ফিরে গিয়েই দয়ালকে জিজ্ঞাসা করলে ঃ বাবা কোথায়?

দয়াল বললে ঃ শুয়ে আছেন। কেন?

সোমনাথ বললেঃ আচ্ছা দয়াল, তোকে যদি একটা কথা বলি তুই তার কোনও ব্যবস্থা করতে পারবি?

কি কথা বল!

ধর আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি। আমি যদি তাকে বিয়ে করতে চাই, তাহলে কি হবে?

দয়াল বললেঃ বিয়ে হবে, বৌ ঘরে আসবে, আমি বাঁচব—আবার কি হবে?

কিন্তু বাবা যদি বলেন—

দয়াল কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না। বললেঃ রেখে দে—তোর বাবার কথা রেখে দে। মেয়েটি কেমন সোমনাথ?

আমাকে একদিন দেখাবি?

আমি আর যাই না সেখানে। সেও আর আসে না। ভাবছি—বাবার যদি ওই মত হয় তো কেন আর মিছেমিছি—

দয়াল বললেঃ না না, যাবি সোমনাথ, যাবি। আমাকেও একদিন নিয়ে চল, আমি সব ঠিক করে' দেবো, আমি বলছি, আমি সব ঠিক করে দেবো।

ঝি এসে শিবানীকে খবর দিলেঃ দিদিমণি, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ডাক্তারবাবু? কোন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু আবার কজন আছে দিদিমণি!

শিবানী উঠে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি ভেবে বিছানায় শুয়ে পড়লো। বললেঃ ডাক্তারবাবুকে বলে দে—আমার অসুখ করেছে।

ঝি এসে ডাক্তারবাবুকে জানালে—দিদিমণির অসুখ করেছে।

অক্ষয়বাবুর কাছেই বসেছিল সোমনাথ।

অক্ষয়বাবু বলে উঠছিলঃ অসুখ? শিবানীর?

সোমনাথ বললেঃ শিবানীর অসুখ? বলে সে তার ঘরের দিকে উঠে গেল।

শিবানী আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে ছিল, সোমনাথ এলো।

হাত দেখে বললেঃ কোথায় জ্বর! কিচ্ছু হয় নি।

শিবানী বললেঃ ভারি তো ডাক্তার!

সোমনাথ বললেঃ ওঠো।

শিবানী বললেঃ না, উঠব না।

তারপর হঠাৎ এক সময় দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলো। হাসির শব্দে অক্ষয়বাবু চমকে উঠলেন।

খেতে খেতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পা টিপে টিপে শিবানীর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পেছনে গলার শব্দে তাকিয়ে দেখলেন—অমরনাথ।

অক্ষয়বাবু অমরনাথকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললেন ঃ ব্যাপারটা আমার কেমন মনে হচ্ছে অমরনাথ ডাক্তারের সঙ্গে শিবানীর ভারি ভাব।

অমরনাথ বললে ঃ বিয়ে দিয়ে দাও।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ দিয়ে দাও বললেই অমনি দিয়ে দাও! তোমার এমনি কথাই বটে! কিন্তু দেবো কেমন করে শুনি? বড়লোকের ছেলে—বড়লোক বাপ—

অমরনাথ বললে ঃ তুমি যাও ওর বাবার কাছে।

অক্ষয়বাবু বললে ঃ বাবা রে! আমি পারব না, তুমি যাও।

তোমার মেয়ে, আর তুমি পারবে না? তাহলে দুজনেই যাই চল।

না ভাই, তুমি যাও। তুমি ওর ছেলের কাছে চাকরি কর, তোমার কথা শুনবে।

অমরনাথ শেষ পর্যন্ত রাজি হলো।

তা মন্দ কি! সোমনাথবাবুর সঙ্গে শিবানীর বিয়ে—এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে। এই সুযোগে তার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসাও মন্দ নয়।

তাই অমরনাথ সেদিন ডাক্তারখানায় গিয়েই বৃদ্ধ অবিনাশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলো।

অবিনাশবাবু বললেন ঃ টালিগঞ্জে সোজা সুধীর সেন লেনে ঢুকেই প্রকাণ্ড বাড়ি। চৌধুরীসাহেবের বাড়ি বললে সবাই চিনতে পারে। তোমার কি দরকার বল দেখি?

অমরনাথের বেশ খুশি-খুশি ভাব! কি দরকার তা সে বললে না বটে, কিন্তু দেখে মনে হলো—সুখবর। অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ মাইনে-টাইনে বাড়লো নাকি?

অমরনাথ বললে ঃ হ্যাঁ ভাই, বাড়লো।

মনের ভুলে কথাটা বলেই কথাটা আবার সে সংশোধন করে নিলে। বললে ঃ না না, মাইনে বাড়েনি। অন্য কাজ—অন্য কাজ। আমার কাজের কি আর অন্ত আছে!

অমরনাথ একটা ঘরে ঢুকে লোকজনকে বললে ঃ নে বাবা, তাড়াতাড়ি একটু হাত চালিয়ে নে, আমাকে আজ আবার একটা জরুরী কাজে বেরুতে হবে।

এই বলে সে নিজেই কাজ করতে বসলো।

একটা বেয়ারা এসে খবর দিলে—ডাক্তারবাবু ডাকছেন।

সোমনাথ বললে ঃ আমি একটা জরুরী কলে বেরিয়ে যাচ্ছি, কখন ফিরব বলতে পারছি না। আপনি থাকবেন যেন ডাক্তারখানায়।

বলেই সে বেরিয়ে গেল। অমরনাথের মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না।

তারপরেই দেখা গেল, সেজে-গুজে অক্ষয়বাবু ডাক্তারখানায় এসে হাজির! হাতে একটি রূপো-বাঁধানো মোটা লাঠি, গলায় কোঁচান চাদর,—ট্যাক্সি ভাড়া করে এনেছেন—অমরনাথকে সঙ্গে নিয়ে সোমনাথের বাবার কাছে যাবেন। কিন্তু অমরনাথের হলো বিপদ। সোমনাথ বারণ করে গেছে, সে যায় কেমন করে!

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ পঞ্জিকা দেখে বেরিয়েছিলুম অমরনাথ, সময়টি বড় ভাল।

অমরনাথ বললে ঃ তাহলে তুমি নিজেই যাও। ভয় কি? শুনলুম ডাক্তারবাবুর বাবা বড় ভাল মানুষ।

অক্ষয়বাবু শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলেন।

অক্ষয়বাবুর গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো শিবনাথবাবুর প্রকাণ্ড গাড়ি-বারান্দার নিচে। বাড়ি দেখেই তিনি ভয় পেয়েছিলেন। দয়াল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাবুর কাছে গেল।

শিবনাথবাবু অত্যন্ত রাশভারি লোক। ভয়ে প্রথমে অক্ষয়বাবুর মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছিল না। পরে, বিয়ের কথাটা বলতেই অক্ষয়বাবুকে তিনি একরকম হাঁকিয়েই দিলেন। বললেন ঃ আজ্ঞে না, বিয়ে-টিয়ে এখন হবে না। পরে আবার ফিরে ডেকে বললেন ঃ দেখুন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। আপনার মেয়েকে সোমনাথ চেনে?

অক্ষয়বাবু বললেন খুব চেনে।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ হুঁ, আচ্ছা যান।

অক্ষয়বাবু চলে যাচ্ছিলেন। শিবনাথবাবু আবার তাকে ফিরে ডাকলেন। কি যেন তাঁকে তিনি বলতে চান, অথচ বলতে পারছেন না—বড় কষ্ট হচ্ছে। অতি কষ্টে শেষে বললেন ঃ সোমনাথ আমার ছেলে নয়। আমি তাকে মানুষ করেছি মাত্র।

অক্ষয়বাবু অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ কার ছেলে?

শিবনাথবাবু বললেন ঃ জানি না। আমার চাকর দয়াল ওকে কুড়িয়ে এনেছিল রাস্তা থেকে। এ-কথা জেনেও আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চান?

অক্ষয়বাবু বলে উঠলেন ঃ না, না, না। কিন্তু এ-কথা আপনি সত্যি বলছেন?

শিবনাথবাবু বললেন ঃ জীবনে আমি কখনও মিথ্যা বলিনি।

এর ওপর আর কথা চলে না। অক্ষয়বাবু মাথা হেঁট করে আবার গাড়িতে এসে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল।

অমরনাথকে ডাক্তারখানায় বসিয়ে রেখে সোমনাথ মনে মনে হাসতে হাসতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

শিবানীদের বাড়ির কাছে রাস্তার একটা মোড়ে গাড়ি থামিয়ে হর্ণ দিলেই দেখা যায়, শিবানী তার জানালায় এসে দাঁড়ায়। সোমনাথের গাড়ির হর্ণ সে চেনে। জানালা থেকে রুমাল নেড়ে ইসারা করে সোমনাথকে সে অপেক্ষা করতে বলে। তারপর কাপড় জামা বদলে সে নিজেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

সেদিন কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুলো না। জানলা থেকে হাত নেড়ে সোমনাথকে সে বাড়িতেই ডাকে। বাবা তার বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন—ফিরতে দেরি

হবে। ফাঁকা বাড়ি। সোমনাথ আসতেই শিবানী বললেঃ বাবা বেরিয়ে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে।

দু'জনে শিবানীর ঘরে বসে বসে অনেক গল্প হলো।

কথা কইতে কইতে সোমনাথ হঠাৎ একসময়ে ফিক করে হেসে ফেললে।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেঃ হাসলে যে?

সোমনাথ বললেঃ শোনো। সে এক ভারি মজার কথা। আজ তোমার কাকাবাবু বললেনঃ আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব স্যার! রোজই সন্ধ্যেয় দেখি—তোমার কাকাবাবু এসে হাত জোড় করে বলেনঃ স্যার, আমি যাব আর আসব। তারপর ফেরেন যখন, তখন একেবারে—তুরীয়ানন্দ অবস্থা। একটু মদ খেয়ে আসেন।

আজ জব্দ করে দিয়েছি। বলেছি—জরুরী কলে আমি বেরিয়ে চললুম, যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ ডাক্তারখানায় থাকুন।

এই বলে সোমনাথ হেসে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বললেঃ তার মুখের চেহারা যদি দেখতে!

শিবানী হাসতে হাসতে বললেঃ এ তোমার কিন্তু ভারি অন্যায়।

তাদের হাসির মাঝখানেই গম্ভীরমুখে ঘরে ঢুকলেন অক্ষয়বাবু।

হাসি তাদের হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

অক্ষয়বাবু ডাক্তারবাবু দিকে তাকিয়ে বললেনঃ শোনো!

দু'জনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

দরজার কাছে গিয়ে অক্ষয়বাবু বললেনঃ তুমি কাল থেকে আমার বাড়িতে আর এসো না।

সোমনাথ হঠাৎ অবাক হয়ে গেল। বললেঃ কেন?

অক্ষয়বাবু বললেনঃ কেন? আমার মেয়ের বিয়ে দেবার বয়স হয়েছে তা বোধহয় বুঝতে পেরেছ। আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু বাপ-পিতামহের একটা পরিচয় অন্তত আছে। কাজেই আমি চাই না কোনও অজ্ঞাত কুলশীল ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে।

সোমনাথ বললেঃ কি বলছেন আপনি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

অক্ষয়বাবু বললেনঃ বুঝতে নিশ্চয়ই পেরেছ। আর না-ই যদি পেরে থাকো, শুধু জেনে রেখো—আমি সব জানতে পেরেছি। তুমি যাকে বাবা বল, তিনি তোমার বাবা নন্। তিনি তোমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছেন। সর্বনাশ করেছিলে বাবা, তুমি আমার সর্বনাশ করতে বসেছিলে! যাও—আর দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও।

সোমনাথ মাথা হেঁট করে' ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

অক্ষয়বাবু বললেনঃ আসুক, অমরনাথটা একবার আসুক। দেখাচ্ছি মজা।

শিবানী বললেঃ বাবা। কি হলো বাবা? কি বলছ তুমি?

অক্ষয়বাবু চুপ করে রইলেন। শিবানী বললে ঃ আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা!

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ বুঝে আর কাজ নেই মা।

সোমনাথ সেদিন মাথা হেট করে' কি যেন ভাবতে ভাবতে শিবনাথবাবুর ঘরে ঢুকতেই রায়-চৌধুরী বললেন ঃ সোমনাথ, বোসো!

সোমনাথ দাঁড়িয়ে রইলো। বললে ঃ এ-কথা কি সত্যি?

শিবনাথবাবু আবার বললেন ঃ বোসো বাবা, বোসো। বলছি।

সোমনাথ বসলো।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ অক্ষয়বাবু বলে কোনও ভদ্রলোককে—যাক্‌গে, এখন আর সে-প্রশ্ন করে লাভ নেই, সবই আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যে-মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তিনি এসেছিলেন—সে মেয়েটিকে—লজ্জা কোরো না সোমনাথ, স্পষ্ট জবাব দাও, মেয়েটিকে তুমি কি সত্যিই ভালোবাসো? অন্তরের সত্য গোপন কোরো না—তাকে পেলে সুখী হবে?

সোমনাথ বললে ঃ সে-সব কথা পরে হবে বাবা, আপনি বলুন—আপনি আমার কে

শিবনাথবাবু একটা ঢোক গিললেন, একবার এদিক-ওদিক তাকালেন, তারপর অতিকষ্টে বললেন ঃ সে কথাও আজ আমাকে বলতে হবে না। না? আমি তোমার কেউ নই। শুধু আমি তোমাকে পুত্রের অধিক স্নেহে পালন করেছি।

সোমনাথ বললে ঃ এতদিন আপনি তা আমাকে জানাননি কেন?

শিবনাথবাবু বললেন ঃ কেন জানাইনি?—ওরে, তাও কি তোকে আজ বুঝিয়ে বলতে হবে? ওই দয়ালটা আমাকে বলতে দেয়নি। না না না, দয়াল কেন, দয়াল কেন, আমি নিজে—নিজেই নিজেকে জানাতে চাইনি। ভেবেছিলুম—এই মিথ্যা দিয়েই নিজেকে ভুলিয়ে রাখবো।

সোমনাথ বললে ঃ শেষ পর্যন্ত তাই রাখলেন না কেন?

শিবনাথবাবু বললেন ঃ শুধু আমার আর তোমার সম্পর্ক যদি হতো সোমনাথ, তাহলে তাই রাখতাম। কিন্তু মাঝখানে আর একজন এসে পড়লো যে! তার কাছে সত্য গোপন করলে অপরাধ হবে। তাই আমি—তাই আমি অতিকষ্টে আজ—আর আমি কিছু বলতে পারছিনে সোমনাথ। আর যদি কিছু তোমার জানবার থাকে, দয়ালকে জিজ্ঞাসা কোরো।

সোমনাথ ধীরে-ধীরে উঠে গেল। বাইরে এসে ডাকলে ঃ দয়াল! দয়াল!

দয়ালের পরিবর্তে অন্য একজন চাকর এসে দাঁড়ালো।

সোমনাথ বললে ঃ তোকে নয়। দয়াল কোথায়?

কোথায় গেছে। বাড়িতে নেই।

এমন সময় টেলিফোন এলো ডাক্তারখানা থেকে। অমরনাথ টেলিফোন করছে সোমনাথকে।

আসুন! একজন রুগী অপেক্ষা করছে।

যাচ্ছি।

সোমনাথ তৎক্ষণাৎ আবার বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারখানায় এসে ভদ্রলোক রুগী বসে বসে ক্রমাগত হাই তুলেছিলেন, এমন সময় সোমনাথ এলো। ভদ্রলোক বললেন ঃ নমস্কার! বলেই হাই তুললেন।

সোমনাথও বললে ঃ নমস্কার!

বলেই ডাকলে ঃ অমরনাথবাবু!

অমরনাথ আসতেই বললে ঃ রেজেষ্ট্রি খাতাটা দিন!

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলে ঃ রেজিষ্টার কি হবে?

আমি বলছি দিন!

অমরনাথ রেজেষ্ট্রি খাতাখানি এনে দিলে। দিয়েই চলে গেল।

সোমনাথ খাতাখানা খুলে রোগীকে জিজ্ঞাসা করলে ঃ নাম?

তিনি বললেন ঃ নাম হরিচরণ সান্যাল।

বলেই তিনি আবার হাই তুললেন।

সোমনাথ নাম লিখে জিজ্ঞাসা করলে ঃ বাবার নাম?

তিনি বললেন ঃ পিতার নাম শ্রীপতিতপাবন সান্যাল। হালসাকিম একাত্তোর নম্বর সুকিয়া ষ্ট্রীট, সাকিম বৰ্দ্ধমান জেলার—সরসেবাড়ি গ্রাম। আমরা সেখানকার জমিদার। কলকাতা এসেই মশাই এই হাঁটুর যন্ত্রণায়—বুঝলেন? দুদিন একেবারে উঠতেই পারিনি।

সোমনাথ তাঁর বাবার নামটি লিখে কলম হাতে নিয়ে চুপ করে কি যেন ভাবছে, তিনি বলেই চলেছেন! হঠাৎ সোমনাথ টেবিলের ঘণ্টা বাজালে।

ঠং করে শব্দ হতেই সান্যাল-মশাই চমকে উঠলেন।

চমকে উঠেই আবার বলতে লাগলেন আর হাই তুলতে লাগলেন।

অমরনাথ ঘরে ঢুকলো। বললে ঃ ডেকেছিলেন?

সোমনাথ খাতাটা দেখিয়ে বললে ঃ হ্যাঁ। এবার থেকে এইখানে আলাদা একটা ঘর কাটবেন। প্রত্যেক রোগীর পিতার নাম এইখানে লেখা থাকবে।

অমরনাথ বললে ঃ কিন্তু রুগীর পিতার নাম তো কখনও লেখা হয় না।

সোমনাথ বললে ঃ এবার থেকে হবে।

অমরনাথ বললে ঃ কিন্তু স্যার—

সোমনাথ রেগে উঠলো। বললে আমি বলছি—এবার থেকে প্রত্যেকের বাবার নাম এইখানে লিখতে হবে। লিখতে না পারেন, চাকরি ছেড়ে চলে যাবেন।

এমনভাবে বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে কথা সে কখনও বলে না। অমরনাথ বললে ঃ যে-আজ্ঞে।

অক্ষয়বাবুকেও দেখা গেল, সেদিন অমরনাথের ওপর চটে আছেন। চটে থাকবারই কথা।

অমরনাথ বাড়ি ফিরতেই অক্ষয়বাবু বললেন ঃ আমার বাড়ি ছেড়ে এবার তুমি চলে যাও। আমার যথেষ্ট হয়েছে। নিজে যেমন বাউণ্ডুলে, তেমনি আর-এক বাউণ্ডুলেকে এনে জুটিয়েছিলে।

অমরনাথ বললে ঃ কি বললেন তিনি? গবীর লোক বলে বিয়ে দেবেন না?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ না, না, না, বিয়ে আমিই দেবো না। ডাক্তার ছোঁড়াটার কেউ কোথাও নেই, বাবা নেই, মা নেই—

আরও কি যেন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় শিবানী ডাকলে ঃ কাকাবাবু! কাকাবাবু!

অমরনাথ শিবানীর কাছে গিয়ে বললে ঃ কি মা?

দেখলে, সিঁড়ির মাথায় কোথায় যাবার জন্যে সে যেন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলে ঃ ডাক্তারবাবু কোথায় কাকাবাবু।

অমরনাথ বললে ঃ কি জানি মা, আমাদের সব বিদেয় করে দিয়ে একাই ডাক্তারখানায় বসে রইলো—মেজাজ ভারি খারাপ দেখলুম। এখানেও দেখছি তোমার বাবার মেজাজও গরম হয়ে আছে।

অক্ষয়বাবু ডাকলেন ঃ অমরনাথ!

অমরনাথ বললে ঃ আমি কিছু বুঝতে পারছি নে মা!

অক্ষয়বাবু ডাকলেন ঃ অমরনাথ!

অমরনাথ বললে ঃ যাই।

শিবানী বললে ঃ আমি চললুম।

কোথায়?

ডাক্তারখানায়।—বলেই শিবানী চলে গেল।

অমরনাথ। অক্ষয়বাবু আবার ডাকলেন।

অমরনাথ এলো অক্ষয়বাবুর কাছে।

অমরনাথ বললে ঃ আমি কিছু বুঝতে পারছি না অক্ষয়বাবু, কি ব্যাপার বলুন তো?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ ব্যাপার আর বুঝতে হবে না অমরনাথ, তুমি বুঝতে পারবেও না।—তোমার না আছে ছেলে, না আছে মেয়ে, তুমি আমার দুঃখু কেমন করে বুঝবে? ভাগ্যিস সময় থাকতে টের পাওয়া গেল, নইলে সর্বনাশ হয়ে যেতো। নাও বোসো, একহাত মেরে নিই, মনটা ভাল হোক।

অক্ষয়বাবু দাবার ছক পেতে বসলেন।

অমরনাথ বললেঃ না আমার এখন দাবা খেলতে ভাল লাগবে না অক্ষয়বাবু মন-মেজাজ আমার ভারি খারাপ হয়ে আছে।

অক্ষয়বাবু বললেনঃ কিছু খেয়েছ?

না।

ডাকো শিবানীকে, কিছু খেতে দিক। শিবানী! শিবানী! তোর কাকাবাবুকে কিছু খেতে দে।

অমরনাথ বললেঃ শিবানী চলে গেছে।

কোথায় চলে গেছে?

জানি না।—জানলেও বলব না।

তার মানে? এই রাত্রে—

হ্যাঁ এই রাত্রে। জানলেই আপনি ছুটবেন তার পিছু-পিছু।

তাহলে কি তুমি বলতে চাও সে গেছে তোমার সেই ডাক্তারের কাছে?

হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে।

সেই বুড়োটার বাড়িতে?

হ্যাঁ, তার বাড়িতে।

দ্যাখো অমরনাথ, আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি জেনে শুনে আমার জাত মেরে দিতে চাও। তুমি আজই—এক্ষুনি চলে যাও আমার বাড়ি থেকে। তোমাকে কতবার আমি চলে যেতে বলেছি, তুমি যাওনি। আজ আর আমি—রাগে তিনি কাঁপতে লাগলো।

অমরনাথ বললেঃ এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। আপনি শিবানীকে বলে দেবেন।

এই বলে দু'জনেই উঠলো।

অক্ষয়বাবুও জামা পরতে লাগলেন, অমরনাথও জামা পরতে লাগলো। জামা পরতে পরতে অক্ষয়বাবু একটা জামা অমরনাথের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বললেঃ এটা তোমার।

অমরনাথও একটা সার্ট অক্ষয়বাবুর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বললেঃ এটা আপনার।

এমনি করে জামা কাপড়ের মীমাংসা হয়ে যাবার পর দেখা গেল, অমরনাথ তার সুটকেশটি হাতে নিয়ে, আর অক্ষয়বাবু তাঁর লাঠিটি হাতে নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অক্ষয়বাবু ট্যাক্সি ডাকছেন।

কিন্তু একখানা গাড়িও দাঁড়াচ্ছে না।

অমরনাথ বললেঃ ট্যাক্সি এ রাস্তায় পাওয়া যাবে না। বড় রাস্তায় যেতে হবে।

অক্ষয়বাবু বললেনঃ না পাওয়া যাক, তোমার কি! আমি হেঁটেই যাব।

হেঁটে? সেই টালিগঞ্জ পর্যন্ত?

হ্যাঁ টালিগঞ্জ পর্যন্ত। ট্রামে যাব।

ট্রাম পাবেন না।

না পাই না পাব। খবরদার বলছি, তুমি এই রাত্রে আমার বাড়ি ছেড়ে যাবে না। আমার বাড়িতে শুধু চাকর-বাকর রইলো, চুরি হয়ে যাবে।

আমি কি আপনার বাড়ি পাহারা দেবো নাকি?

হ্যাঁ দেবে।

আমার বয়ে গেছে।

তুমি তো তাই বলবে। তোমার না আছে ছেলে, না আছে মেয়ে, না আছে ঘর, না আছে সংসার, বাউণ্ডুলে—মাতাল—সেই ট্যাক্সি!

সেটাও ট্যাক্সি নয়।

অমরনাথ বললেঃ যেতে হবে না, আপনি থাকুন।

অক্ষয়বাবু বললেন, না তুমি থাকো। আমি যাবই। আমি যাব—আমি যাব আমার মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে, তোমার কি?

অমরনাথ বললেঃ তাহলে যান। কিন্তু ভাল কাজ হবে না অক্ষয়বাবু!

তোমার কাজটা খুব ভাল হচ্ছে, না? ভদ্দরলোকের বাড়ি থেকে রাত্তিরবেলা চলে যাচ্ছ?

আমি যাব।

তাহলে আমিও যাব।

রাত্রি হয়েছে। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় তখনও লোক চলাচল বন্ধ হয়নি।

একা শিবানী একটা ট্যাক্সি চড়ে নিতান্ত ভয়ে-ভয়েই এসেছিল সোমনাথের ডাক্তারখানার দরজায়। এসে দেখলে, ডাক্তারখানার লোকজন সব চলে গেছে, শো-কেশগুলো বন্ধ, কিন্তু সদর দরজাটা খোলা।

গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে শিবানী পা টিপে টিপে দরজা পেরিয়ে দেখলে, ভেতরে আলো জ্বলছে। সোমনাথের চেম্বারের কাঁচের পাল্লার ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। পাখা ঘুরছে, আর তার ছায়াটাও ঘুরছে কাঁচের ওপর।

শিবানী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যাক, সোমনাথ আছে তাহলে!

দরজা ঠেলে শিবানী কখন ঘরে ঢুকেছে, সোমনাথ দেখতেও পায়নি। মাথায় হাত দিয়ে হেঁট মুখে কি যেন সে ভাবছিল।

শিবানী বললেঃ কি ভাবছ?

আচমকা চমকে উঠে সোমনাথ চিৎকার করে উঠলোঃ কে?

আজ কি আমাকেও চিনতে পারছ না?

সোমনাথ ম্লান একটুখানি হেসে তাকে অভ্যর্থনা করলে। বললেঃ বোসো।

সোমনাথ হাসলে বটে, কিন্তু সে-হাসি কান্নার চেয়েও করুণ।

শিবানী তা লক্ষ্য করলে। তারও বুকের ভেতর তখন ঝড় উঠেছে। চুপ করে সে তার পাশে গিয়ে বসলো।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করলেঃ এত রাত্রে? একা? কিছু বলবে?

শিবানী বললেঃ না।

তারপর দু'জনেই চুপ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। ঘরের ঘড়িটা চলছে টিক টিক করে।

সোমনাথই প্রথমে উঠে দাঁড়ালো। বললেঃ সবই তো শুনেছ।

শিবানী বললেঃ শুনেছি।

সোমনাথ বললেঃ এইবার ভাল দেখে একটি বিয়ে-থা করগে। করে সুখে থাকো!

শিবানী নীরবে তার মুখের পানে তাকিয়েছিল, কথাটা তার বুকে যেন তীরের মত এসে বিঁধলো। দেখতে দেখতে তার দু'চোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এলো।

সোমনাথ বললেঃ কাঁদছ কেন? তোমার বাবা তো আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। এবার বাড়ি যাও।

শিবানী বললেঃ না আমি যাব না।

সোমনাথ মাথা হেঁট করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেঃ তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে দ্যাখো।

শিবানী বললেঃ আমার ভবিষ্যৎ নেই। তুমিই আমার ভবিষ্যৎ।

সোমনাথ বললেঃ ও-সব হেঁয়ালি চলবে না শিবানী, তুমি ছেলে-মানুষ নও, ভেবে দ্যাখো। আমার দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সর্বনাশ আমি করতে চাই না। তুমি যাও।

যাও বললেই যাওয়া যায়? এই তোমার বিশ্বাস?

সোমনাথ ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। শিবানী বললেঃ তুমি বসো, আমার চোখের সুমুখে একটুখানি বোসো লক্ষ্মীটি, অমন ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

সোমনাথ ম্লান একটু হাসলে মাত্র।

শিবানী উঠে দাঁড়ালো। সোমনাথকে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিয়ে বললেঃ আজ আমি কেন এসেছি জানো? তোমার সঙ্গে আমার ভবিষ্যতের একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে নয়। আজ তুমি বড় অসহায়। আমি জানি আমাকেই আজ তোমার সব চেয়ে বড় প্রয়োজন।

শিবানী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেঃ তুমি স্থির হও, তুমি ভেবো না, আমার কথা তুমি ভেবো না।

সোমনাথ ডাকলেঃ শিবু!

শিবানী বললেঃ উঁ না তুমি কথা বলবে না।

সোমনাথ বললে ঃ কথা না বলে থাকতে পারছি না। আচ্ছা তুমি কি চাও?

শিবানী একটু হেসে বললে ঃ আমি কিছুই চাই না।

কিছুই না?

না, আমি শুধু তোমাকে চাই।

আমাকে তুমি পাবে না। তোমার ভালর জন্যেই তোমার কাছ থেকে আমি সরে যেতে চাই।

আমার ভাল তোমাকে দেখতে হবে না। আমার ভাল আমি নিজে বুঝব। তুমি তোমার বক্তৃতা একটু থামাও!

এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজতে লাগলো। শিবানী বাঁ-হাত দিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে বললে ঃ হ্যালো?— না, নেই। এখন তাঁকে পাওয়া যাবে না।

বলেই সে রিসিভারটা টেলিলের উপর নামিয়ে রাখলে। বললে ঃ থাক এ সময় বার-বার ক্রিং ক্রিং করে বিরক্ত করবে। ভাল লাগে না।

শিবানী আবার বললে ঃ হ্যাঁ, কি বলছিলাম। তুমি বড় অস্থির। তুমি বড় দুর্বল।— চুপটি করে তুমি এইখানে শুয়ে থাকো।—একটা গান শুনবে? গান শুনলে দেখেছি তুমি চুপ থাকো।

সোমনাথ বললে ঃ গাও।

শিবানীর গান গাইবার মত মনের অবস্থা নয়, তবু সে গাইলে।

গানের মাঝখানেই সোমনাথ বলে উঠলো ঃ না না, এ-গান তুমি থামাও শিবানী। মনটা আমার খারাপ করে দিলে। গান আমি শুনব না।

শিবানী বললে ঃ তোমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করা হয়েছে? বাঃ। বেশ তো! একথা তোমাকে কে বললে?

সোমনাথ বললে ঃ বাবা।—যিনি আমাকে মানুষ করেছেন।

শিবনাথবাবুর বাড়িতে তখন দেখা যাচ্ছে দয়াল গেছে ক্ষেপে।

যে-মনিবকে সে চিরকাল সমীহ করে চলেছে, যার সুমুখে দাঁড়িয়ে কোনদিনই সে জোর করে কথা বলতে পারেনি, আজ তারও মুখে কথা ফুটেছে। চোখ দুটো জলে টল টল করছে, আর বলছে ঃ কিন্তু কেন? কেন বললেন তাকে এ-কথা? আমি এতদিন চুপ করে থাকতে পেরেছি আর আপনি পারলেন না?

শিবনাথবাবু বললেন ঃ সত্যকে আর কতদিন গোপন করে রাখবো? এ-সত্য সহ্য করবার ক্ষমতা তার আছে দয়াল, তুই চিৎকার করিসনে, থাম।

দয়াল বললে ঃ কিন্তু এখনও সে বাড়ি ফিরলো না কেন? অন্য দিন তো এত রাত্তির করে না!

শিবনাথবাবু বললেন ঃ তোর কি আবার সেই ভয় হচ্ছে নাকি দয়াল? অমরনাথ যেমন পালিয়েছিল, এ-ও তেমনি পালাবে?

দয়াল বললে ঃ বিশ্বাস কি! আপনি তার বিয়ে দেবেন না বলেছেন, যে-মেয়েটির সঙ্গে—বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে হতেই সে কথা বন্ধ করে টেলিফোনের কাছে ছুটে গেল। রিসিভার তুলে নিয়ে সোমনাথের ডাক্তারখানায় ফোন করলে।

ডাক্তারখানায় দেখা গেল, টেলিফোনের রিসিভার টেবিলের ওপর নামানো। শিবানী আগেই নামিয়ে রেখেছে। কোন শব্দ নেই!

শিবানী-সোমনাথের কথা তখনও থামেনি। শিবানী বললে সোমনাথকে ঃ চল— আমরা কোনও দূর দেশে চলে যাই। যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না।

সোমনাথ আবার একটু হাসলে মাত্র।

ওদিকে টেলিফোনে কোনও জবাব না পেয়ে দয়াল রিসিভার নামিয়ে দিয়ে শিবনাথবাবু কাছে এসে বললে ঃ যা ভেবেছি ঠিক তাই হয়েছে, আপনি সর্বনাশ করেছেন। সোমনাথ পালিয়েছে।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ কি?

দয়াল বললে ঃ আপনি সর্বনাশ করেছেন।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ না, আমি ঠিকই করছি। আমি সত্যকথা বলেছি।

দয়াল বললে ঃ তাহলে শুনুন, আমিও একটা সত্য কথা বলি। আপনি জানেন না—যা আমি এখনও আপনার কাছে গোপন করে রেখেছি। আজ আমার সোমনাথ যদি চলে যায়—

একজন চাকর এসে খবর দিলে ঃ এক ভদ্রলোক এসেছেন।—অক্ষয়বাবু নাম।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ ওই সেই মেয়ের বাবা।

দয়াল বললে ঃ মেয়ের বাবা? আমি আসছি।

শিবনাথবাবু বললেন ঃ কিন্তু কি কথা তুই বলতে গিয়ে—কথাটা তাঁর শেষ হলো না। দয়াল চলে গেল।

দয়াল নীচে নেমে গিয়ে অক্ষয়বাবুকে বললে ঃ আপনার মেয়ের সঙ্গে আপনি আমাদের সোমনাথের বিয়ে দিতে চান?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ না।

দয়াল বললে ঃ তবে? কি জন্যে এসেছেন?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ এসেছি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

দয়াল অবাক হয়ে গেল। বললে ঃ তার মানে? মেয়ে আপনার কোথায়?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ চালাকি রাখো। তোমাদের এই বাড়িতেই আছে। আমার মেয়ে আমার বাড়ি থেকে চলে এসেছে।

দয়াল বললে ঃ আপনি বসুন। আমি দেখছি।

দয়াল ছুটলো শিবনাথবাবু কাছে পাগলের মত বকতে বকতে? মানুষ করার বেদনা তো আপনি বোঝেন না বাবু, আমি দু'জনকেই মানুষ করেছি। চলে গেছে—

সোমনাথও চলে গেছে। ঠিক যেমন করে আর একজন চলে গিয়েছিল, এও ঠিক তেমনি করে চলে গেল। অমরনাথকে ধরেছিলুম, কিন্তু একে কি ধরতে পারব?

শিবনাথবাবুর কাছে গিয়ে বললেঃ আপনি থাকুন বাড়িতে, আমি চললুম।

শিবনাথবাবু বললেনঃ কোথায়?

দয়াল বললেঃ সোমনাথকে খুঁজতে। সেও পালিয়েছে। আর একজনকে ঠিক যেমন করে তাড়িয়েছিলেন, একেও ঠিক তেমনি করে তাড়ালেন।

বলতে বলতে দয়ালের চোখে জল এলো। আবার বললেঃ সোমনাথকে যদি না পাই, আর আমি ফিরব না বাবু। আপনি একাই থাকবেন এই বাড়িতে।

শিবনাথবাবু ডাকলেনঃ দয়াল!

দয়াল ফিরে দাঁড়িয়ে বললেঃ হ্যাঁ, কি বলুন!

শিবনাথবাবু বললেনঃ না, কিছু বলিনি, তুই যা।

দয়াল বললেঃ যাচ্ছিই তো! কিন্তু যাবার আগে আপনাকে বলে যাই—সত্যি কথা বলতে আমরাও জানি। সোমনাথকে মানুষ করেছিলুম। সোমনাথ আপনার অমরনাথের ছেলে, আপনার নাতি।

শিবনাথবাবু চিৎকার করে উঠলেনঃ দয়াল!

দয়াল বললেঃ হ্যাঁ বাবু, দয়াল মিথ্যে বলে না!

এই কথা বলে যেই সে বেরিয়ে যাবে, দেখলে, সোমনাথ ঘরে ঢুকছে।

শিবনাথবাবু বলে উঠলেনঃ সোমনাথ!

সোমনাথ বললেঃ বাবা।

শিবনাথবাবু কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না, ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে অতিকষ্টে ডাকলেনঃ দয়াল!

এখন আর বলবার কিছু নেই।

তার পরেই দেখা গেল, অক্ষয়বাবুর বাড়িতে সানাই বাজছে। সোমনাথের সঙ্গেই শিবানীর বিয়ের সব ঠিক করে গেছে।

সবই হয়েছে বটে, কিন্তু অমরনাথ নেই। সে যে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

বিয়ের আগের দিন শিবানী হঠাৎ বেঁকে বসলো। ছুটে এসে সে অক্ষয়বাবুকে বললেঃ বিয়ে এখন বন্ধ থাক।

অক্ষয়বাবু বললেনঃ পাগলামি করিসনি মা, ছি!

শিবানী বললেঃ কাকাবাবুকে তুমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ বাবা। কাকাবাবু না এলে বিয়ে আমি করব না।

অক্ষয়বাবু বললেনঃ না মা, তোর কাকাবাবুকে আমি তাড়াইনি। রাগের মাথায় আমি ওকে রোজ তাড়াই, রোজ ফিরে আসে। আবার একদিন ফিরে আসবে দেখিস।

শিবানী বললে ঃ না বাবা, খবর নিলাম—ডাক্তারখানাতেও উনি যাননি। কোথায় গেলেন তাহলে?

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ হুঁ, ওর আবার যাওয়া! যাবার যায়গা কোথায়? মনের দুঃখে কোথাও হয়তো মদ গিলছে!

সত্যিই দেখা গেল—

একটা হোটেলে অমরনাথ প্রাণ ভরে মদ খাচ্ছে। গ্লাসের পর গ্লাস খেয়েই চলেছে। মুখে কোনও কথা নেই। শুধু মাঝে-মাঝে বেয়ারাকে ডাকছে আর বলছে ঃ তাড়াতাড়ি দে বাবা, আমাকে বিয়ের একটা নেমন্তন্ন খেতে যেতে হবে।

তাহলে খবর নিশ্চয়ই পেয়েছে!

পাশের টেবিলের লোকগুলো তার কাণ্ড দেখে হাসাহাসি করছে, অমরনাথের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ক্রমে রাত্রি হলো। লোকজন একে একে সব চলে গেল। কিন্তু অমরনাথ কিছুতেই উঠলো না। টেবিলের ওপর মাথা দিয়ে তখন সে এমন ঘুম ঘুমিয়েছে যে, বেয়ারারা অনেক চেষ্টা করেও তাকে তুলতে পারলে না।

ম্যানেজার বললে ঃ থাক, পুরনো খদ্দের, সকালে বের করে দিও।

তাই হলো। আলো নিবিয়ে সবাই চলে গেল। সকালে দেখা গেল, অমরনাথ টেবিলের নীচে মাটিতে পড়ে আছে।

মুখ চোখে জল দিয়ে বেয়ারারা তাকে ধরাধরি করে টেনে তুললে। বললে ঃ এবার বাড়ি যান।

অমরনাথ হাসলে। বললে ঃ বাড়ি!

তারপর পকেট হাতড়ে দেখলে তখনও দুটো টাকা আছে। বললে ঃ নেশাটা কেটে গেছে বাবা। আর-একগ্লাস দে আমাকে।

অমরনাথ কিছুতেই ছাড়বে না!

আর-একগ্লাস মদ তাকে দিতেই হলো।

ম্যানেজারবাবু হেসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ আপনার হঠাৎ এত পিপাসা পেল যে?

অমরনাথ বললে ঃ কাল রাত্রে একটা বিয়ে ছিল দাদা!

ম্যানেজারবাবু বললেন ঃ বিয়ে তো এইখানেই দেখলেন!

হ্যাঁ দাদা দেখলাম। বলে অমরনাথ ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো।

গতরাত্রে সোমনাথের সঙ্গে শিবানীর বিয়ে হয়ে গেছে। সকালে তখনও সানাই বাজছিল।

অক্ষয়বাবুর দরজায় প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়িয়ে আছে। শিবানী সোমনাথের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাবে।

একমাত্র কন্যাকে বিদায় দিতে গিয়ে অক্ষয়বাবুর চোখদুটো জলে ভরে এলো।

শিবানীর মনের অবস্থা ভাল নয়। বললে ঃ কাকাবাবু তো এলো না বাবা!

চোখের জল মুছে অক্ষয়বাবু বললেন ঃ কই আর এলো মা! আসে যদি তো পাঠিয়ে দেবো। দেখে আসবে।

শিবানী গাড়িতে ওঠবার আগে দেখা গেল, মনের ভুলে মাথার সোনার মুকুটটা সে টেবিলের ওপর ফেলে গেছে।

বর-কনে মোটরে চড়তেই মোটর ছেড়ে দিলে।

অক্ষয়বাবু চোখে জল নিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে অপরাধীর মত অমরনাথ এসে দাঁড়ালো।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ বাঃ, বেশ মানুষ যা হোক! আমার ওপর রাগ করে না-হয় চলে গেলে, কিন্তু শিবানী কি দোষ করলে শুনি? তোমার মনিব কি দোষ করলে?

অমরনাথ অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা না বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল। মনে হলো সে রাগ করেছে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে অমরনাথ বললে ঃ চাকরি আমি ছেড়ে দিয়েছি।—আমি যাদের ভালবাসি তারা যদি আমাকে অপমান করে আমার ভারি রাগ হয়ে যায়। শিবানী! শিবানী! মা!

অক্ষয়বাবু কাছে এসে বললেন ঃ শিবানী এইমাত্র শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। তোমার জন্যে যে—এ হে হে, এ কি চেহারা হয়েছে হে তোমার? কোথায় ছিলে? ও, তোমার একেবারে তুরীয়ানন্দ অবস্থা দেখছি যে! সকালেই গিলেছ খানিকটা?

অমরনাথ সে-কথার জবাব দিলে না। বললে ঃ শিবানী চলে গেল? একবার দেখতেও পেলাম না!

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ হ্যাঁ ভাই, আমার ঘর খালি করে দিয়ে চলে গেল। এখন আমি থাকি কেমন করে বলত? সবই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে অমরনাথ, নাও বোসো—একহাত দেখা যাক!

অক্ষয়বাবু দাবার ছক পেতে বসলেন।

অমরনাথ বললে ঃ তা নাহয় বসছি। কিন্তু বড় ক্ষিদে পেয়েছিল, ভেবেছিলাম শিবানীর হাতে আজ আচ্ছা করে পেট ভরে খাব।

অক্ষয়বাবু বললেন ঃ আরে! এতক্ষণ বলতে নেই? হরিচরণ! হরিচরণ!—দে বাবা দে, বাড়িতে অনেক খাবার বেড়েছে—দে বেশ করে একথালা সাজিয়ে দে! আমরা দুভাইএ খেতে খেতে— বুঝেছ কিনা অমরনাথ, বিয়ের হিড়িকে দাবার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

দাবার বড়ে বসাতে বসাতে আবার বললেন ঃ কিন্তু তোমার চলে যাওয়া—ছি-ছি-ছি, ভারি অন্যায় হয়েছে। শিবানী কত দুঃখু করছিল। চল আজ সন্ধ্যেবেলা দু'জনে গিয়ে শিবানীকে দেখে আসব।

অমরনাথ বললেঃ জামাইটি কেমন হলো?

অক্ষয়বাবু হাসতে হাসতে বললেনঃ আরে, আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয়নি। তারপর বুঝলে কিনা, সোমনাথের ঠাকুরর্দা বুড়ো আচ্ছা মজার লোক কিন্তু। ওর এক বাউণ্ডুলে ছেলে কোথায় পালিয়ে গেছে, সোমনাথ সেই তারই ছেলে। বুঝলে?—এই বলে তিনি হো হো করে হাসতে লাগলেন।

অমরনাথ তার মুখের পানে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এমন সময় দয়াল ঘরে ঢুকলো এই কথা বলতে বলতেঃ কোথায়? বাবু কোথায়?

অক্ষয়বাবু বললেনঃ কেন হে? তুমি আবার ফিরে এলে যে?

দয়াল বললেঃ হ্যাঁ বাবু, বৌমা মাথার মুকুট ফেলে গেছে টেবিলের ওপর। নিতে এলুম। দশজন লোক দেখতে আসবে, মুকুট না হলে অমন সোনার পিতিমেকে মানাবে কেন বাবু!

অমরনাথ হঠাৎ দয়ালের মুখের পানে তাকালে। দয়ালও অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একবার সেইদিক পানে তাকিয়ে কথাটা শেষ করলে। প্রথমটা কেউ কাউকে বোধহয় চিনতে পারেনি। তারপর অমরনাথই প্রথম বলে উঠলোঃ দয়াল!

দয়ালও বলে উঠলোঃ দাদাবাবু! তুমি এখানে? তুমি! দাদাবাবু!

অমরনাথ বললেঃ আমি যে এখনও কিছু বুঝতে পারছি না দয়াল।

দয়াল বললেঃ বুড়ো হয়েছি বলে' কি আর এটুকুও বুঝতে পারব না দাদাবাবু! তোমার ছেলের বিয়ে হলো, বেয়াই-এর সঙ্গে বসে বসে দাবা খেলছো—যাও, আর চালাকি কোরো না। এসো, এসো আমার সঙ্গে। বিয়ের আগের দিন তোমার জন্যে বাবুর চোখেও জল দেখেছি।

অক্ষয়বাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেনঃ সে কি কথা?

দয়াল বললেঃ হ্যাঁ গো বাবু, এই তো আপনার বেয়াই। সোমনাথের বাবা!

অক্ষয়বাবু অমরনাথের মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চাকর হরিচরণ একথালা সন্দেশ নিয়ে এলো। অক্ষয়বাবু চিৎকার করে' উঠলেনঃ এক থালা নয় রে হতভাগা, তিন থালা নিয়ে আয়। বাড়িতে যা কিছু আছে সব নিয়ে আয়।

দয়াল কিছুতেই ছাড়লে না অমরনাথকে। বললেঃ আমার সঙ্গে তোমাকে যেতেই হবে।

অমরনাথ বললেঃ বাবার কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না দয়াল। তার চেয়ে তুই এক কাজ কর। বাবা যখন বাড়ি থাকবে না, আমাকে একবার খবর দিবি—ছেলে-বৌকে আমি একবার একসঙ্গে দেখে আসবো।

বলতে বলতে চোখদুটো তার ছল-ছল করে এলো।

দয়াল বললেঃ বাবু এখন বাড়িতে নেই। গঙ্গা নাইতে গেছেন। আর কতদিন থাকবি লুকিয়ে লুকিয়ে? ধন্যি পাষাণ যাহোক!

অমরনাথ বাধ্য হয়ে গেল দয়ালের সঙ্গে। সারারাস্তা সে এই কথাই বলতে বলতে গেল—কেমন করে সোমনাথের সঙ্গে তার পরিচয় হলো, কেমন করে তার কাছে চাকরি পেলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

দয়াল বললেঃ ভগবান আছেন অমরনাথ, ভগবান আছেন। আমি যে দিবারাত্তি কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকি।

অমরনাথ বললেঃ কিন্তু শোন, সোমনাথকে এখন কিছু বলিসনি। পরিচয় যখন পায়নি, তখন আর পেয়েও কাজ নেই। আমি ওদের একবারটি দেখেই চলে আসব।

দয়াল বললেঃ কেন?

অমরনাথের দোখদুটো জলে ভরে এলো। বললেঃ আমি কি আর ওই-বাবার ছেলের যোগ্য রে? না, সোমনাথের মতন ছেলের বাবার যোগ্য? না দয়াল, আমার পরিচয় পেলে সোমনাথের লজ্জা হবে। তুই শুধু ওদের দুজনকে একবার দেখিয়ে দে! কেমন মানিয়েছে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।

শিবনাথবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। ধীরে-ধীরে দোতলায় উঠে গিয়ে একটা ঘরের দরজায় এসে দয়াল থমকে দাঁড়ালো। তারপর যে-ঘরে সোমনাথ আর শিবানী ছিল সেই ঘরের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে।

অমরনাথ ঘরে ঢুকতেই শিবানী 'কাকাবাবু'! বলে ছুটে এসে প্রণাম করলে। বললেঃ বেশ মানুষ যা-হোক! না, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বলব না কাকাবাবু।

অমরনাথের অবস্থা ঠিক উন্মাদের মত! চোখভরা জল নিয়ে আশীর্বাদ করলেঃ বেঁচে থাক মা, সুখে থাক!

সোমনাথও এগিয়ে এসে একটি প্রণাম করলে। হাজার হোক, তারই কম্পাউণ্ডার তো! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! শিবানীর কাকাবাবু!

সোমনাথ বললেঃ কোথায় ছিলেন এ ক'দিন? কিরকম লোক আপনি?

অমরনাথের তন্দ্রা যে হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। বলে উঠলোঃ এ্যাঁ! ও, হ্যাঁ, বেঁচে থাকো বাবা সোমনাথ, বেঁচে থাকো! তুমি আজ—

অমরনাথ তাকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল, সোমনাথ 'থাক থাক বলে তাকে সরিয়ে দিয়ে শিবানীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

অমরনাথ বললেঃ ও, হ্যাঁ। বলেই চোখের জল গোপন করবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালে-টাঙানো তার বাবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

শুনতে পেলে, সোমনাথ হেসে হেসে শিবানীকে বলছেঃ তোমার কাকাবাবু—বলেই হাতের ইসারায় মদ্যপানের ইঙ্গিত করে বললোঃ বলেছিলাম না, অভ্যেস আছে।

শিবানী মুখ টিপে একটুখানি হেসে বললেঃ হ্যাঁ, জানি।

সোমনাথ বললেঃ আজ সকালে মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছে।

অমরনাথ ডাকলেঃ দয়াল! দয়াল!

বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দয়ালকে খুঁজতে খুঁজতে বারান্দায় গিয়ে অমরনাথ বললেঃ আমি চললুম দয়াল! দয়াল! দয়াল!

ঠিক এমনি সময়ে শিবনাথবাবুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাইরে। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছিলেন, হঠাৎ তাঁর কানে এলোঃ অমরনাথের ডাক—দয়াল!

সোমনাথ ও শিবানী যে-ঘরে ছিল, সেই ঘরের দরজায় এসে শিবনাথবাবু বললেনঃ 'দয়াল দয়াল বলে' কে ডাকলে? কার গলার আওয়াজ?

শিবানী বললেঃ আমার কাকাবাবুর।

সোমনাথ বললেঃ আমার কম্পাউণ্ডারের।

দয়াল ঠিক সেই সময় জোর করে টানতে টানতে অমরনাথকে ধরে নিয়ে এলো।

শিবনাথবাবুর মুখের পানে একবার তাকিয়েই মাথা হেঁট করে অমরনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখ দিয়ে তার আর কথা বেরুলো না।

শিবনাথবাবু বললেনঃ কোথায় ছিলি এতদিন?

বলতে বলতে তাঁর গলার আওয়াজ ভারি হয়ে এলো। সোমনাথের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেনঃ ও তোমার কম্পাউণ্ডার নয় সোমনাথ! তোমার বাবা।

সোমনাথ বলে উঠলোঃ বাবা? আমার বাবা?

শিবনাথবাবু চোখের জল মুছে বললেনঃ হ্যাঁ, ওকে একদিন আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

অক্ষয়বাবু এলেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে। এসেই বললেনঃ একা বাড়িতে আমাকে ফেলে দিয়ে সবাই চলে এলে। আমি আর থাকতে পারলাম না—চলে এলাম। কই, কোথায় গেল সব?

ঘরে ঢুকেই অমরনাথকে ধরে বললেঃ এসো ভায়া এসো, ওরা কথা বলুক ততক্ষণ! অমি নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। বলেই তিনি তাঁর গায়ের কাপড়ের তলা থেকে দাবার ছকটি বের করলেন।

বৃদ্ধ শিবনাথবাবুর মুখে হাসি ফুটলো। আর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো।